# ফীহি মা ফীহি

(মওলানা রূমীর উপদেশ বাণী)

কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন



# ফীহি মা ফীহি

(মওলানা রূমীর উপদেশ বাণী)

লেখক
মওলানা জালালউদ্দীন রূমী (রহ:)

স্বত্ত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনুবাদ
কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

প্রকাশক
মোমেনা খাতুন

প্রকাশকাল
.....

ডিজাইন
মুহাম্মদ মাহাদী হাসান তুহিন
মোবাইল: ০১৮ ২৫৩৩ ৯৪৯৪

মুদ্রণ
জয়নাব প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস
২০৩/২, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
ফোন: ০১৭১১১৭৬৭২৩
E-mail: joynabpress@gmail.com

হাদিয়া : ২৫০.০০ টাকা

[Bengla Translation of Mawlana Jalaluddin Rumi, Discoirses- “Fihi Ma Fihi” from A.J. Arderry. Traslator: Kazi Saifuddin Hossain]

## অনুবাদকের আরয

মওলানা রূমী (রহ:) ইসলামী সূফী সাধকদের অন্যতম। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি তাঁর ভক্তকুল ও শিষ্যদের উদ্দেশ্যে অনেক উপদেশ বাণীও রেখে গিয়েছেন। এমনই একটি উপদেশের বই হচ্ছে "ফীহি মা ফীহি" ('এতে নিহিত যা এতে নিহিত')। বইটি ১৯৬১ সালে প্রকাশ করেন যুক্তরাজ্যের এ. জে. আরবেরী। আমরা অনলাইনে তা পেয়ে অনুবাদ করেছি। আশা করি মওলানা রূমী (রহ:)'র এই বইটি পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য হবে।

- কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন



## উৎসর্গ:

*পীর ও মুর্শীদ সৈয়দ মওলানা*
*এ. জেড. এম. সেহাবউদ্দীন খালেদ সাহেব*
*(রহ:)-এর পুণ্যস্মৃতিতে...*

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

Little Known Publications &
Omphaloskepsis (AMES, Iowa)

## মুখবন্ধ

মওলানা জালালউদ্দীন রূমী (রহ:)-এর কাব্য সাম্প্রতিককালে জনপ্রিয় ও সর্বজনবিদিত হয়েছে। এর পেছনে অবদান রেখেছে কোলম্যান বার্কস্, রবার্ট ব্লায় ও অন্যান্যদের নতুন অনুবাদগুলো। মওলানার ভাস্বর প্রেমের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছা যাঁর আছে, তিনি তাঁর মহাকাব্যে অবগাহন করতে পারেন। কিন্তু তাঁর সূক্ষ্ম জ্ঞান যদি আপনি উপলব্ধি করতে চান এবং তাঁর কাব্যের মর্মবাণীর অন্তর্দৃষ্টি অনুভব করতে আগ্রহী হন, তবে মওলানার এই উপদেশমূলক ভাষণ সে দ্বারের চাবিকাঠি হতে পারে।

প্রকাশকদের জানা মোতাবেক এই প্রকাশনার আগে মওলানা রূমী (রহ:)-এর সবগুলো ভাষণের অনুবাদ-ই বিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ করেছিলেন, যাঁরা ছিলেন বিদ্বান। তাঁদের প্রকাশিত বইপত্রে মওলানার বাণীর আক্ষরিক অর্থ যেখানে সযত্নে নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে, সেখানে এই অনুবাদে তাঁর দেয়া প্রকৃত বার্তা বহনকারী বক্তব্যের সূক্ষ্ম প্রভাব ফিরিয়ে আনার প্রয়াস পাওয়া গিয়েছে।

মওলানা রূমী (রহ:) শুধু শিক্ষণীয় ঘটনাবলী বর্ণনা করছেন না, কিংবা তাঁর দর্শন ও ধর্মীয় উপলব্ধি ব্যক্ত করছেন না, যেমনটি আলোকপাত করা হয়েছিল পূর্ববর্তী অনুবাদগুলোতে, বরং এখানে তাঁর বাণী এক মহান আদর্শ প্রচারের জন্যেই শৈল্পিক-কৌশল অবলম্বন করেছে। সূফী বুযূর্গবৃন্দ প্রায়ই যা বলে থাকেন, সে মোতাবেক এ বিষয়টি বাইরে থেকে অধ্যয়ন বা মূল্যায়ন করা যায় না; এটিকে অন্তস্তল থেকেই খুঁজে পাওয়া যায়। এসব বক্তব্য মতপার্থক্যের সৃষ্টি করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ বিষয়ে মওলানার নিজস্ব মতামত জানতে হলে আমাদেরকে শুধু তাঁর নিজস্ব ভাষণগুলোই বিশ্লেষণ করতে হবে। মওলানা রূমী (রহ:) বারংবার সে সব লোকের সমালোচনা করেছেন যারা বিষয়াদির বাহ্যিক অর্থ নিয়েই ব্যস্ত থাকে, কিন্তু অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করতে পারে না।



অতএব, মওলানার উপদেশ-বাণী সম্পর্কে গবেষণা করতে যাঁরা আগ্রহী, শুধু তাঁদের কাছেই এর আবেদন সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু পাঠকমণ্ডলী যদি সযত্নে এ বইটি পাঠ করতে ইচ্ছুক হন, তবে জীবনের সাথে মওলানার সম্পর্ক এবং (ঐশী)-প্রেমের সাথে তাঁরই আত্মিক মত্ততাপূর্ণ ঘনিষ্ঠতার এক বৃহত্তর চিত্র তাঁরা দেখতে সক্ষম হবেন।

আপনাদের মন্তব্য, পরামর্শ ও প্রশ্ন আমরা স্বাগত জানাই। আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন নিচের ঠিকানায়- LKPublictn@aol.com

# ভূমিকা

ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সূফী কবি হিসেবে স্বীকৃত মওলানা জালালউদ্দীন রূমী (১২০৭ - ১২৭৩ খৃষ্টাব্দ) তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এমন এক খোরাক জুগিয়েছেন, যা শত শত বছর যাবৎ পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মের আধ্যাত্মিকতা-পিয়াসী মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর যুগেও সওদাগর ও রাজা-বাদশাহ, পুণ্যবান বান্দা ও বিদ্রোহী অন্বেষী, বিখ্যাত আলেম-উলেমা ও সাধারণ কৃষক, নারী ও পুরুষ সকলেই মওলানাকে খুঁজে বেড়াতেন। তাঁর জানাযায় মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী, আরবীয়, পারসিক, তুর্কী ও রোমান জনগোষ্ঠী (শেষ) শ্রদ্ধা জানাতে সমবেত হন। আসুন, সত্যান্বেষীদের প্রতি মওলানার আহ্বান আমরা এক্ষণে মনোযোগ দিয়ে শুনি:

এসো, এসো, যে-ই হও না কেন তুমি,
কী পথহারা, কী পূজারী, কী হাল ছেড়ে দেয়ার মানসিকতা-প্রেমী,
কিছু এসে যায় না তাতে, হয় না ব্যতিক্রমী,
আমাদের এ কাফেলা নয়কো হতাশার রাজ্যগামী,
এসো, যদিও শতবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে তোমার হয় বদনামী,
এসো, বার বার এসো, হে সত্যান্বেষী, নিজ কল্যাণকামী!

[অনুবাদকের নোট: ওপরের পদ্যে উল্লেখিত 'প্রতিশ্রুতির' বিষয়টি সম্ভবতঃ আল্লাহতা'লার সাথে মনুষ্যকুলের কৃত ইতিপূর্বেকার ওয়াদা - 'আলাসতু বি-রাব্বিকুম'; আমরা প্রতিনিয়ত এই ওয়াদা ভঙ্গ করছি।]

সকল ধর্মের ঐতিহ্যের প্রতি মওলানা রূমী (রহ:)-এর যে সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল, তা তাঁর যুগে সর্বদা জনপ্রিয় ছিল না। যার দরুন আরও কট্টরপন্থীদের তরফ থেকে প্রায়ই তাঁর সমালোচনা হতো। এমনই এক ঘটনায় মুসলিম পণ্ডিত ইমাম কোনাভী (রহ:) একবার মওলানাকে জনসমক্ষে চ্যালেন্জ করে বসেন। ইমাম কোনাভী (রহ:) প্রশ্ন করেন, "আপনি দাবি করেন যে আপনি ৭২টি ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাথে একাত্ম। কিন্তু ইহুদীরা খৃষ্টানদের সাথে একমত হতে পারেন না, আর খৃষ্টানরাও মুসলমানদের সাথে একমত হতে পারেন না। তাঁরা যদি একে অপরের সাথে ঐকমত্য পোষণ করতে না পারেন, তাহলে আপনি কীভাবে তাঁদের



সবার সাথে ঐকমত্য পোষণ করতে পারবেন?" মওলানা রূমী (রহ:) এর জবাবে বলেন, "হ্যাঁ, আপনি সঠিক। আমি আপনার সাথেও একমত।" [অনুবাদকের নোট: মওলানার এই ঐকমত্য সহিষ্ণুতাপূর্ণ সহাবস্থানের, যেটি সূফী আদর্শ বটে]

রাজা-বাদশাহবর্গ যদিও বা মওলানা রূমী (রহ:)-এর অনুসারী ছিলেন, তবুও তাঁর সমালোচকরা কখনোই এটি অনুধাবন করতে পারেনি কেন তাদের ভাষায় "দর্জি, বস্ত্র ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র দোকানির মতো সভ্যতা-ভব্যতাহীন উচ্ছৃঙ্খল লোকদের" প্রতি তাঁর পরম স্নেহ ও নিষ্ঠা ছিল অবারিত। কিন্তু এই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সঙ্গি-সাথীদের বেলায়ও মওলানা কখনো আত্মশ্লাঘার অবকাশ দেননি। একদিন এমনই এক ঘটনায় মওলানা ছিলেন গভীর ধ্যানে মগ্ন। তাঁর খেদমতে ছিলেন তাঁরই শিষ্যবৃন্দ। অকস্মাৎ এক মদ্যপ বা মাতাল লোক এসে চিৎকার করতে লাগলো এবং মওলানার দিকে এগোতেই সে হোঁচট খেয়ে তাঁর গায়ের ওপর গিয়ে পড়লো। মওলানার শিষ্যবৃন্দের কাছে তাঁদের মোর্শেদের এই অপমান অসহনীয় ছিল, তাই তাঁরা সবাই একযোগে সেই অজ্ঞ আহাম্মক লোকটিকে শায়েস্তা করার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। মওলানা রূমী (রহ:) তাঁদের হাত তুলে থামিয়ে দিলেন এবং বল্লেন, "আমি মনে করেছিলাম ওই অবাঞ্ছিত প্রবেশকারী লোকটি-ই বুঝি মাতাল; এখন দেখছি আমার মুরীদ তথা শিষ্যরাই মাতাল!"

এমন হাজার হাজার মানুষ আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন যে মওলানা রূমী (রহ:)-এর বারাকাত (আধ্যাত্মিক উপস্থিতি) আজো বিরাজমান এবং এখনো (তিনি) মানুষকে শেখাচ্ছেন [এই অধম বঙ্গানুবাদক-ও তাই বিশ্বাস করি]। এটি সত্যি হলে এর এক বড় কারণ হচ্ছে তাঁর লেখনী ও কাব্যে অবস্থিত লক্ষণীয় প্রাণশক্তি; আর ওই লেখনী ও কাব্যের প্রাসঙ্গিকতা-ও, যা আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছে থাকে। মওলানার কবিতা তার গভীরতা ও সৌন্দর্যের দরুন সারা বিশ্বের আধ্যাত্মিকতা-পিয়াসী মানুষের অন্তরসমূহ জয় করে নিয়েছে। তাঁর কাব্যের ছত্রগুলো জীবনের বিস্তৃত অবাধ দৃশ্যপট ফুটিয়ে তোলে, মানুষের দুঃখকষ্ট ও খোদাভক্তি থেকে আরম্ভ করে খোদাতা'লার গোপন পরিকল্পনার সর্বজনীন

ব্যাপ্তি সবই তাতে বিধৃত। মওলানার কাব্য এক্ষেত্রে মনে হয় যেন অগাধ জ্ঞানের ভাণ্ডার, যার কোনো শেষ-ই নেই।

মওলানা রূমী (রহ:) আমাদের কাছে রেখে গিয়েছেন আরেকটি পাণ্ডুলিপি, যেটি তেমন সুপরিচিত নয়। এতে রয়েছে তাঁর শিষ্যদের প্রতি প্রদত্ত উপদেশমূলক বাণী। 'ফীহি মা ফীহি' ('এতে নিহিত যা এতে নিহিত') হলো এই আধ্যাত্মিকতাসমৃদ্ধ ভাষণ বা আলাপেরই একখানা দলিল, যে ভাষণগুলো প্রায় সময়-ই সেমা তথা কাব্যগীতি ও ওয়াজদ তথা মওলানার সময়কার তুরস্কের কোনিয়া অঞ্চলের নেহায়েত বিষন্ন মানুষের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ও আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাস সৃষ্টির লক্ষ্যে রূমী (রহ:) কর্তৃক সূচিত এবং বর্তমানে বিখ্যাত ঘূর্ণিয়মান দরবেশের দৈহিক স্পন্দনের পরে প্রদান করা হতো।

বর্তমান এই বইটি এ, জে, আরবেরীর মূল অনুবাদ থেকে সম্পাদিত ও পুনর্লিখিত হয়েছে, যেটি ১৯৬১ সালে "ডিসকোর্সেস অফ রূমী" [মওলানা রূমী (রহ:)-এর উপদেশ বাণী] শিরোনামে প্রকাশিত হয়। আরবেরী নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সাহিত্যকর্ম "সহজে পাঠের উপযোগী কোনো বই নয়। আর মূল বইটিও কোনোক্রমেই সর্বদা সহজে বোধগম্য হওয়ার নয়।" মূল পাণ্ডুলিপির আরও সাম্প্রতিককালের গবেষণা (যেমন চিত্তিক ও শাহ) অনুযায়ী, আরবেরীর অনুবাদেও কিছু পারিভাষিক ত্রুটি বিদ্যমান; অধিকন্তু, মওলানার সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক শিক্ষার আরও যথাযথ উপলব্ধি বর্তমান গবেষণায় পাওয়া যায়। আমি আশা করি, এই সংস্করণ ওই সব উদ্ধৃতিকে স্পষ্ট প্রতীয়মান ও খোলাসা করতে সহায়তা করবে এবং অধ্যাপক আরবেরীর অবদানের ওপর ভিত্তি করে আমাদের আরও এগিয়ে নেবে।

উপরন্তু, মওলানা রূমী (রহ:) ঘনঘন কুরআন মজীদ থেকে অসংখ্য আয়াতে করীমার উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁর এ বইতে। যেহেতু তাঁর শ্রোতামণ্ডলীর সবাই আল-কুরআন ভালো জানতেন ও বুঝতেন, সেহেতু সেসব উদ্ধৃতি ছিল তাঁদের পরিচিত ও ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। তবে এই বইয়ের অনেক পাঠকের কাছেই সেরকম হবে না। তাই কুরআন মজীদের সাথে অপরিচিত পাঠকদের কাছে যেসব উদ্ধৃতি বিভ্রান্তি ছড়াতে



পারে, বা মওলানার বার্তার দিক পরিবর্তন করিয়ে দিতে পারে, সেগুলো আমি অপসারণ করেছি।

খোদাতা'লার প্রতি মওলানা রূমী (রহ:)-এর সম্বোধন সর্বদাই গভীর ব্যক্তিগত সংশ্লিষ্টতার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি "আল্লাহ" কিংবা "মাহবূব" (প্রেমাস্পদ) শব্দগুলোর মধ্যে যেটি-ই ব্যবহার করুন না কেন, এতে তিনি পরম করুণাময়ের ঘনিষ্ঠতাই ব্যক্ত করেছেন মাত্র। মওলানার পারসিক ভাষায় 'খোদা' শব্দটি পুরুষ বা স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত নয়, আর খোদাতা'লার উদ্দেশ্যে তাঁর ব্যবহৃত রূপক ভাষায় মহান প্রভুর প্রতিচ্ছায়া যেমনটি হলো 'প্রেমাস্পদ' ও 'মহাসাগর', ঠিক তেমনি ঘনঘন ব্যবহৃত খেতাব হলো 'রাজাধিরাজ'।

মওলানা রূমী (রহ:)-এর প্রতিচ্ছায়াগুলোর প্রবাহ, ছন্দ ও প্রভাব-ই আমি সবকিছুর ওপরে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছি। তিনি বাহ্যত যে মর্মবাণী পৌঁছাতে চান, তার চেয়ে এই অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম বিষয়গুলো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর এ আলোচনার ২৬তম অধ্যায়ে তিনি বলেন, "সাবধান! এ কথা বলো না, 'আমি বুঝেছি।' এ কথাগুলো যতো বেশি তুমি বুঝতে ও আত্মস্থ করতে পারবে, ততোই এগুলোর উপলব্ধি থেকে তুমি দূরে সরে যাবে। এগুলোর অর্থ উপলব্ধি না করার মধ্যেই নিহিত।" এই অন্তর্দৃষ্টি বা উপলব্ধি ব্যাখ্যারও অতীত; আমাদেরকে এগুলো অন্তরের অন্তস্তলে অনুধাবন করতে হবে। আর এ কাজে আমাদেরকে পথনির্দেশনাস্বরূপ মওলানার রেখে যাওয়া সূক্ষ্ম চিহ্নগুলোর শরণাপন্ন হতে হবে।

এ পন্থায় মওলানা রূমী (রহ:)-কে অনুসরণ করুন এবং আপনি তখন দেখতে পাবেন মুক্তার হারের প্রতিটি মুক্তাকে বেঁধে রাখা সুতোটি। প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি প্রতিচ্ছায়াই হচ্ছে মওলানার নতুন আলোচনার মুহূর্ত; কিন্তু পূর্ববর্তী মুহূর্তের সাথে এর ছেদ পড়েছে কদাচিৎ। ধাপে ধাপে মওলানা নেচে বেড়াচ্ছেন। ওর খেই না হারিয়ে অনুসরণের জন্যে আমাদেরও হতে হবে নমনীয় ও নমনশীল। তবু মওলানার এ 'রকস্' তথা নাচের ছন্দ ও ধরনের আড়ালে লুক্কায়িত আছে তাঁরই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

এমন কী আজো মওলানা রূমী (রহ:) আমাদের মৌলিক অনেক সাংস্কৃতিক ধারণাকে চ্যালেন্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন; আর তা এমন সব উপায়ে

করছেন যা সচেতন না হলে আমরা লক্ষ্য না-ও করতে পারি। কোনো ধারণাকে সেকেলে কিংবা পূর্ববর্তী রীতিনীতির সমর্থনসূচক গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তকারী বলে প্রত্যাখ্যান করা খুবই সহজ। কিন্তু মওলানা রূমী (রহ:)-এর ব্যাপারে হুট করে এ রকম কোনো সিদ্ধান্ত কখনো নেয়ার ক্ষেত্রে আমি সতর্ক করবো। কেননা এতে তাঁর দ্বারা আপনার-ই কৃত ওই একই ভুল ধরার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, ১২ নং উপদেশ বাণীর আলোচনায় মওলানা রূমী (রহ:) প্রশ্ন করেন, "কোনো সূফী/দরবেশ যিনি খোদাতা'লার রহস্যের হীরারত্ন (আধ্যাত্মিকতা) ধারণ করেন, তিনি কাউকে আঘাত করে নাক বা চোয়াল ভেঙ্গে দিলে দোষী সাব্যস্ত হবেন কে?" মওলানা দাবি করেন ওই দরবেশেরই প্রতি জুলুম করা হয়েছে। তিনি বলেন, "যেহেতু সূফী/দরবেশ খোদাতা'লার মাঝে বিলীন ও মাস্ত্, সেহেতু তাঁদের কর্ম খোদাতা'লারই কাজ। আল্লাহ পাককে তো অন্যায়কারী বলা যায় না।"

প্রথম দর্শনেই এই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় উগ্রতার চিহ্ন বহন করে। স্পেনদেশীয় খৃষ্টান ইনকুইজিশানের সংঘটিত হত্যাকাণ্ড যে উগ্রতা থেকে নিঃসৃত হয়েছিল, এটিও মনে হতে পারে ওই একই ধরনের কোনো মতবাদ; আত্মপক্ষ সমর্থনের যে কোনো অজুহাত হতে ভিন্ন কিছু নয়। আমরা বলে থাকি, নিজেদের পছন্দের জন্যে খোদাতা'লাকেই দোষারোপ করা। কিন্তু মওলানার কথাগুলো আরও মনোযোগসহ পড়ুন; তিনি সহিংসতাকে সমর্থন করছেন না, এর ন্যায্যতা তুলে ধরছেন না। তিনি জিজ্ঞেস করছেন কোনো কর্ম সঠিক না ভুল, ভালো না মন্দ, তা কীভাবে নির্ধারিত হবে। তিনি আমাদের বলছেন সঠিক ও ভুলের ব্যাপারে আমাদের সংস্কৃতিগত ধারণার চেয়েও গভীরে ডুব দিয়ে তালাশ করতে এর প্রকৃত কারণ; আর সে কারণ হলো খোদাতা'লার এরাদা (ইচ্ছা)।

কিন্তু ব্যাপারটির এখানেই শেষ নয়, কেননা আমরা এখনো মওলানা রূমী (রহ:)-এর অন্তর্দৃষ্টি উপলব্ধি করতে পারিনি। আমাদের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ সঠিক বা সম্পূর্ণ ভুলের ধারণাগুলো প্রত্যাখ্যান করে। আমরা শেখেছি কোনটি সত্য তা আমাদের প্রত্যেকের নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে হবে; আর এ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে অন্য কারোর কর্তৃত্বের অধিকার নেই। অতঃপর শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ সংঘটিত মনের সংকীর্ণতাজনিত



ধর্মীয় যুদ্ধবিগ্রহ ও গীর্জা-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত গণহত্যার পর আমরা সম্পূর্ণ তথা অবিমিশ্র সত্যের ঊর্ধ্বে আপেক্ষিক সত্যকে স্থান দিয়ে সামাজিকভাবে এ সমস্যাটির সমাধান করে ফেলেছি। আরেক কথায়, আমরা এখনো বিশ্বাস করি না যে ওই দরবেশের আঘাত করার কোনো অধিকার আছে।

মওলানা রূমী (রহ:) এগুলোর সবই জানেন এবং তিনি এ ব্যাপারে বহু দূর এগিয়ে আছেন। তাই তিনি আরও বলেন, "একজন পশ্চিমা লোক পাশ্চাত্যে বসবাস করেন। কোনো প্রাচ্যদেশীয় লোক বেড়াতে এলেন সেখানে। পশ্চিমা লোকটি প্রাচ্যদেশীয় লোকটির কাছে একজন অপরিচিত, অচেনা মানুষ। কিন্তু আসল অচেনা ব্যক্তিটি কে? ওই প্রাচ্যদেশীয় লোকটি কি গোটা পশ্চিমের কাছে অচেনা নয়?" আরেক কথায়, অবশ্যই কোনো পবিত্র যুদ্ধ কিংবা কোনো সূফী/দরবেশ কর্তৃক সহিংসতার ব্যবহার আমাদের কাছে অদ্ভূত ও ভুল প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু তার মানে কি সেটি ভুল? (সম্পূর্ণ) সত্যের সাথে আসলে কে অপরিচিত?

মওলানা আরও বলেন, "এই গোটা পৃথিবী একটি বাড়ির মতো। আমরা এর এ কক্ষ থেকে ও কক্ষ, কিংবা এক কোণা থেকে আরেক কোণায় গেলেও আমরা কি একই বাড়িতে অবস্থান করছি না? কিন্তু সূফী/দরবেশ যাঁরা খোদাতা'লার হীরা-জহরত (মানে আধ্যাত্মিকতা) লাভ করেছেন, তাঁরা এই বাড়ি ত্যাগ করে এর ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান, 'ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় আরম্ভ হয়েছে এবং ওই অবস্থায় ফিরে যাবে'।"

এভাবে মওলানার বাণী কালোত্তীর্ণ হয়ে আজ আমাদের জিজ্ঞেস করে, "খোদাতা'লার কোনো খাঁটি প্রেমিক যে মহান প্রভুর এজাযত (কর্তৃত্ব) ধারণ করেন, তা কি তোমরা গ্রহণ বা স্বীকার করো? তাঁরা যা ধারণ করেন, সে জন্যে তাঁরা যে সদাসর্বদা এই দুনিয়ার কাছে অচেনা থাকবেন, তা কি তোমরা দেখতে পাও বা উপলব্ধি করো?" তাহলে প্রকৃত সেকেলে কে? অবশ্যই সেসব লোক যারা নিজেদের সময়কার সংস্কৃতির শেকলে আবদ্ধ; যারা এর চেয়ে উন্নততর (ঐশী) কোনো আদর্শে উজ্জীবিত নয়।

আপনারা যদি দেখতে পান এখানে কী ঘটছে, তাহলে বুঝতে পারবেন যে মওলানা রুমী (রহ:) আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন আমাদেরই নিজেদের অপরীক্ষিত তথা অযাচাইকৃত বিরূপতা ও অপছন্দগুলো ব্যবহার করে। মওলানার অনেক গভীর তাত্ত্বিক কাব্য এ ধরনের কণ্টকাকীর্ণ হওয়ায় অবহেলিত হয়েছে, যার দরুন তিনি ৩৫ নং আলোচনায় বলতে অনুপ্রেরিত হয়েছেন: "খোদাতা'লা কতোই না বিস্ময়করভাবে উদার! তিনি সেসব লোকের প্রতি সীলমোহর মেরে দিয়েছেন, যারা (কানে) শোনে কিন্তু বোঝে না, তর্কবিতর্ক করে কিন্তু তথাপিও কিছুই শেখে না। খোদা উদার। তাঁর গযব হচ্ছে উদার, এমন কী তাঁর ঝোলানো তালা-ও উদার। কিন্তু তাঁর তালা খোলার তুলনায় তাঁর ঝোলানো তালা একেবারেই নগণ্য। কেননা, এই অনুগ্রহ হলো বর্ণনারও অতীত। আমি যদি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ি, তবে তা হবে খোদাতা'লার অসীম দয়ারই সুবাদে।"

এতে একটি কৌতূহলোদ্দীপক পর্যবেক্ষণের উদ্ভব হয়েছে। মওলানা কখনোই তাঁর আলোচনায় সার্বিকীকরণের রীতি মানতেন না; তিনি সুনির্দিষ্ট ঘটনা বা পরিস্থিতি সম্পর্কেই সবসময় আলাপ করতেন। তাঁর আশপাশে অবস্থিত মানুষজনের সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস ও দ্বন্দ্বগুলো ছিল তাঁর বাণীর উপজীব্য; আর তিনি ছিলেন তাঁরই যুগে প্রকাশমান 'পথটির' একজন সাক্ষী ও মুখপাত্র। আর আজো তাঁর বাণী আমাদের শেখাতে পারে।

কোনো ভ্রমণকারী ৭০০ বছর আগে তার পথের ওপর একটি পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে এবং এ ঘটনায় তার জীবনের মোড় ঘুরে গেলে আমরা হয়তো সিদ্ধান্ত নিতে পারবো যে ওই পাথরটি শুধু নৈমিত্তিক এক ব্যাপার ছিল। কিন্তু যদি ওই একই পাথর হাজার হাজার মানুষের শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ আছাড় খাওয়ার কারণ হয়, আর একেকজনকে একেক বার্তা ও একেক শিক্ষা দেয়, তাহলে কি আমরা তাকে নৈমিত্তিক বলতে পারবো? বোকা লোকেরা যখন আছাড় খায়, তখন তারা ওঠে দাঁড়ায় এবং হাঁটা আরম্ভ করে, যেন কিছুই হয়নি। তারা কিছুই শেখে না। জ্ঞানী মানুষ-ই কিন্তু তাঁর আছাড় খাওয়ার মধ্যে এক বৃহত্তর মানে খুঁজে পান। তবে যে পাথর প্রতিটি যুগে ভ্রমণকারীদের আছাড় খাইয়ে দেয়, আর এতে



একেকবার একেক অর্থ জ্ঞাপন করে, সেটি কোনো পাথর নয়, বরং স্বয়ং খোদাতা'লা-ই এর কর্তা।

মওলানা রুমী (রহ:) কর্তৃক ব্যবহৃত অনেক শব্দ ইসলামী প্রেক্ষিতে বেশ ভিন্ন অর্থ বহন করে খৃষ্টানদের অর্থের তুলনায়। যেমন 'বিশ্বাস' শব্দটি অনেক সূফী/দরবেশদের মাঝে যে অর্থ জ্ঞাপন করে তার কাছাকাছি প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি 'জ্ঞাত অবস্থা'। এটি কিন্তু সেই 'বিশ্বাস' শব্দটি নয়, যা দ্বারা কোনো ব্যক্তির পছন্দকৃত পথ ও মতকে বোঝায়। 'কোয়েকারস্' (Quakers) খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের কাছে এর কিছুটা কাছাকাছি অর্থবোধক 'বিশ্বাসদায়ক' শব্দটি ছিল, কিন্তু সেটিও ব্যাপকভাবে মানুষের এতদসংক্রান্ত নিজস্ব পছন্দের বিষয়টির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। মওলানা যখন 'বিশ্বাস' শব্দটি ব্যবহার করেন, তখন তিনি কোনো মতবাদে বিক্রি হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে আলাপের চেয়ে কোনো সঞ্চিত অভিজ্ঞতার প্রভাবে কীভাবে আমাদের জীবনদর্শন বদলে যায় সে ব্যাপারেই আলোচনা করেন বেশি।

অনুরূপভাবে, মওলানা যখন ইসলাম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, তখনই তিনি 'পথটিকে' বুঝিয়েছেন। আজকে মানুষেরা যেমন ইসলাম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ না করেই পূর্ব-ধারণা পোষণ করছে, বা মওলানার সময়েও মানুষেরা যে ধারণা পোষণ করতো, সে ব্যাপারে কিন্তু তিনি আলোচনায় প্রবৃত্ত নন, বরং তিনি আলোকপাত করছেন খোদ আধ্যাত্মিক পথটির প্রতি এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য ও রীতিনীতির প্রতিও। মওলানা যেভাবে বুঝিয়েছেন, ঠিক সেভাবে বোঝা সবসময় সহজ নয়। যেমন, মওলানা রূমী (রহ:) মহানবী (দ:) হিসেবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এবং খোদার কণ্ঠস্বরের যে উল্লেখ করেছেন, তাকে সহজে ধর্মীয় রীতি বা ঐতিহ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়; তবে তিনি যা আসলেই বলেছেন, এসব তার বাহ্যিক আবরণ মাত্র। আলোচনার ৭০তম অধ্যায়ে তিনি এই অন্ধত্ব সম্পর্কেই আলোকপাত করেন: "নর বা নারীরা যেখানেই বড় একটি তালা ঝোলায়, তা কোনো দামী বা মূল্যবান বস্তুর চিহ্ন-ই বহন করে। যেমনভাবে কোনো সাপ রত্নভাণ্ডারকে পাহারা দেয়, তোমাদের যা প্রক্ষিপ্ত করে তা বিবেচনায় নেবে না, বরং তোমরা ওই ধনভাণ্ডারের মূল্যের দিকেই দৃষ্টিনিবদ্ধ করবে।"

আপনারা যদি এসব অনেক অর্থকে এ বইয়ের শিরোনামের মহাসাগরে মৎস্যের মতো সন্তরণ করতে দেখতে পান, তাহলে মওলানার লেখনী কীভাবে পড়তে হয় তা আপনারা জানবেন। এটি হয়তো আপনাদেরকে প্রকৃত মাছ শিকারেও সহায়তা করতে পারে [মানে আধ্যাত্মিকতা অর্জনে সহায়ক হতে পারে - অনুবাদক]।

- ডাগ্ মারম্যান

প্রশ্ন ও মন্তব্য প্রেরণ করুন: Little Known Publications at LKPublictn@aol.com

ভূমিকার স্বত্বাধিকারী - ডাগ্ মারম্যান ১৯৯৯ ইং

কম্পোজিশন স্বত্বাধিকারী - Omphaloskepsis ২০০০ ইং

## সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

[অনুবাদকের মন্তব্য: ভূমিকা লেখকের দ্বারা বইটির নামকরণ বিষয়ে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তা আমার কাছে মওলানার নামকরণের সাথে মেলেনি। আরবেরী-ই সঠিকভাবে তরজমা করেছিলেন ১৯৬১ সালে। তাই ডাগ্ মারম্যানের ভূমিকার কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করা হয়নি।]



## উপদেশ বাণী - ১

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) একবার এরশাদ ফরমান, "উলেমাদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ হলো তারা, যারা রাজা-বাদশাহর দর্শনপ্রার্থী বা দ্বারস্থ হয়; আর রাজা-বাদশাহদের সেরা হলেন তাঁরা, যারা উলেমা (-এ-হক্কানী/রব্বানী)-বৃন্দের দর্শনপ্রার্থী হন। যে রাজা গরিবের দ্বারে গিয়ে দাঁড়ান, তিনি-ই জ্ঞানী; আর যে গরিব লোকেরা রাজার দ্বারস্থ হয়, তারা হতভাগা।"

এক্ষণে এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে মানুষেরা মনে করে উলেমাবৃন্দের কখনোই রাজা-বাদশাহদের দ্বারস্থ হওয়া উচিত নয়। নতুবা তাঁরা সবচেয়ে মন্দ আলেমে পরিণত হবেন। আসলে এটি প্রকৃত অর্থ নয়। বরঞ্চ সবচেয়ে মন্দ আলেমবর্গ রাজা-বাদশাহদের ওপর নির্ভর করে, আর তাদের জীবন ও উদ্দেশ্য রাজা-বাদশাহদের মনোযোগ ও সু-নজরপ্রাপ্তির আবর্তে ঘুরে। ওই ধরনের আলেম পড়ালেখা শেখে রাজা-বাদশাহদের কাছ থেকে উপহারসামগ্রী ও সম্মান লাভ এবং উচ্চপদ পাওয়ার আশায়।

অতএব, ওই ধরনের আলেম নিজেদের উন্নত করে এবং জ্ঞানার্জন করে রাজা-বাদশাহদের বদৌলতে। তারা আলেম হয় নিজেদের রাজা-বাদশাহদের ভয়ে। তারা রাজার নিয়ন্ত্রণে নিজেদেরকে ছেড়ে দেয়। রাজা-বাদশাহবর্গ তাদের জন্যে যে পরিকল্পনার ছক আঁকে, সেটির সাথেই তারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। তাই তারা রাজার দ্বারস্থ হোক, অথবা রাজাই তাদের দ্বারে যাতায়াত করুক, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা হচ্ছে দর্শনপ্রার্থী; আর রাজা হলো দর্শনদাতা।

কিন্তু উলেমাবৃন্দ যখন রাজা-বাদশাহদের তুষ্টির জন্যে জ্ঞানান্বেষণ করেন না, বরং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সত্যের খাতিরেই জ্ঞানচর্চা করেন - যখন তাঁদের কথা ও কাজ তাঁদেরই শেখা সত্যাশ্রয়ী হয় ও সত্যের জন্যেই ব্যবহৃত হয়, কেননা এটি-ই তাঁদের প্রকৃতি এবং এটি ব্যতিরেকে তাঁদের জীবন অর্থহীন, মাছ যেমন না-কি শুধু পানিতে বাঁচতে সক্ষম - তবে ওই শ্রেণির আলেম খোদাতা'লার নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনায় নিজেদের সমর্পিত করেন নিঃসন্দেহে। তাঁরা আম্বিয়া (আ:)-মণ্ডলীর হেদায়াত (সঠিক

পথনির্দেশনা) দ্বারা আশীর্বাদধন্য হন। তাঁদের সময়কার সকলেই নিজেদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁদেরই (আদর্শের) ছোঁয়া পান এবং তাঁদের দৃষ্টান্ত থেকে অনুপ্রেরণাও লাভ করেন।

এ ধরনের আলেম-উলেমা (-এ-হক্কানী/রব্বানী) কোনো রাজার দর্শনার্থী হলেও বাস্তবে তাঁরাই হলেন দর্শনদাতা, আর রাজা হলেন দর্শনপ্রার্থী। কেননা, প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজা-ই এসব আলেমের কাছ থেকে গ্রহীতা এবং তাঁদের সাহায্য-প্রাপকও। এ রকম আলেম রাজা-বাদশাহদের ওপর মোটেও নির্ভরশীল নন। তাঁরা হলেন আলো বিচ্ছুরণকারী সূর্যের মতো, যার সামগ্রিক কাজ-ই হলো সবাইকে দান করা, সর্বজনীনভাবে; যেমন, সাধারণ পাথরকে দামী মণিমাণিক্যে রূপান্তর করা, পাহাড়পর্বতকে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও ইস্পাতের খনিতে পরিণত করা, ভূ-ভাগকে উর্বর ও শস্যশ্যামল করা, গাছ-গাছালিকে ফলবতী করা এবং ঠাণ্ডা বাতাসে উষ্ণতা নিয়ে আসা। তাঁদের কারবার-ই হলো দান করা, তাঁরা গ্রহীতা হন না। আরবীয় সমাজ একটি প্রবাদ বাক্যে এটি ব্যক্ত করেন:

"আমরা শিখেছি করতে দান-সদকা,
শিখিনি কভু হতে গ্রহীতা।"

অতএব, যে উপায়েই তাঁদের সাথে দেখা করেন না কেন, রাজা-বাদশা-ই হলেন এক্ষেত্রে তাঁদের দর্শনপ্রার্থী।

এক্ষণে আমার মনে এক ভাবনার উদ্রেক হয়েছে যে আল-কুরআনের কোনো আয়াতের উদ্ধৃতি দেই, যদিও তা বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তথাপি এই চিন্তা আমার মনে এসেছে এখন, আর আমি তা ব্যক্ত করতে চাই যাতে তা লিপিবদ্ধ হয়। আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান:

"হে রাসূল, আপনার হাতে বন্দী লোকদের বলুন, আল্লাহতা'লা তোমাদের অন্তরে ভালো কিছু থাকলে তিনি যা নিয়েছেন, তার চেয়েও বেশি দান করবেন; আর তিনি তোমাদের ক্ষমা-ও করবেন। নিশ্চয় আল্লাহতালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতি দয়াবান।" [সরাসরি অনুবাদ]

এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (দ:)'র প্রতি সে সময় নাযেল হয়েছিল, যখন তিনি (মক্কার) অবিশ্বাসীদেরকে পরাভূত করেছিলেন; (যুদ্ধে) কেউ কেউ হয়েছিল নিহত, আর অনেকে হয়েছিল হাত ও পায়ে শেকলবন্দী। ওই



বন্দীদের মধ্যে ছিলেন তাঁরই চাচা হযরত আব্বাস (রা:)-ও। শেকলাবদ্ধ বন্দীরা তাদের গ্লানিকর অসহায়ত্বে সারা রাত কেঁদেছিলেন এবং মাতম-ও করেছিলেন। তারা নিজেদের জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, তরবারির ফায়সালা-ই আশঙ্কা করছিলেন ওই সময়। এ দৃশ্য দেখে মহানবী (দ:)'র ঠোঁটে স্মিতহাস্যরেখা ফুটে ওঠে।

বেদনাক্লিষ্ট বন্দীরা বল্লেন, "দেখো, তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মাঝে শেষমেশ একজন মানুষের বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। তিনি এক মহামানব হওয়ার যে দাবি করা হয়, তা সত্য নয়। আমরা বন্দীরা শেকলাবদ্ধ দেখে তিনি ওখানে দাঁড়িয়ে আনন্দ অনুভব করছেন। নিজ প্রবৃত্তির অনুগত অন্য যে কারো মতো - যখনই সে শত্রুদের ওপর বিজয় লাভ করে এবং তাদেরকে নিজ মর্জি-মাফিক ধ্বংস করতে পারে, আর এতে আনন্দ ও সুখ খুঁজে পায়।"

মহানবী (দ:) বন্দীদের অন্তরের খবর জেনে বল্লেন, "না, তা মোটেও নয়। আমি কখনোই আমার হাতে পরাস্ত শত্রুদের বিপর্যস্ত অবস্থা কিংবা দুঃখকষ্ট দেখে হাসাহাসি করবো না। তবে আমি উৎফুল্লবোধ করছি এবং হাসছি এ কারণে যে, অন্তর্দৃষ্টি (দিব্যদৃষ্টি) দ্বারা আমি দেখতে পাচ্ছি মানুষদেরকে জামার 'কলার' ও শেকলে ধরে আমি জাহান্নামের কালো ধোঁয়া থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করছি; আর তারা কাঁদছে এবং অভিযোগ করছে এই বলে, 'কেন আপনি আমাদেরকে এই আত্মবিনাশী গর্ত থেকে বের করে ওই নিরাপত্তাপূর্ণ বাগানে নিয়ে যাচ্ছেন?' এমতাবস্থায় হাসি আমাকে আপ্লুত করছে।

"কিন্তু যেহেতু তোমাদেরকে এখনো ওই দিব্যদৃষ্টি দেয়া হয়নি যা আমাকে দেয়া হয়েছে, সেহেতু আমি তোমাদের বলছি, শোনো! আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এ কথা জানানোর জন্যে আমাকে আদেশ করেছেন যে, প্রথমে তোমরা সৈন্য জড়ো করে তোমাদেরই শৌর্যবীর্যের ওপর নির্ভর করে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছো। তোমরা নিজেদের বলেছো, 'আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়ী হবো এবং তাদেরকে নির্মূল করবো।' কিন্তু তোমরা তোমাদের চেয়েও (সর্ব)-শক্তিমানের ওই ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারো নি। আর তাই তোমরা যা কিছু পরিকল্পনা করেছিলে, সবই উল্টো হয়েছে। এখনো তোমাদের ভয়-ভীতির মাঝেও তোমরা নিজেদের (ভ্রান্ত)

বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছো এবং একক (পবিত্র) সত্তার বাস্তবতা দর্শনে ব্যর্থ হচ্ছো। ওই (ঐশী) ক্ষমতা দর্শনের পরিবর্তে তোমরা আমার শক্তিকেই গণনায় নিয়েছো কেবল; কারণ আমার দ্বারা বিজিত হওয়ার ব্যাপারটি তোমাদের কাছে বেশি সহজে গ্রহণযোগ্য।

"তথাপি তোমাদের বর্তমান অবস্থাতেও আমি তোমাদের বলছি, তোমরা যদি আমার ক্ষমতাকে স্বীকার করো এবং সকল অবস্থায় তোমাদের লয়কে আমার ইচ্ছাধীন বলে মেনে নাও, তাহলেও আমি তোমাদেরকে এই দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি দিতে পারবো। ওই মহান সত্তা যিনি সাদা বৃষের ঔরসে কালো বৃষের জন্ম দিতে সক্ষম, তিনি অবশ্যই কালো বৃষের ঔরসে সাদা বৃষের জন্ম-ও নিশ্চিত করতে সক্ষম। তোমাদের ইতিপূর্বেকার রীতি পরিত্যাগ করো, আমিও একইভাবে তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া সহায়-সম্পত্তি তোমাদের কাছেই আবার ফিরিয়ে দেবো; বস্তুতঃ আরও কয়েকগুণ বেশি দেবো। অধিকন্তু, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত অভিযোগ থেকে তোমাদেরকে অব্যাহতি দেবো, আর ইহলোক ও পরলোকে তোমাদের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ মঞ্জুর করবো।"

অতঃপর হযরত আব্বাস (রা:) বলেন, "আমি তওবা করছি এবং পূর্ববর্তী রীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি।"

রাসূলুল্লাহ (দ:) এতদশ্রবণে বলেন, "আপনি যে দাবিটি করছেন, খোদাতা'লা তার একটি প্রতীক বা নমুনা দেখতে চান; কেননা ভালোবাসার বড়াই করা সহজ, কিন্তু এর প্রমাণ ভিন্ন কথা।"

হযরত আব্বাস (রা:) পাল্টা প্রশ্ন করেন, "কী ধরনের প্রতীক বা নমুনা আপনি দেখতে চান?"

হুযূর পূর নূর (দ:) জবাবে বলেন, "আপনার কাছে অবশিষ্ট যে অর্থসম্পত্তি আছে, তা ইসলামী বাহিনীকে দান করুন, যাতে বাহিনী শক্তিশালী হতে পারে। অবশ্য তা তখন-ই হতে পারে, যখন আপনি সত্যিকার মুসলমান হবেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ভালাই কামনা করবেন।"



হযরত আব্বাস (রা:) বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (দ:)! আমার কাছে আর কী থাকবে? তারা আমার থেকে সবই কেড়ে নিয়েছে, ঘর ছাওয়ার জন্যে ব্যবহৃত নলখাগড়ার শুকনো কাণ্ডনির্মিত ফরাশ-ও রাখেনি।"

মহানবী (দ:) জবাবে বলেন, "দেখুন, আপনি তো আপনার পূর্ববর্তী রীতি পরিত্যাগ করেননি। আপনি এখনো সত্যের বিভা দর্শন করেননি। আমি কি আপনাকে বলবো কী পরিমাণ সম্পত্তি এখনো আপনার মালিকানাধীন আছে? কোথায় তা আপনি লুকিয়ে রেখেছেন? কার জিম্মাদারিতে তা রেখেছেন? কোথায় তা লুকিয়ে বা পুঁতে রেখেছেন?"

হযরত আব্বাস (রা:) বিস্ফোরিত কণ্ঠে বলেন, "আল্লাহ মাফ করুন!"

রাসূলুল্লাহ (দ:) এরপর বলেন, "আপনি কি আপনার মায়ের জিম্মাদারিতে অতো পরিমাণ সম্পত্তি গচ্ছিত রাখেননি? অমুক দেয়ালের নিচে আপনি কি আপনার স্বর্ণ পুঁতে রাখেননি? আপনি কি আপনার মায়ের কাছে বিস্তারিতভাবে বলেননি এ কথা - 'আমি ফিরতে পারলে এ সম্পত্তি আমাকে ফেরত দেবেন; কিন্তু নিরাপদে না ফিরলে অতো পরিমাণ অমুক কাজে এবং অতো পরিমাণ তমুক লোককে দেবেন; আর অতো পরিমাণ আপনার জন্যেই রেখে দেবেন?"

হযরত আব্বাস (রা:) এ কথা শোনার পর পূর্ণ আনুগত্যে হাত উত্তোলন করেন এবং বলেন, "এয়া রাসূলাল্লাহ (দ:)! ইতিপূর্বে আমি সবসময় মনে করতাম আপনি হামান, শাদ্দাদ, নমরুদ ও অন্যান্য অতীতকালের রাজা-বাদশাহর (জৌলুসময়) ভাগ্য বহন করে চলেছেন। কিন্তু আপনার এ কথা শুনে এখন আমি জানি, আপনার এই নেয়ামত (আশীর্বাদ) খোদায়ী (ঐশী) কোনো দান, যা অপার্থিব এবং যা স্বয়ং খোদার আরশ থেকে এসেছে।"

মহানবী (দ:) জবাবে বলেন, "এবার আপনি সত্য কথা বলেছেন। আপনার মধ্যে লুক্কায়িত সন্দেহের কোমরবন্ধ ছিঁড়ে যাওয়ার শব্দ আমি শুনেছি। আমার আত্মার অন্তস্তলে একখানা কান আমার আছে, যা দ্বারা কারো অন্তরে সন্দেহ টুটে যাওয়া আমি শুনতে পাই। আপনি যে এখন বিশ্বাস করেন (দ্বীন ইসলামে), এ বিষয়টি সত্য।"

আমি এ ঘটনাটি আমীর (শাসক)-কে জানিয়েছিলাম যে উদ্দেশ্যে তা হলো, শুরুতে আপনি (আমীর সাহেব) মুসলমান রাজ্যের নিশান-বরদার তথা পতাকা উড্ডীনকারী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছিলেন। আপনি বলেছিলেন, "আমি নিজেকে মুক্তিপণস্বরূপ পেশ করছি; আমি নিজ আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিচার-বিবেচনা কোরবানী করছি যাতে ইসলাম ধর্ম নিরাপদ ও শক্তিশালী থাকে।" কিন্তু যেহেতু আপনি খোদার চিন্তা ভুলে এবং সব কিছু তাঁরই সৃষ্ট এ কথা মনে না রেখে আপনার নিজস্ব পরিকল্পনার ওপর আস্থা রেখেছিলেন, সেহেতু আপনার সমস্ত উদ্দেশ্যরই উল্টোটা হয়েছে। তাঁতারদের সাথে আঁতাত করে আপনি অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদেরকে সিরীয় ও মিসরীয়দের ধ্বংস করতে সহায়তা করছেন, যার পরিণতিতে ইসলামী রাজ্যেরই বিনাশ সাধন হতে পারে। এমতাবস্থায় আপনি ইসলাম ধর্মের টিকে থাকার জন্যে যে পরিকল্পনা করেছেন, খোদাতা'লা তারই বিনাশ সাধন করেছেন।

অতএব, খোদার দিকে মুখ ফেরান, কেননা পরিস্থিতি বিপজ্জনক। ওহে বন্ধু, তবু আপনার এ বর্তমান অবস্থাতেও নিরাশ হবেন না, বরং খোদার ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ করুন। আপনি মনে করেছিলেন আপনার আত্মিক শক্তি বুঝি আপনার নিজেরই, ঠিক যেমনিভাবে হযরত আব্বাস (রা:) ও অন্যান্য বন্দীরা তা-ই ভেবেছিলেন; এর ফলে আপনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। রাসূলুল্লাহ (দ:) যেমন ওই বন্দীদের দুঃখকষ্টে হেসেছিলেন, আমিও তেমনি আপনার বিব্রতকর অবস্থায় উৎফুল্লবোধ করছি। কেননা, এই দুর্বলতা ও কষ্টভোগ থেকে যা হারিয়েছে তার চেয়েও বড় কিছু অর্জিত হতে পারে। অতএব, নিরাশ হবেন না; কারণ

"খোদাপ্রদত্ত স্বস্তিতে কেউ হয় না নিরাশ,
ব্যতিক্রম শুধু যারা করে অবিশ্বাস।"

আমীরের সাথে আমার এভাবে কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল তিনি যাতে সব বিষয় সঠিক দৃষ্টিকোণ্ থেকে বিবেচনা করতে পারেন এবং খোদার ইচ্ছা সবিনয়ে মেনে নিতে পারেন। তিনি অত্যন্ত উচুঁ মর্যাদা থেকে অধঃপতিত হয়েছেন; তবু এ উপায়ে হয়তো তাঁর উন্নতি হতে পারে। জীবন সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহ (আমাদের) প্রদর্শন করতে পারে, কিন্তু এগুলোর উৎস সম্পর্কে ভুলে গেলে এগুলোর পেছনে লুকোনো রয়েছে এক বড়



ফাঁদ। আল্লাহতা'লা-ই এই মহাপরিকল্পনা করেছেন যাতে আমরা নিজেদের আত্মম্ভরিতা ও অন্তঃসারশূন্যতার দরুন এ সকল পরিকল্পনা ও ভাবনাকে নিজেদের বলে দাবি না করতে শেখি।

সব কিছু যদি যেভাবে বাহ্যতঃ দেখা যায় সে মোতাবেক সত্য হতো, তবে মহানবী (দ:) এতো তীক্ষ্ণ, এতো আলোকিত অন্তর্দৃষ্টি (দিব্যদৃষ্টি) দ্বারা আশীর্বাদধন্য হওয়া সত্ত্বেও আরয করতেন না-

"হে প্রভু, সকল বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা আমায় করুন প্রদর্শন;
আপনি যে বস্তুকে দেখান সুদর্শন, বাস্তবে তার বিশ্রী আবরণ;
আপনি যে বস্তুকে দেখান কদাকার, প্রকৃতপ্রস্তাবে তা সুদর্শন;
আমাদের প্রতিটি বস্তু সেভাবে দেখান, যেটির বাস্তব অবস্থা যেমন,
যাতে আমাদের না হয় সেটির ফাঁদে পতন।"

এক্ষণে তোমাদের বিচারবুদ্ধি যতো ভালো ও স্পষ্ট-ই হোক না কেন, তা নিশ্চয় মহানবী (দ:)-এর বিচারবুদ্ধির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর নয়। অতএব, (তোমাদের) প্রতিটি চিন্তা ও ধারণার ওপর আস্থা রেখো না, বরং খোদাতা'লার প্রতি ও তাঁর ঐশী জ্ঞান-প্রজ্ঞার ওপর আস্থা রেখো।

## উপদেশ বাণী -২

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) বলেন: "আমাদের শায়খ কোনো শব্দ উচ্চারণ করেন না।"

মওলানা রূমী (রহ:) জবাব দেন: উত্তম, আমার চিন্তা-ই তোমাকে আমার উপস্থিতিতে নিয়ে এসেছে। আমার (সম্পর্কে) এই চিন্তা তোমাকে এ কথা বলেনি, 'আপনার কী হাল'? শব্দ বা বচনহীন চিন্তা-ই তোমাকে এখানে টেনে এনেছে। তোমাকে আমার বাস্তবতা যদি শব্দ (কথা) ছাড়াই কাছে টানে এবং তোমাকে অন্য কোথাও স্থানান্তর করে, তাহলে কথার মধ্যে আশ্চর্যের আর এমন কী আছে? কথাবার্তা হলো বাস্তবতার ছায়া, বাস্তবতার একটি শাখা মাত্র। ছায়া যেহেতু কাছে টানে, তাহলে বাস্তবতা যে আরও কতো বেশি তা করতে পারে!

কথাবার্তা হচ্ছে একটি অসীলা। যে বস্তু এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির কাছে টানে তা আন্তরিক বন্ধন, কথাবার্তা নয়। কেউ যদি কোনো নবী (আ:) বা ওলী (রহ:)-এর কাছ থেকে এক লক্ষবার-ও অলৌকিক ঘটনা (মো'জেযা/কারামত) প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু সেসব অলৌকিকত্বের উৎস ওই নবী (আ:) বা ওলী (রহ:)-এর সাথে আত্মিক সম্পর্ক না রাখে, তবে এসব অলৌকিক ঘটনার ফলাফল শূন্য হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের আলোড়িত করে যে বস্তুটি, সেটি এই অন্তঃস্থ উপাদান-ই। যদি খড়ের মধ্যে হলুদাভ বাদামি রংয়ের কোনো উপাদান না থাকতো, তাহলে ওই খড় কখনোই হলুদাভ বাদামি রংয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতো না [মওলানা এখানে স্থির বিদ্যুতের কথা বলছেন]। এ দুটো একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকতো না, যদি তোমরা লোমশ চামড়া দিয়ে ওই হলুদাভ বাদামি রংয়ের উপাদানকে ঘষতেও। এ দুইয়ের মধ্যে আদান-প্রদানের ঘটনা লুকোনো একটি বিষয়, এটি দৃশ্যমান কোনো কিছু নয়।

ভাবনা-ই আমাদেরকে কাছে টানে। কোনো বাগান সম্পর্কে চিন্তা আমাদেরকে ওই বাগানে নিয়ে আসে। কোনো দোকান সম্পর্কে চিন্তা আমাদেরকে সেখানে টেনে নেয়। তবে এসব চিন্তার মাঝে এক ধোকা লুক্কায়িত আছে। তুমি কি কখনোই এমন নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় যাও নি, যেখানে যাওয়াটা তুমি ভেবেছিলে উত্তম, কিন্তু যেয়ে কেবল হয়েছো হতাশ? এসব চিন্তা তাহলে এক আচ্ছাদনের মতো, আর তাতে কেউ একজন রয়েছে লুকিয়ে। যেদিন বাস্তবতা তোমাকে কাছে টানবে এবং ভাবনার এই আচ্ছাদন অদৃশ্য হয়ে যাবে, সেদিন-ই কোনো নৈরাশ্য আর থাকবে না। তখন-ই তুমি বাস্তবতা যেভাবে আছে সেভাবে তাকে দেখতে পাবে, আর বেশি কিছু নয়।

"ওই দিন গোপন বিষয়গুলো বিচারের আওতায় আনা হবে।"
[সরাসরি অনুবাদ]

অতএব, আমার কথা বলার কারণ কী? বাস্তবে যা কাছে টানে তা একটিমাত্র বস্তু, কিন্তু দৃশ্যতঃ তা অনেক বস্তু মনে হয়। আমাদের গ্রাস করে রেখেছে এক শ কিসিমের কামনা-বাসনা। আমরা বলি, 'আমি সেমাই চাই'; 'আমি সিঙ্গারা-সমুচা চাই'; 'আমি হালুয়া চাই'; 'আমি পিঠা চাই'; 'আমি ফল-ফ্রুট চাই'; 'আমি খেজুর চাই'। আমরা এগুলো এক



এক করে উল্লেখ করি, কিন্তু এগুলোর মূলে রয়েছে একটি বিষয়-ই; আর তা হলো ক্ষুধা। তুমি কি দেখো না কীভাবে আমাদের এই একটিমাত্র প্রয়োজন মেটানোর পরে আমরা বলি, 'আর অন্য কোনো কিছুর দরকার নেই?' সুতরাং দশ কিংবা এক শ বস্তু নয়, বরং একটি বিষয়-ই আমাদেরকে কাছে টেনেছিল।

"আর তাদের সংখ্যা আমরা শুধু এক পরীক্ষা হিসেবে রেখেছি।"
[সরাসরি অনুবাদ]

এই দুনিয়ার অনেক বস্তু-ই আল্লাহতা'লার প্রদত্ত পরীক্ষাস্বরূপ বিদ্যমান। কেননা, সেগুলো ওই একটিমাত্র বাস্তবতাকে লুকিয়ে রেখেছে। প্রবাদ আছে, দরবেশ একজন, কিন্তু মানুষ এক শ জন। এর মানে দরবেশের সম্পূর্ণ মনোযোগ এক সত্যের প্রতি, আর মানুষেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে এক শটি বাহ্যিক আবরণে। কিন্তু কোন্ এক শটি? কোন্ পঞ্চাশটি? কোন্ ষাটটি? আয়নার প্রতিবিম্বের এই দুনিয়াতে নিজেদের হারিয়ে তারা চেহারা ও হাতপাহীন, মস্তিষ্ক ও আত্মাবিহীন মানব, যারা যাদুকরি তাবিজ-কবচের মতো, পারদের মতো কাঁপছে। তারা জানে না তারা কারা। তাদেরকে ষাট বা এক শ অথবা এক হাজার জনই বলো, আর (এর মোকাবেলায়) দরবেশ একজন; এ দৃশ্য আপনাআপনি এক পরীক্ষা নয় কি? কেননা, সত্য হলো ওই শত শত কিছুই নয়, একদম শূন্য, আর ওই দরবেশ (একাই) এক সহস্র, এবং এক লক্ষ, এবং লক্ষ লক্ষ।

একবার এক রাজা (সেনাবাহিনীর) কোনো এক সৈন্যকে এক'শ সৈন্যের খাদ্য-রসদ দান করেন। এতে সেনাবাহিনী প্রতিবাদ করে, কিন্তু রাজা চুপ করে থাকেন। যেদিন যুদ্ধের সময় উপস্থিত হয়, সেদিন সব সৈন্য ময়দান ছেড়ে পালায়; শুধু ওই একজন সৈন্য একাই লড়াই করে যায়। অতঃপর রাজা বলেন, "দেখেছো, এ জন্যেই আমি ওই একমাত্র সৈন্যকে এক শ জনের খাদ্য-রসদ বরাদ্দ করেছিলাম।"

আমাদের সমস্ত পক্ষপাত ত্যাগ করে খোদাতা'লার কোনো ওলী (বন্ধু)-কে খুঁজে বের করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তবে আমাদের সারা জীবন পার্থক্য বুঝতে অক্ষম লোকদের সান্নিধ্যে অতিবাহিত করার দরুন আমাদের নিজেদেরই পার্থক্য বোঝার সামর্থ্য কমে যায়, আর ওই প্রকৃত বন্ধু অচেনা অবস্থায়ই পাশ দিয়ে আমাদের অতিক্রম করে যান।

পার্থক্য বোঝার সামর্থ্য এমন-ই এক গুণ যা প্রত্যেক মানুষের মাঝে লুক্কায়িত আছে। তুমি কি দেখো না একজন উন্মাদ হাত-পা থাকা সত্ত্বেও এই পার্থক্য করার গুণ হতে বঞ্চিত? পার্থক্য বোঝা তোমারই অন্তঃস্থ একটি সূক্ষ্ম মৌলিক গুণ। অথচ তুমি দিন-রাত সেই শারীরিক আকৃতির প্রতিপালনে নিমগ্ন, যা সঠিক ও ভুলের পার্থক্য বুঝতেই অক্ষম। তুমি কেন এই শারীরিক আকৃতির সেবায় সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছো এবং ওই সূক্ষ্ম মৌলিক গুণের প্রতি পুরোপুরি অবহেলা দেখিয়েছো? ওই গুণের বলেই শরীর অস্তিত্বশীল, কিন্তু ওই গুণ কোনোভাবেই শারীরিক আকৃতির ওপর নির্ভরশীল নয়।

চোখ ও কানের জানালা দিয়ে যে আলো আপন প্রভা ছড়ায়, সেসব জানালার অস্তিত্ব না থাকলেও আলোর প্রভা তাতে থেমে থাকবে না। সেটি অন্য জানালা খুঁজে নেবে কিরণ ছড়াবার জন্যে। তুমি যদি সূর্যের সামনে একটি প্রদীপ নিয়ে আসো, তবে তুমি কি এ কথা বলবে, 'আমি প্রদীপের সাহায্যে সূর্যকে দেখি?' আল্লাহ মাফ করুন! তুমি প্রদীপ না আনলেও সূর্য তার কিরণ ছড়াতোই। তাহলে প্রদীপের কী-ই বা প্রয়োজন?

রাজা-বাদশাহদের সাথে সংশ্রব রাখার বিপদ এটি-ই। বিষয়টি এই নয় যে তুমি তোমার প্রাণ হারাতে পারো - আজ হোক বা কাল হোক, আমাদের তো যে কোনোভাবে জীবনাবসান হবেই - তাতে কিছু এসে যায় না। বিপদ দেখা দেয় তখন-ই, রাজা-বাদশাহবর্গ যখন দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয় এবং তাদের প্রভাবের সম্মোহনীশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর তা বড় এক প্রদীপে রূপ নেয়, ওই সময় যে ব্যক্তি তাদের সাথে সংশ্রব রাখে, তাদের সাথে বন্ধুত্বের দাবি করে এবং তাদের কাছ থেকে টাকাপয়সা নেয়, সে অবধারিতভাবে তাদের খায়েশ অনুযায়ী-ই কথা বলে। ওই ব্যক্তি রাজা-বাদশাহদের দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণের সমস্ত কথাবার্তা পুরো মনোযোগসহ শুনতে বাধ্য থাকে এবং তা অস্বীকার বা অমান্য করতেও অক্ষম হয়।

আর সেখানেই বিপদ ওঁত পেতে আছে; এর দরুন প্রকৃত উৎসের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে যেতে থাকে। তুমি (অন্তরে) রাজা-বাদশাহদের প্রতি আগ্রহ লালন করলে আধ্যাত্মিক জীবনের মৌলিক পূর্বশর্ত যে অপর আগ্রহটি, তা তোমার কাছে অপরিচিত হয়ে যায়। রাজা-বাদশাহদের পথ ধরে তুমি



যতো এগোবে, ততোই মাশূক তথা প্রেমাস্পদ (মানে খোদাতা'লা) যে রাজ্যে অবস্থান করেন, তার গতিপথ বা গন্তব্যের ঠিকানা হারিয়ে যেতে থাকে। দুনিয়াদার লোকের সাথে যতো সখ্যতা তুমি গড়ে তোলো, ততোই মাশূক তোমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। আহলে দুনিয়া তথা দুনিয়াওয়ালাদের দিকে পথ ধরা মানে তাদের শাসনের অধীনে তোমার চলে যাওয়া। একবার তুমি তাদের পথ ধরলে শেষমেশ খোদাতা'লা তাদেরকে তোমার ওপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা প্রদান করেন।

মহাসমুদ্রে পৌঁছে এক ছোট কলসভর্তি জলে সন্তুষ্ট থাকা সত্যি পরিতাপের বিষয়। সমুদ্রে তো রয়েছে মণি-মুক্তো ও নানা ধরনের মূল্যবান বস্তু। এমতাবস্থায় শুধু (কলসে) পানি নেয়ার মূল্য কতোখানি? বুদ্ধিমান মানুষদের জন্যে এটি কতোটুকু গর্বের বিষয় হতে পারে? এই দুনিয়াটি হলো প্রকৃত সাগরের মাঝে এক বিন্দু জল মাত্র। ওই মহাসাগর সূফী সাধক/দরবেশদেরই বিদ্যা, আর ওর জলরাশির (গভীরে) রয়েছে খোদ মুক্তোটি (মানে খোদাতা'লা)।

এই পৃথিবী শুধু ফেনিল জলরাশি, যা (জাহাজ থেকে ভার কমানোর জন্যে ফেলে দেয়া মূল্যহীন) ভাসমান বর্জ্যে পূর্ণ। তথাপি ঘূর্ণীয়মান ও প্রবাহমান ছন্দময় ঊর্মিমালার প্রভাবে এ ফেনিল জলরাশি এক সুনির্দিষ্ট সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু এই সৌন্দর্য তো অন্য কোথাও থেকে ধার করা কোনো বস্তু। এটি একটি জাল মুদ্রা যা দেখতে জ্বলজ্বল করে।

মানুষ হলো খোদাতা'লার এক দূরবীন; কিন্তু দূরবীন ব্যবহারের জন্যে প্রয়োজন কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানীর। ওই দূরবীন যদি কোনো সব্জি-তরকারি বিক্রেতা বা মুদি দোকানী পায়, এতে তাদের কী ফায়দা হবে? তারা কি সেটি দ্বারা ঘূর্ণীয়মান তারকারাজির কক্ষপথ বা গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান কিংবা সেগুলোর প্রভাব ও অন্যান্য বৃত্তান্ত জানতে সক্ষম হবে? কেবল একজন জ্যোতির্বেত্তার হাতেই ওই দূরবীন তার প্রকৃত মূল্য খুঁজে পাবে।

এই তাম্রনির্মিত দূরবীন যেমন আসমানের গ্রহ-নক্ষত্রের চলাচল আয়নার মতো প্রতিফলন করে, তেমনি মানব-ও খোদাতা'লার এক দূরবীন বটে।

"আমরা আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি।" [সরাসরি অনুবাদ]

যে সকল পুণ্যাত্মা বাস্তবতা দর্শনে ও নিজ নিজ সত্তার দূরবীন দ্বারা ঐশী রীতিনীতি শিক্ষায় খোদাতা'লা কর্তৃক পরিচালিত হয়েছেন, তাঁরা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, প্রতি ঝলকে ঝলকে খোদার ঐশী বিধান প্রত্যক্ষ করে থাকেন। সত্য বটে, এটি এমনই এক অসীম সৌন্দর্য যা তাঁদের আয়নায় প্রতিফলিত হয় নিরবধি।

আল্লাহতা'লার বান্দা-মণ্ডলী নিজেদেরকে এক (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও সুষমার আবরণে ঢেকে রাখেন যা অন্যদের চোখের আড়ালে থেকে যায়। এ সকল বান্দা মাত্রাতিরিক্ত ঐশীপ্রেমের কারণে বা তা হারানোর শঙ্কায় নিজেদেরকে ছদ্মাববরণে (লোকচক্ষুর) আড়াল করে রাখেন, যেমনটি (কবি) মোতানাব্বী সুন্দরী নারীদের সম্পর্কে বলেন:

"নারীকুল পরিধান করে অলঙ্কৃত রেশমের বসন,
নয়কো তা সৌন্দর্যচর্চার ভূষণ,
বরঞ্চ কামুক নয়ন হতে নিজ সৌন্দর্যেরই সুরক্ষণ।"

## উপদেশ বাণী - ৩

আমীর (পারসিক শাসক যিনি মওলানা রুমীর দরবারি মজলিশে উপস্থিত ছিলেন, তিনি) বলেন: "আমার রূহ (আত্মা) রাত-দিন খোদাতা'লার খেদমতে অতিবাহিত করার নিয়্যত (অভিপ্রায়) রাখে, কিন্তু মোংগল-সম্পর্কিত বিষয়গুলোর দায়িত্ব থাকায় সে ধরনের (দ্বীনী) খেদমতের সময় আমার হাতে নেই।"

মওলানা রুমী (রহ:) জবাব দেন: (আপনার) ওই ধরনের কাজ-ও খোদাতা'লার খেদমতসূচক। কেননা আপনার দেশের জন্যে তা শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের উপায়। আপনি নিজেকে, আপনার মালিকানাধীন সহায়-সম্পদ ও আপনার সময়কে উৎসর্গ করছেন যাতে কিছু মানুষের অন্তর শান্তিপূর্ণভাবে আল্লাহর এরাদা (ঐশী ইচ্ছা) মান্য করার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। অতএব, এটিও উত্তম (নেক) কর্ম। খোদা পাক আপনাকে এ ধরনের নেক কর্মে প্রবৃত্ত করেছেন এবং আপনি যা করেন তার প্রতি আপনার প্রচণ্ড ভালোবাসা খোদাতা'লার আশীর্বাদেরই প্রমাণ বহন করে। তবে আপনার কাজের প্রতি এ মহব্বত যদি দুর্বল হয়ে পড়ে,



তাহলে তা হবে ওই আশীর্বাদ অস্বীকারেরই একটি আলামত বা চিহ্ন। কেননা খোদাতা'লা শুধু লায়েক বা যোগ্যদেরকেই ওই সব সঠিক মনোভাব (তথা আচরণ) গ্রহণের দিকে পরিচালনা করেন যা দ্বারা আধ্যাত্মিক পুরস্কার অর্জন করা যাবে।

উষ্ণ স্নানের (হাম্মামের) কথাই ধরা যাক। এর তাপ আসে শুকনো খড়, জ্বালানি কাঠ, গোবর সারের মতো জ্বালানি থেকে। একই ভাবে খোদাতা'লাও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মন্দ ও অপ্রীতিকর কিন্তু বাস্তবে পবিত্রতা ও নির্মলতার মাধ্যম এমন বিষয় বা বস্তু ব্যবহার করে থাকেন। ওই স্নানের (জ্বালানির) দৃষ্টান্তের মতোই পুরুষ বা নারী (নেক) কর্মোদ্যম লাভ করে পবিত্র হন এবং সকল মানবজাতির জন্যেও উপকারী হয়ে ওঠেন।

(এ পর্যায়ে মওলানার দরবারে কয়েকজন বন্ধুর আগমন হয়; তিনি ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বলেন): আমি যদি আপনাদের প্রতি খেদমতগার না হই এবং আপনাদের স্বাগত না জানাই বা কুশল জিজ্ঞেস না করি, তাহলে এটি সত্যি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি চিহ্ন হবে। এই পরিস্থিতিতে শ্রদ্ধাই যথাযথ। কেউ প্রার্থনারত হলে তার উচিত নয় তার বাবা বা ভাইকে স্বাগত জানানোর জন্যে তা (প্রার্থনা) বন্ধ করা। প্রার্থনায় মনোনিবিষ্ট থাকার সময় বন্ধুদের প্রতি অমনোযোগী হওয়া সর্বোচ্চ স্তরের শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং শ্রেষ্ঠতম সৌজন্য; কেননা ওই ব্যক্তি প্রিয়জনের খাতিরে খোদাতা'লার ধ্যান থেকে বিচ্ছিন্ন হননি। এতে (ধ্যানভঙ্গের কারণে) খোদায়ী গযব থেকে প্রিয়জনেরা রেহাই পান। অতএব, প্রকৃত শ্রদ্ধা কোনো সামাজিক কুশলাদির মধ্যে নিহিত নয়, বরং তা অন্যদের আধ্যাত্মিক মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়।

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) জিজ্ঞেস করেন: "খোদার সান্নিধ্য লাভে এবাদত-বন্দেগীর চেয়েও শ্রেয় কোনো পন্থা আছে কি?"

মওলানা রুমী (রহ:) জবাব দেন: হ্যাঁ, কিন্তু তাও এবাদত (প্রার্থনা)। এটি বাহ্যিক আকৃতিবিহীন (মানে অনানুষ্ঠানিক) বন্দেগী। এই বাহ্যিক আকৃতির প্রার্থনা হলো এবাদতের শরীর মাত্র, কেননা তাতে একটি সূচনা ও পরিসমাপ্তি বিদ্যমান। সূচনা ও পরিসমাপ্তিবিশিষ্ট সকল বস্তু-ই একেকটি দেহ। সকল কথা ও আওয়াজেরই একটি শুরু ও একটি শেষ আছে, আর তাই সেগুলো একেকটি আকৃতি ও দেহ। কিন্তু এবাদত (প্রার্থনা)-এর

অন্তঃস্থ আত্মা হলো নিঃশর্ত ও অসীম; আর তাতে নেই কোনো সূচনা কিংবা পরিসমাপ্তি।

মহানবী (দ:) যিনি মুসলমানদের নামাযের বিধানদাতা, তিনি বলেন, "খোদাতা'লার কাছে আমার প্রার্থনার এমন এক মুহূর্ত বা ক্ষণ আছে যা অন্য কোনো নবী (আ:) ধারণ করেন না, আর যা খোদার পরে (মর্যাদাশীল) কোনো ফেরেশতার দ্বারাও সীমিত নয়।" তাই এতে আমরা উপলব্ধি করতে পারি প্রার্থনার আত্মা কেবল এবাদতের বাহ্যিক আকৃতি নয়। বরঞ্চ তা সম্পূর্ণ নিবিষ্টতা, যা এমনই এক হাল বা আধ্যাত্মিক অবস্থা যেখানে এসব বাহ্যিক আকৃতির কোনো স্থান নেই। স্বয়ং জিবরীল আমীন (আ:) যিনি নিখুঁত এক বাস্তবতা, তাঁকেও সেখানে (মে'রাজে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হালত অবস্থায়) খুঁজে পাওয়া যায় না।

বর্ণিত আছে যে একদিন আমার বাবার বন্ধুরা তাঁকে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পান। নামাযের সময় হলে পরে (বাবার) এই সকল বন্ধু তাঁকে ডেকে বলেন, "নামাযের সময় হয়েছে।" আমার বাবা তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করলে তাঁরা ওঠে দাঁড়িয়ে নামাযে রত হন। তবে দু'জন বন্ধু বাবার সাথে থেকে যান এবং তাঁরা নামাযে দাঁড়াননি।

নামাযে দণ্ডায়মান বন্ধুদের একজনের নাম ছিল খাওয়াজা-জ্বি। তাঁর অন্তঃচক্ষু দ্বারা তাঁকে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়, যারা নামাযে রত হয়েছিলেন তাঁরা মহানবী (দ:)-এর পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের পিঠ ছিল মক্কা শরীফের দিকে। অপরদিকে, আমার বাবার সাথে অবস্থানকারী দুজন মক্কা শরীফ-মুখি ছিলেন। যেহেতু আমার বাবা 'মাস্তি' তথা আত্মহারা এক অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন এবং নিজ সত্তার লয় সাধন করেছিলেন, আর তিনি খোদার নূরে (জ্যোতিতে) মিশেও গিয়েছিলেন, সেহেতু তিনি মওলার নূরে পরিণত হন।

খোদাতা'লার নূর তথা জ্যোতির দিকে যে কেউ পিঠ দিয়ে দাঁড়ালে এবং নিজেদের নামাযের কেবলা-মুখি দেয়ালের দিকে মুখ ফেরালে সে নিশ্চিতভাবে মক্কা শরীফের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়। কেননা, খোদার নূর হলো মক্কা-মুখি কেবলার রূহ বা আত্মা।



রাসূলুল্লাহ (দ:) একবার জনৈক বন্ধুকে তিরস্কার করে বলেন, "আমি তোমাকে ডেকেছিলাম; তুমি এলে না কেন?" ওই বন্ধু উত্তর দেন, "আমি নামাযে রত ছিলাম।" মহানবী (দ:) বলেন, "আমি কি তোমাকে আল্লাহতা'লার খাতিরেই ডাকিনি?" এমতাবস্থায় ওই বন্ধু উত্তর দেন, "আমি অসহায়।"

প্রতিটি মুহূর্তে অসহায় অনুভব করা, সাফল্য ও তার পাশাপাশি ব্যর্থতায় তোমাকে অসহায় দেখতে পাওয়া অতি উত্তম একটি বিষয়। কেননা, তোমার সামর্থ্যের চেয়েও অধিকতর সামর্থ্যবান একজন (মানে খোদাতা'লা) আছেন; আর প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমার ইচ্ছা তাঁরই বৃহত্তর ইচ্ছার অধীন। ক্ষণে সামর্থ্যবান ক্ষণে অসহায়, এ দুটো ভাগে তুমি কিন্তু বিভক্ত নও। তুমি সবসময়ই অসহায়, কেবল কখনো মনে রাখতে পারো, কখনো পারো না। যখন স্মরণ করতে পারো, তখন ওই মুহূর্তের কেন্দ্রবিন্দু দৃশ্যমান হয়। এমতাবস্থায় তোমার সামনে পথটি খুলে যায়। সত্য বটে, আমাদের অবস্থা কী-ই বা আর হতে পারে যখন দেখি সিংহ, বাঘ ও কুমির সবাই অসহায় এবং খোদার সামনে (ভয়ে) কম্পমান? এমন কী আসমান ও জমিন-ও অসহায় এবং তাঁর-ই ডিক্রি তথা বিধানের অধীন।

খোদাতা'লা এক মহাপরাক্রমশালী বাদশাহ। তাঁর নূর (জ্যোতি) চাঁদ কিংবা সূর্যের আলো নয়, যে ক্ষেত্রে এগুলোর কোনো না কোনো আকৃতি বিদ্যমান। খোদার নূর যখন উন্মুক্ত আলো ছড়ায়, তখন আসমান কিংবা জমিন অবশিষ্ট থাকে না; সূর্য বা চাঁদও অবশিষ্ট থাকে না। কিছুই অবশিষ্ট থাকে না একমাত্র ওই মহা বাস্তবতা ছাড়া।

কোনো এক রাজা এক দরবেশকে বলেন, "আল্লাহর দরবারে আপনি যখন প্রকাশিত হবেন ও তাঁর সান্নিধ্য লাভ করবেন, তখন আমার কথা স্মরণ করবেন।" এ কথার জবাবে দরবেশ বলেন, "আমি যখন ওই দরবারে হাজির হবো এবং দিবাকররূপী খোদা তাঁর ওই নূর আমার প্রতি বিচ্ছুরণ করবেন, আমি তখন নিজেকেই মনে রাখতে পারবো না। এমতাবস্থায় আপনাকে কীভাবে মনে রাখা সম্ভব হবে আমার?"

তবু তুমি ওই ধরনের পুরো মাত্রায় নিবিষ্ট কোনো দরবেশের কাছে অনুরোধ করবে; কেননা তাঁরা খোদার দরবারে হাজির হয়ে এমন কী

তোমার কথা বা তোমার চাহিদার কথা উল্লেখ না করা সত্ত্বেও অনুরোধটি পূরণ হয়ে যাবে।

এককালে এক রাজার প্রিয়ভাজন ও অত্যন্ত আস্থাশীল একজন সেবক ছিলেন। ওই সেবক রাজ প্রাসাদের দিকে রওয়ানা হলেই মানুষেরা তাঁর কাছে নিজেদের বৃত্তান্ত ও চিঠিপত্র জমা দিয়ে সেগুলো রাজার বরাবরে পেশ করার মিনতি জানাতো। তিনি তাঁর থলেতে সেসব কাগজপত্র রাখতেন। অতঃপর রাজার সামনে হাজির হলে তিনি তাঁর (রাজকীয়) সৌন্দর্য দর্শনে নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেতেন। এমতাবস্থায় রাজা স্নেহভরে তাঁর থলেতে হাত ঢুকিয়ে বলতেন, "আমার (রাজকীয়) সৌন্দর্য দর্শনে নিবিষ্ট আমারই এ সেবক এই থলের ভেতরে কী রেখেছে?"

এ উপায়ে রাজা মহাশয় প্রজাদের চিঠিপত্র পেয়ে যেতেন এবং প্রত্যেক নর ও নারী প্রজার আবেদনপত্রে মঞ্জুরিসূচক স্বাক্ষর করে সেগুলো আবার থলেতে রেখে দিতেন। ফলে ওই সেবকের দ্বারা প্রজাদের আবেদনপত্র জমা দেয়া ছাড়াই রাজা মহাশয় প্রজাদের প্রত্যেকের চাহিদা পূরণ করতেন; আর এতে কোনো আবেদন-ই নাকচ হতো না। পক্ষান্তরে, তাদের চাওয়ার বহু গুণ বেশি তারা পেতো। কিন্তু (রাজার সৌন্দর্য দর্শনে) সজ্ঞানতা বা চেতনা বজায় রাখতে সক্ষম এবং সাহায্যপ্রার্থী প্রজাদের বৃত্তান্ত রাজার সামনে পেশ করতে পারঙ্গম অন্যান্য সেবকদের বেলায় একশটি অনুরূপ আবেদনপত্রের মধ্যে হয়তো একটিমাত্র মঞ্জুর হতো।

## উপদেশ বাণী - ৪

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) বলেন: "আমি কী যেন ভুলে গিয়েছি।"

মওলানা রুমী (রহ:) উত্তর দেন: পৃথিবীতে একটি জিনিস কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বাকি সব কিছু যদি তুমি ভুলেও যাও কিন্তু ওই বিষয়টি না ভোলো, তাহলে তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ-ই নেই। পক্ষান্তরে, তুমি যদি সমস্ত কিছু মনে রেখে যথাযথভাবে পালন করো কিন্তু ওই বিষয়টি-ই ভুলে যাও, তবে তোমার সবই পণ্ডশ্রম।



এটি যেন কোনো রাজা তোমাকে একটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্বভার অর্পণ করে কোনো দেশে পাঠিয়েছেন। তুমি সেখানে যেয়ে ১০০টি অন্য কাজ সম্পন্ন করলে কিন্তু ওই সুনির্দিষ্ট কাজটি পালন করলে না; এমতাবস্থায় তুমি কিছুই করো নি বলে সাব্যস্ত হবে। অতএব, এ দুনিয়ায় প্রত্যেকেই কোনো না কোনো বিশেষ কাজের দায়িত্ব নিয়ে আবির্ভূত হয়, আর সেটি-ই তাদের উদ্দেশ্য। তারা তা না করলে কিছুই করেনি বলে সাব্যস্ত হবে।

সকল বস্তুকেই একেকটি দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে। আসমানের কর্তব্য বৃষ্টি বর্ষণ ও আলো দান করা, যাতে জমিনে উদ্ভিদ জীবন লাভ করে। পৃথিবীর মাটি বীজ গ্রহণ করে ফল-ফসল উৎপন্ন করে; এটি আরও লক্ষটি চমকপ্রদ বস্তু গ্রহণ করে তা প্রকাশ করে থাকে, যা এতো গণনাতীত যে বলার মতো নয়। পাহাড়-পর্বত দান করে স্বর্ণ ও রূপার খনি। এই যে আসমান, জমিন ও পাহাড়-পর্বত এতোগুলো কাজ করে, তারা কিন্তু ওই একটিমাত্র বিশেষ কাজ করে না যা আমরা তথা মনুষ্যকুল করে থাকি।

"আমরা আস্থার ভার অর্পণ করেছিলাম আসমান, জমিন ও পাহাড়ের ওপর, তারা তা বহনে অস্বীকৃতি জানায় এবং এ দায়িত্বের ভয়ে ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত, কিন্তু মানবজাতি তা বহন করে, নিশ্চয় তারা নির্বোধ ও পাপী।" [সরাসরি অনুবাদ]

অতএব, মানুষদেরকে একটি (সুনির্দিষ্ট) কাজ দেয়া হয়েছে, আর যখন তা তারা যথাযথভাবে পালন করে, তাদের সমস্ত পাপ মোচন হয় ও নির্বুদ্ধিতার দায় ঘুচে যায়।

তুমি যুক্তি দেখিয়ে থাকো, "আমি যে কাজগুলো সম্পন্ন করেছি সেগুলোর দিকে একবার দেখুন, যদিও আমি ওই নির্দিষ্ট দায়িত্বটি পালন করতে পারিনি।" কিন্তু বৎস, তোমাকে তো ওই সমস্ত কাজের জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি! এ যেন তোমাকে একখানা অমূল্য ভারতীয় ইস্পাতের তরবারি দেয়া হয়েছে, যেটি রাজা-বাদশাহদের কোষাগারে পাওয়া যায়, আর তুমি সেটি কসাইয়ের ছুরির মতো পচা গোস্ত কাটার কাজে ব্যবহার করছো এ অজুহাত দেখিয়ে, "আমি এ তরবারিকে অলস ফেলে রাখিনি, বরং নানা উপকারী কাজে ব্যবহার করছি।" কিংবা এ যেন একটি খাঁটি স্বর্ণের পাত্রে শালগম রান্না করা, যেখানে ওই স্বর্ণের একেকটি কণা দ্বারাই একশটি

পাত্র কেনা যায়। অথবা, এ যেন গরম ও ঠাণ্ডা করে পান দেয়া সেরা লোহার তৈরি একখানা দামেশ্‌কীয় ছুরি তুমি একটি দ্বিখণ্ডিত লাউয়ের খোলসকে (দেয়ালে) ঝোলানোর কাজে ব্যবহার করছো এই অজুহাত দেখিয়ে, "আমি তো এর সদ্ব্যবহার-ই করছি। এতে একটি লাউয়ের খোলস ঝুলিয়েছি। এই ছুরিকে নষ্ট হতে দেইনি।" কী নির্বুদ্ধিতা-ই না হবে এ কাজটি! ওই লাউ কোনো কাঠের বা লোহার পেরেক দিয়ে ভালোভাবে ঝোলানো যায়, আর ওই পেরেক কয়েক পয়সা হবে মাত্র; তাহলে কেন এক শ টাকা মূল্যের ছুরি এ কাজে ব্যবহার করা?

এক কবি একবার বলেন:

"আসমান ও জমিন হতে তুমি বেশি দামী,
এর বেশি কী-ই বা আর বলবো আমি,
তোমার আসল মূল্য-ই জানো না তুমি।"

[নোট: মানবজাতি সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন]

খোদাতা'লা বলেন, "আমি তোমাদের কিনে নেবো- তোমাদের মুহূর্তগুলো, তোমাদের নিঃশ্বাসগুলো, তোমাদের মালামাল, তোমাদের জীবনগুলো। তোমরা সেগুলো আমার উদ্দেশ্যে ব্যয় করো; আমার কাছে হস্তান্তর করো; আর সেগুলোর (বিনিময়-) মূল্য হবে ঐশী মুক্তি, করুণা ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা। আমার দৃষ্টিতে এটি-ই তোমাদের মূল্য।" কিন্তু আমরা যদি আমাদের জন্যেই আমাদের জীবনকে সীমিত রাখি, তাহলে (খোদায়ী) মঞ্জুরিকৃত ওই অমূল্য রতন আমরা হারিয়ে ফেলবো। লাউয়ের খোলস ঝোলাতে এক শ টাকা মূল্যের দামী ছোরা দেয়ালে বিদ্ধকারী সেই লোকের মতো সেগুলোর মহামূল্য-ও একটি পেরেকের দামে নেমে আসবে।

তবু তুমি আরেকটি অজুহাত দেখাও এ কথা বলে, "কিন্তু আমি তো মহা মহা কাজে আত্মনিয়োজিত। আমি আইনশাস্ত্র, দর্শনবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র ও অন্যান্য বিদ্যাচর্চা করছি।" উত্তম, কিন্তু তোমার নিজের স্বার্থ ছাড়া কার খাতিরে তুমি সেগুলো অধ্যয়ন করছো? তা যদি হয়ে থাকে আইনশাস্ত্র, তবে তুমি তা অধ্যয়ন করছো যাতে কেউ তোমার কাছ থেকে রুটির টুকরো চুরি করতে না পারে, বা কাপড়-চোপড়



ছিনিয়ে নিতে না পারে, অথবা তোমাকে খুন করতে না পারে। সংক্ষেপে, এটি তোমার নিজস্ব নিরাপত্তার খাতিরেই তুমি করছো। বিষয়টি যদি হয়ে থাকে জ্যোতির্বিদ্যা, তবে তা বলয়গুলোর বিভিন্ন পর্যায় ও পৃথিবীর ওপর সেগুলোর প্রভাব, সেগুলো হাল্কা না ভারী, শান্তি না বিপদের সঙ্কেতবাহী, এ সমস্ত বিষয়-ই তোমার নিজস্ব পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট; যা নিতান্তই তোমার স্বার্থসংশ্লিষ্ট। আর অধ্যয়নের বিষয়টি যদি হয় চিকিৎসাশাস্ত্র, তবে তা-ও তোমার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট। এ ব্যাপারে তুমি যথাযথ বিবেচনা করলে দেখবে তোমার সমস্ত বিদ্যাচর্চার মূল হচ্ছো তুমি। ওই সকল মহা মহা কাজ কিন্তু তোমারই শাখা-প্রশাখা।

এসব (অধ্যয়নের) বিষয় যদি এতো এতো বিস্ময় ও অন্তহীন জ্ঞানে পূর্ণ ভুবন হয়, তাহলে মূল শেকড়সূচক যেসব ভুবন তুমি (ডিঙ্গিয়ে) অতিক্রম করছো সেগুলোর ব্যাপারে চিন্তা করো! যদি তোমার জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা তাদের নিয়ম-কানুন, তাদের ওষুধ-পথ্য, তাদের ইতিহাসসমৃদ্ধ হতো, তাহলে তোমার ভেতর উৎসস্বরূপ যা যা ঘটতো সে সম্পর্কে ভেবে দেখো; যে আধ্যাত্মিক নিয়ম ও দাওয়াই তোমার আত্মিক ভবিষ্যত ও তাকদীর তথা ভাগ্যের ওপর প্রভাব ফেলতো, তোমারই অন্তরের (অভ্যন্তরীণ) সংগ্রামকে যে ইতিহাস বর্ণনা করতো, সে সম্পর্কেও ভেবে দেখো!

রূহ তথা আত্মার জন্যে খাওয়া ও ঘুমোনোর খোরাকের বাইরেও অন্য খোরাক রয়েছে। কিন্তু তুমি তো সেই খোরাকের কথা ভুলে গিয়েছো। রাত-দিন তুমি তোমার দেহের পুষ্টি (ও তুষ্টি) নিয়ে ব্যস্ত। বস্তুতঃ দেহ একটি ঘোড়াসদৃশ, আর এ জমিন (পৃথিবী) হচ্ছে তার আস্তাবল। অশ্বটি যে খাবার গ্রহণ করে, তা কিন্তু তার আরোহী/চালকের খাবার নয়। তুমি-ই হলে তার আরোহী, আর তোমার নিজস্ব খাওয়া ও ঘুমোনো এবং আনন্দ-ফুর্তির চাহিদা রয়েছে। কিন্তু যেহেতু প্রাণিটির আধিপত্য রয়েছে (তোমার ওপর), সেহেতু তুমি তার আস্তাবলে পিছিয়ে পড়েছো। অনন্ত, অসীম জগতে তোমাকে রাজা-বাদশাহ ও আমীর-উমারাহবৃন্দের সারিতে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। তোমার অন্তর সেখানে থাকলেও যেহেতু তোমার শরীর তোমার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে, সেহেতু তুমি তার শাসনাধীন এবং তার হাতে বন্দি।

লায়লা-মজনূন প্রেমকাহিনি অনুযায়ী, মজনূন যখন প্রেমাস্পদ লায়লার বাড়ির দিকে রওয়ানা দেন, তখন সজাগ অবস্থায় তিনি তাঁর উট সঠিক দিকেই চালাচ্ছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি লায়লার চিন্তায় বিভোর হন এবং উটের কথা ভুলে যান, তৎক্ষণাৎ তাঁর উট নিজ শাবক যে গ্রামে রাখা ছিল সেদিকে চলতে থাকে। চেতনা ফেরা মাত্র-ই মজনূন দেখতে পান তিনি তাঁর যাত্রায় দুই দিন পিছিয়ে গিয়েছেন। এভাবে তিন মাস চলার পরও তিনি তাঁর গন্তব্যের কাছে-ধারেও পৌঁছুতে পারেননি। অবশেষে তিনি উটের পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়েন এ কথা বলে, "এই উট আমার পতন ডেকে এনেছে।" অতঃপর তিনি পায়ে হেঁটে চলেন এবং গান গাইতে থাকেন:

"এক্ষণে পেছনে রেখে আমার উটের কামনা
সম্মুখে নিয়ে আমার নিজেরই বাসনা
আমাদের দু'য়ের উদ্দেশ্য দু'দিকে টানা
আমরা আর এব্যাপারে একমত না।"

একবার বোরহানউদ্দীনকে কেউ একজন সম্ভাষণ জানিয়ে বলেন, "আমি বন্ধুদের মুখে আপনার অনেক প্রশংসাগীত শুনেছি।" তিনি জবাবে বলেন, "আপনার বন্ধুরা আমার প্রশংসা করার মতো আমাকে ভালোভাবে চেনেন কি না তা দেখার জন্যে তাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তারা যদি আমাকে স্রেফ মুখের কথায় চেনেন, তাহলে তারা আমাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে চেনেন না। কেননা, কথা স্থায়ী নয়। অক্ষর ও আওয়াজ স্থায়ী নয়। এ দেহ, এ ঠোঁটযুগল এবং এ মুখ স্থায়ী হবে না। এগুলোর সবই নেহায়েত ক্ষণিকের আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু যদি তারা (বন্ধুরা) আমাকে আমার কর্মের সুবাদে চেনেন ও জানেন, আর আমার মৌলিক সত্তাকেও জানেন, তাহলে আমি বুঝবো তারা আমার প্রশংসা করতে সক্ষম, আর ওই প্রশংসা-ও তার যথাযোগ্য জায়গায় পৌঁছুবে।"

এ যেন সেই নির্দিষ্ট এক রাজার কাহিনির মতো ব্যাপার। রাজা তাঁর ছেলের (বিদ্যা শিক্ষার ভার) বিজ্ঞ পণ্ডিতদের একটি দলের দায়িত্বে ন্যস্ত করেন। যথাসময়ে তারা তাকে জ্যোতিষতত্ত্ব, রেখা, সংখ্যা বা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ গণনাতত্ত্ব, আর লক্ষণ বা চিহ্ন ব্যাখ্যা করার



বিদ্যাও শিক্ষা দেন; এভাবে রাজপুত্র নিরেট বোকা হওয়া সত্ত্বেও ওই সব বিষয় পুরোপুরি রপ্ত করে পণ্ডিত হয়ে যায়।

একদিন রাজা মহাশয় নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে একটি আংটি নিয়ে পুত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "বলো তো আমার হাতের মুঠোর ভেতরে কী?" পুত্র উত্তর দেয়, "আপনার হাতে যা আছে, তা গোলাকৃতির, হলুদ রং বিশিষ্ট, খোদাইকৃত এবং ফাঁপা।" রাজা বলেন, "তুমি সমস্ত চিহ্ন-ই সঠিকভাবে ব্যক্ত করেছো, এখন বলো তো এটি কী?" রাজপুত্র জবাবে বলে, "এ নিশ্চয় চালনি।" রাজা চিৎকার করে বলেন, "কী? তুমি তো সব খুঁটিনাটি বিষয়-ই জানো, যে কাউকে যা হতবুদ্ধি করবে। তাহলে তোমার এতোখানি জ্ঞানচর্চার মাঝেও চালনি যে হাতের মুঠোয় আঁটে না, এ নগণ্য বিষয়টি তোমার মস্তিষ্কের অগোচরে থেকে যাওয়াটুকু কীভাবে সম্ভব হলো?"

একইভাবে যুগের বড় বড় বিদ্বান ব্যক্তিও সকল বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান নিয়ে নিজেদের মাথার চুল নিজেরা ছিঁড়ে থাকেন। তারা ওই সমস্ত জ্ঞানের শাখা সম্পর্কে পূর্ণ ও নির্ভুলভাবে জানেন, যেগুলো রূহ তথা আত্মার সাথে সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু যে বিষয়টি সত্যিকার গুরুত্ব বহন করে এবং আমাদেরকে অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে ছুঁয়ে যায়, মানে আমাদের আপন সত্তার বিষয়টি, সেটি সম্পর্কে কিন্তু তোমাদের ওই বড় বড় পণ্ডিতেরা বে-খবর ও অজ্ঞ। তারা সব বিষয়েই বলে, "এটি সত্য, ওটি অসত্য। এটি সঠিক, ওটি ভুল।" অথচ তারা নিজেদের সত্তা সত্য-সঠিক না ভুল, খাঁটি-নির্মল না অপবিত্র, সে সম্পর্কে অনবধান।

ফাঁপা ও হলুদবর্ণ, উৎকীর্ণ ও গোলাকার, এসব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়াটা আসলে আকস্মিক; ওই আংটিকে আগুনে নিক্ষেপ করলে এগুলোর কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। তখন তা তার আপন সত্তায় পরিণত হয়, যা সকল দৃশ্যমান আকৃতি হতে পরিশোধিত। অতএব, এটি ওই সকল পণ্ডিতের জ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়; তারা যা জানে তার সাথে মৌলিক বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক-ই নেই, যে বাস্তবতা এসব 'চিহ্ন' (আভাস/সঙ্কেত) দূর হয়ে যাওয়ার পর একাই অস্তিত্বশীল থাকে। তারা (বিদ্বানবর্গ) জ্ঞানদীপ্ত কথা বলে, বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়, আর শেষমেশ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে রাজার হাতের মুঠোয় যা আছে তা একটি

চালনি। বিষয়টির শেকড়ের জ্ঞান তথা জীবনের উদ্দেশ্য (মূল কারণ) কিন্তু তাদের জানা নেই।

আমি এক পাখি - নাইটিংগেল (ছোট্ট গায়ক) পাখি। তারা যদি আমায় বলে, "অন্য কোনো আওয়াজ (সুর) তোলো", আমি তা পারবো না। আমার জিহ্বা (কণ্ঠ) যে রকম, সে রকমই সুর ওঠবে। আমি অন্য কোনো রকম কথা বলতে পারবো না। তবে যারা পাখির গান শেখে, তারা নিজেরা কিন্তু স্বয়ং পাখি নয়। বরঞ্চ তারা পাখির শত্রু এবং তাদের আটককারী। তারা (পাখির) গান গায় ও শিস দেয় যাতে অন্যরা তাদেরকে পাখি মনে করে। তাদেরকে ভিন্ন কোনো আওয়াজ দিতে বলুন, তারা তা পারবে। কেননা সে আওয়াজটি স্রেফ তাদের ধারণকৃত। সেটি তাদের একদম নিজস্ব ধ্বনি নয়। ওই পণ্ডিতবর্গের মতো তারাও অন্য গান ধরতে সক্ষম, যেহেতু তারা ওই গানগুলো ছিনতাই করতে এবং প্রতিটি বক্ষ থেকে চুরি করা পৃথক পৃথক সুরের প্রদর্শনী দিতে শেখেছে।

## উপদেশ বাণী - ৫

মওলানা রূমী (রহ:) একবার অপ্রত্যাশিতভাবে আমীরের (শাসকের) রাজ-দরবারে হাজির হলে তিনি চমৎকৃত হয়ে বলেন, "শায়খ, আমাকে এভাবে সম্মানিত করার ক্ষেত্রে আপনি কতো সদয়। আমি এ রকম কখনো প্রত্যাশা করিনি। আমি এ ধরনের সম্মানের যোগ্য বলে আমার কখনো মনেও হয়নি। অধিকারবলে আপনার সেবক ও পরিচরবর্গের সারিতে ও সাহচর্যে দিন-রাত দাঁড়িয়ে থাকাই উচিত আমার। আমি তো সেটিরও যোগ্য নই! এটি যে কতো বড় সদয়ভাব!"

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: আপনার সুউচ্চ আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা-ই এর কারণ। আপনার পদমর্যাদা যতোই উচ্চে ওঠছে এবং আপনি যতোখানি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ বৈষয়িক কাজে জড়াচ্ছেন, ততোই আপনি নিজের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে নিজেকে ঘাটতিপূর্ণ বিবেচনা করছেন। আপনি যা অর্জন করেছেন, তাতেও সন্তুষ্ট নন এ কথা ভেবে যে আপনার অনেক বেশি দায়-দায়িত্ব রয়েছে। যেহেতু এ সকল অর্জনের কোনোটি-ই ঐশী (নৈকট্য) অর্জনের লক্ষ্যে আপনার দৃষ্টিকে অন্ধ করতে পারছে না,



সেহেতু আমার অন্তর আপনার খেদমত করতে আগ্রহী। আর এগুলোর সব কিছুর জন্যেই আমি আপনাকে (জিসমানী/শারীরিক) সোহবত দ্বারা মহিমান্বিত করতে চেয়েছি।

(জিসমানী) আকৃতিরও গুরুত্ব অপরিসীম। না, গুরুত্ব থেকেও অনেক বেশি হলো এর প্রকৃত সারবস্তু। হৃদযন্ত্র না থাকলে শরীরের যেমন পতন ঘটে, তেমনি চামড়াবিহীন হলেও এর পতন ঘটে থাকে। আপনি যদি খোসা ছাড়া বীজ বপন করেন, তাহলে তা বেড়ে ওঠবে না। কিন্তু আপনি যদি তার খোসাসহ তাকে মাটির গভীরে প্রোথিত করেন, তবে তা অঙ্কুরিত হয় এবং বড় গাছে হয় পরিণত। অতএব, আকার-আকৃতি একটি বড় ও প্রয়োজনীয় মৌলনীতি; আর এটি ছাড়া আমাদের কর্ম ব্যর্থ হয় এবং আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-ও অর্জিত হয় না। হ্যাঁ, এই মৌলনীতি সেসব (পুণ্যাত্মা) ব্যক্তির কাছে বাস্তবতা, যাঁরা বাস্তবতা সম্পর্কে জানেন এবং যাঁরা নিজেরাই বাস্তবতায় পরিণত হয়েছেন!

এক দরবেশ একবার কোনো রাজার দরবারে উপস্থিত হন। রাজা তাঁকে সম্বোধন করেন, "ওহে ফকির।" দরবেশ জবাব দেন, "আপনি-ই তো ফকির।" এমতাবস্থায় রাজা জানতে চান, "আমি কীভাবে ফকির হতে পারি, যেখানে সারা পৃথিবী আমার মালিকানাধীন?" দরবেশ উত্তর দেন, "আপনি সবকিছুর উল্টোটি দেখে থাকেন। এ দুনিয়া ও পরবর্তী জগতের যতো কিছুর মালিক হওয়া সম্ভব, তার সবই আমার মালিকানাধীন। আমি সমস্ত দুনিয়া লুফে নিয়েছি। আপনি-ই বরং এক গ্রাস (খাবার) ও এক টুকরো কাপড়ে সন্তুষ্ট থেকেছেন।"

আপনি যেদিকেই তাকান, খোদাতা'লার চেহারা মোবারক (রূপকার্থে) আপনার সামনে উপস্থিত। এ মোবারক চেহারা অনাদি ও অনন্ত। আধ্যাত্মিক জগতের প্রকৃত আশেক-ভক্তবৃন্দ ওই পবিত্র চেহারার জন্যে আত্মোৎসর্গ করেন, আর এর প্রতিদানস্বরূপ তাঁরা কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। বাকি মনুষ্যকুল হচ্ছে গরুর পালের মতো।

মানবজাতির বাকি অংশ যদিও গরুর পালের মতো, তবু তারা (খোদায়ী) দানের যোগ্য। তারা হয়তো আস্তাবলে বসবাস করতে পারে, কিন্তু ওই আস্তাবলের মালিক/প্রভু কর্তৃক তারা গৃহীত (মকবূল)। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাদেরকে এই আস্তাবল থেকে নিজের খাস (নিজস্ব)

খোঁয়াড়ে স্থানান্তর করতে পারেন। অতএব, সব কিছুর সূচনায় খোদাতা'লা পুরুষ ও নারী জাতিকে অস্তিত্বশীল করেন; অতঃপর আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের খোঁয়াড় থেকে তাদেরকে অচেতন জগতে স্থানান্তর করেন; এরপর অচেতন জগতের খোঁয়াড় থেকে উদ্ভিদজগতে স্থানান্তর করেন; উদ্ভিদজগত থেকে প্রাণিজগতে; অতঃপর প্রাণি হতে মানবে, মানব হতে ফেরেশতায়; আর এভাবেই চলবে এ প্রক্রিয়া চিরকাল। তিনি এ সকল আকার-আকৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন যাতে আপনি জানতে পারেন যে তাঁর খোঁয়াড় অগণিত, আর এগুলোর একেকটি অপরটি হতে উচ্চতর (বা উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন)। [বিঃ দ্রঃ মওলানা রূমী (রহ:)-এর এই বক্তব্য আউলিয়াবৃন্দের কাশফ-মুকাশাফা। এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। - অনুবাদক]

আল্লাহ পাক বর্তমান এ দুনিয়া প্রকাশ করেছেন বা মেলে ধরেছেন যাতে আপনি পরবর্তী যেসব পর্যায় বা ধাপ অপেক্ষা করছে, সেগুলো গ্রহণ করতে পারেন। তিনি এমনভাবে প্রকাশ করেননি যাতে আপনি বলতে পারেন, "এখানে যা আছে এ পর্যন্তই (সব কিছুর শেষ)।" কোনো শিল্প-কৌশলের মহা-কারিগর তাঁর কারিগরি দক্ষতা ও যোগ্যতা নিজ শিক্ষানবিশদের সামনে মেলে ধরেন যাতে তারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখেন এবং তাঁর অপ্রদর্শিত অন্যান্য শিল্পেও বিশ্বাস করেন। কোনো রাজা তাঁর প্রজা সাধারণের প্রতি সম্মানসূচক জুব্বা ও উপহারসামগ্রী দান করে থাকেন; কেননা তারা তাঁর কাছ থেকে অন্যান্য উপহারের আশায় থাকেন এবং ভবিষ্যতে স্বর্ণের থলে লাভের আকাঙ্ক্ষায় পিছু লেগে থাকেন। তিনি এগুলো মঞ্জুর করেন না তাদেরকে এ কথা বলার জন্যে, "এখানে যা আছে এ পর্যন্তই (সব কিছুর শেষ); রাজা মহাশয় আর কোনো আশীর্বাদ দ্বারা আমাদের ধন্য করবেন না", এবং ওই মঞ্জুরি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকার জন্যে। রাজা মহাশয় যদি জানেন কোনো প্রজা এ কথা বলতে পারেন এবং ওই উপহার নিয়েই তুষ্ট থাকেন, তাহলে তিনি কখনোই কোনো উপহারসামগ্রী তাদেরকে দান করবেন না।

ফকির সে ব্যক্তি যিনি পরবর্তী জগতকে দেখতে পান। আর দুনিয়াদার দেখে কেবল আস্তাবল। কিন্তু খোদাতা'লার মনোনীত/পছন্দকৃত জন যাঁর কাছে রয়েছে প্রকৃত (ঐশী) জ্ঞান, তাঁর লক্ষ্য কিন্তু পরকাল নয়, আস্তাবল-



ও নয়। তাঁর লক্ষ্যস্থির রয়েছে প্রথম (মৌল) নীতিতে, মানে সকল বস্তুর উৎসের (অর্থাৎ, খোদার) দিকে। পছন্দকৃত জনেরা যখন গমের বীজ বপন করেন, তখন তাঁরা জানেন যে গম ফলবে; কেননা তাঁরা সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত দেখতে পান। একই রীতি যব ও চাল এবং সব কিছুর বেলায় - আরম্ভ দেখে তাঁদের দৃষ্টি সমাপ্তির দিকে নিবদ্ধ নয়। তাঁরা সূচনা থেকে সমাপ্তি সম্পর্কে জানেন। ওই রকম পুরুষ ও নারী বিরল।

বেদনা-ই আমাদেরকে সকল (সাহসী) উদ্যোগে পথ দেখিয়ে থাকে। যতোক্ষণ না নিজের ভেতরে কোনো ব্যথা, উৎসাহ ও কাম্য বস্তুর জন্যে কোনো আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, ততোক্ষণ আমরা তা অর্জনে সংগ্রাম করি না। বেদনা ছাড়া তা আমাদের নাগালের বাইরে থাকে, চাই তা হোক এ দুনিয়াতে সাফল্যলাভ, কিংবা হোক পারলৌকিক পরিত্রাণ; অথবা চাই আমাদের লক্ষ্য হোক কোনো সওদাগর বা রাজা, কোনো বিজ্ঞানী বা জ্যোতির্বিজ্ঞানী হওয়ার। হযরত মরিয়ম (আ:)-এর প্রসববেদনা দেখা দেয়ার পরপরই তিনি ওই গাছের দিকে গিয়েছিলেন। ওই ব্যথা তাঁকে গাছের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আর যে গাছ গিয়েছিল শুকিয়ে, তাতেই ফল উৎপন্ন হয়েছিল।

আল-কুরআনে বর্ণিত মরিয়ম (আ:)-এর কাহিনির মতোই হচ্ছি আমরা। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একজন ঈসা আছেন। কিন্তু বেদনার বহিঃপ্রকাশ না হলে আমাদের ঈসার জন্ম হবে না। কখনো বেদনা না হলে আমাদের সে সন্তান যে গোপন পথে এসেছিল, সেই একই পথ ধরে উৎসে ফিরে যাবে; আর আমরা শূন্য হয়ে পড়ে থাকবো, আমাদের প্রকৃত সত্তার জন্ম হবে না।

"অভুক্ত তোমার অন্তঃস্থ আত্মা
অতিভোজনরত তোমার বাইরের চামড়া
শয়তানের রাক্ষুসে-ভক্ষণে পেয়েছে অসুস্থতা
রাজা তাই রুটির জন্যেও করছেন ভিক্ষা
নিরাময়প্রাপ্তি তখনই যদি এ ধরায় থাকেন 'ঈসা'
কিন্তু একবার তাঁর হলে আসমানে ফেরা
ফুরিয়ে যাবে সব আশা-ভরসা।"

## উপদেশ বাণী - ৬

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: এসব কথা তাদের উদ্দেশ্যে বলা, যাদের বোঝার জন্যে কথা বলতে হয়। কিন্তু যাঁরা কথা ছাড়া বুঝতে পারেন, তাঁদের আবার ভাষণের কী প্রয়োজন? তাঁদের কাছে বার্তা হচ্ছে আসমান ও জমিন, যেগুলো নিজেরাই খোদায়ী কালামের (মানে ঐশী ভাষণের) বহিঃপ্রকাশ। ফিসফিস করে বলা কথা যিনি-ই শুনতে পান, তাঁর আবার চিৎকার-চেঁচামেচির কী প্রয়োজন?

একবার এক আরবী-ভাষী কবি কোনো এক রাজার সামনে হাজির হন। রাজা ছিলেন তুর্কী, আর তিনি এমন কী ফারসী-ও (পারসিক ভাষাও) জানতেন না। ওই কবি তাঁর সম্মানে কিছু চমৎকার আরবী কবিতার পংক্তি রচনা করেছিলেন এবং তা সাথে করে নিয়েও এসেছিলেন। রাজা সিংহাসনে বসার পর এবং রাজ-দরবারের আমীর-অমাত্যবর্গ, মন্ত্রী ও সেনাপতিমণ্ডলী তাঁদের নিজ নিজ আসনে যথারীতি বসার পর কবি ওঠে দাঁড়িয়ে তাঁর কবিতা আবৃত্তি আরম্ভ করেন। অভিনন্দনযোগ্য প্রতিটি কবিতার অংশের শেষে রাজা মহাশয় মাথা নাড়েন, আর বিস্ময়ের উদ্রেক হয় এমন প্রতিটি কবিতার অংশে তাঁকে বিস্ময়াভিভূত দেখা যায়। একইভাবে, সমর্পণ-জ্ঞাপক প্রতিটি কবিতার অংশেও তিনি যথাবিহিত অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। রাজ-দরবারের সভাসদবর্গ সবাই এতে বিস্ময়াবিষ্ট হন।

সভাসদবৃন্দ নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় করে বলতে থাকেন, "আমাদের রাজা মহাশয় আরবী একটি শব্দ-ও জানতেন না, তাহলে কীভাবে এটি সম্ভব হলো যে তিনি এতো সঠিকভাবে মাথা নাড়তে সক্ষম হলেন? তিনি নিশ্চয় এতোগুলো বছর যাবত আরবী ঠিকই জানতেন, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে তা গোপন রেখেছিলেন। আমরা যদি ওই সময়কালে কখনো আরবীতে অশিষ্ট বাক্য উচ্চারণ করে থাকি, তাহলে আফসোস আমাদেরই!"

এদিকে রাজার এক পছন্দের গোলাম ছিল। সভাসদবর্গ একত্র হয়ে তাকে একটি ঘোড়া, একটি খচ্চর ও অর্থকড়ি দান করেন এবং অনুরূপ পরিমাণ আবার দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তাঁরা তাকে বলেন, "শুধু এতোটুকু



জানতে চেষ্টা করো যে রাজা মহাশয় আরবী জানেন কি-না। যদি না জানেন, তাহলে এটি কীভাবে সম্ভব হলো যে তিনি সঠিক সময়ে মাথা নাড়লেন? এটি কি কোনো অলৌকিক ঘটনা? না-কি ঐশী অনুপ্রেরণা বা প্রত্যাদেশ?"

অবশেষে একদিন ওই গোলাম তার সুযোগ পেয়ে যায়। রাজা মহাশয় শিকার থেকে ফিরেছিলেন, আর গোলাম দেখতে পায় যে তিনি উৎফুল্লচিত্ত; কেননা তাঁর শিকার অভিযান সফল হয়েছিল। তাই গোলাম সরাসরি প্রশ্নটি উত্থাপন করলে রাজা মহাশয় অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন।

অতঃপর রাজা মহাশয় বলেন, "আল্লাহর নামে শপথ, আমি আরবী জানি না। মাথা নাড়ানো ও অভিনন্দন জানানোর ব্যাপারটি আর কিছু নয়, আমি জানতাম ওই কবির কবিতা লেখার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; তাই আমি মাথা নেড়েছি এবং অভিনন্দন জানিয়েছি।"

অতএব, এটি বোধগম্য হয় যে বিষয়বস্তুর মূল ছিল কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য; কবিতাটি ছিল স্রেফ ওই উদ্দেশ্যেরই একটি শাখা। ওই উদ্দেশ্য যদি না হতো, তাহলে কবি কখনোই কবিতাটি লিখতেন না।

আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্যস্থির থাকলে দ্বৈততা দূর হবে। দ্বৈততা শাখা-প্রশাখা প্রদর্শন করে, কিন্তু মূল (উৎস) একটি-ই। সূফী-শায়খবৃন্দের ক্ষেত্রেও একই কথা। বাহ্যতঃ যদিও তাঁদের রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতি, আর তাঁদের সামাজিক অবস্থানেও রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য, যা এমন কী তাঁদের কথা ও কাজেও বিদ্যমান, তথাপি তাঁদের সবার লক্ষ্য একই, আর তা হলো খোদাতা'লার (নৈকট্য) তালাশ বা অন্বেষণ।

বাতাসের উদাহরণ-ই ধরা যাক। কোনো বাড়ির ভেতর দিয়ে বইতে শুরু করলে এটি কার্পেট বা গালিচার কোণাগুলো উড়িয়ে নেয় এবং গালিচা ঝাপটাতে থাকে, আর নড়াচড়াও করতে থাকে। এটি কাঠি ও খড়কে দ্রুত শূন্যে তোলে; হাউজ বা জলাধারের পানিপৃষ্ঠে আলোড়ন তোলে যতোক্ষণ না তা দেখতে লাগে কোনো প্রাণির প্রতিরক্ষামূলক বহিরাবরণের মতো; গাছ-গাছালি, তার ডালপালা ও লতাপাতাকেও করে এটি আন্দোলিত। এ সব পরিস্থিতি দৃশ্যতঃই স্পষ্ট ভিন্নতা বহন করে, কিন্তু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের

বেলায়, উৎস ও বাস্তবতার ক্ষেত্রে সেগুলোর সবেরই একটি নিয়ামক, আর তা হলো বায়ু প্রবাহ।

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) বলেন: "আমি প্রকৃত উদ্দেশ্যকে অবহেলা করেছি।"

মওলানা রূমী (রহ:) জবাবে বলেন: যখন এ চিন্তা কোনো মানুষের মস্তিষ্কে উদয় হয় এবং তারা নিজেদের সমালোচনা করে বলে, 'আমি কী, কেন এসব কাজ করি?' - যখন এ রকম হয়, তখন এটি নিশ্চিত প্রমাণ যে খোদাতা'লা তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তাদের ব্যাপারে যত্নবান। কবি যেমনটি বলেন - "তিরস্কার চলে যতোদিন, প্রেমও ততোদিন।" আমরা আমাদের বন্ধুদেরকেই তিরস্কার করি, কিন্তু কখনো অপরিচিত কাউকে তিরস্কার করি না।

তবে তিরস্কারেরও বিভিন্ন মাত্রা আছে। যখন কেউ এর দংশনে আক্রান্ত হয় এবং এতে সত্য উপলব্ধি করে, তখন তা খোদার এক নিদর্শন হয় যে তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তাদের প্রতি যত্নবান আছেন। কিন্তু যদি তিরস্কার ওই ব্যক্তির পাশ দিয়ে চলে যায় আর সে কোনো ব্যথা অনুভব না করে, তবে এটি প্রেমের কোনো চিহ্ন-ই নয়। কোনো গালিচাকে ধুলোমুক্ত করার জন্যে (ঝাড়ু দ্বারা) বাড়ি দিলে বুদ্ধিমান মানুষেরা তাকে তিরস্কার আখ্যা দেন না। কিন্তু কোনো নারী তার আপন শিশুকে মারলে তাকে তিরস্কার বলা হবে এবং এতে তার শিশুর প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ মেলে। অতএব, তোমার নিজের মধ্যে যতোক্ষণ তুমি ব্যথা ও অনুতাপ খুঁজে পাও, খোদাতা'লার প্রেম ও হেদায়াতের প্রমাণবহ হবে তা।

তোমার ভাই বা বোনের মাঝে দোষ তুমি খুঁজে পেলে তাদের মাঝে যে দোষ তুমি দেখতে পাও তা তোমার নিজের মধ্যেই নিহিত। প্রকৃত সূফী দরবেশ আয়নাসদৃশ যা'তে তুমি তোমার নিজের চেহারা-ই দেখতে পাও। কেননা, "ঈমানদার ব্যক্তি হলেন তাঁর ঈমানদার ভাইয়ের জন্যে আয়নাস্বরূপ।" তোমার মাঝে ওই সব দোষত্রুটি দূর করো! কারণ তাদের মধ্যে যা দেখে তুমি তিক্ত-বিরক্ত, তা তোমার মধ্যেও তোমাকে বিরক্ত করে।



একটি হাতিকে পানি পানের উদ্দেশ্যে কোনো এক কুয়োর ধারে নেয়া হয়। কিন্তু জলের মাঝে সে নিজের চেহারা দেখে ভয়ে (বা বিব্রত হয়ে) সরে যায়। সে মনে করেছিল সে অন্য এক হাতি দেখে সরে গিয়েছিল, কিন্তু বুঝতে পারেনি সে নিজেরই কাছ থেকে সরে গিয়েছিল।

সকল মন্দ বৈশিষ্ট্য, যেমন - অন্যায়, ঘৃণা, ঈর্ষা, লোভ, নিষ্ঠুরতা, অহঙ্কার ইত্যাদি যখন তোমার নিজের মধ্যে থাকে, তখন তা কোনো বেদনার উদ্রেক করে না। কিন্তু যখন তা তুমি অন্যদের মাঝে দেখতে পাও, তখনই সরে যাও এবং ব্যথা অনুভব করো। আমরা আমাদের নিজেদের (ক্ষতস্থানের) মামড়ি ও পুঁজযুক্ত ফোঁড়ার ব্যাপারে বিরক্ত হই না। আমাদের খাবারে নিজেদের সংক্রমিত হাত ঢুকিয়ে সামান্যতম রোগকাতুরে না হয়েই তা (মুখে নিয়ে) চাটতে পারি। কিন্তু যদি আমরা অন্য কারো হাতে ছোট্ট একটি পুঁজযুক্ত ফোঁড়া বা আঁচড় দেখতে পাই, তৎক্ষণাৎ আমরা ওই ব্যক্তির খাবার থেকে দূরে সরে যাই এবং তা খাওয়ার প্রতি আর কোনো আগ্রহ আমাদের থাকে না। মন্দ স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য হলো (ক্ষতস্থানের) মামড়ি ও পুঁজযুক্ত ফোঁড়ার মতোই; সেগুলো যখন আমাদের মধ্যে হয়, তখন কোনো ব্যথার কারণ হয় না, কিন্তু যখন সেগুলো অল্প মাত্রায়ও অন্য কারো মধ্যে আমরা দেখতে পাই, তখন-ই আমরা ব্যথা ও বিরক্তি অনুভব করি।

তোমার ভাই বা বোনের কাছ থেকে তুমি যেমন দূরে সরে যাও, তেমনি তারাও তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ব্যাপারে তাদেরকে তোমার মাফ করতে হবে। তুমি যে বেদনা অনুভব করো তা ওই দোষত্রুটির কারণেই (অনুভূত) হয়েছে, আর তারাও একই দোষত্রুটি দেখতে পায়। সত্যান্বেষী ব্যক্তিবর্গ হলেন তাঁদের প্রতিবেশীদের আয়নাস্বরূপ। কিন্তু যারা সত্যের কামড় অনুভব করতে অক্ষম, তারা অন্য কারো জন্যে আয়না নয়, শুধু নিজেদের ছাড়া।

কোনো এক রাজা মনঃক্ষুন্ন হয়ে একটি নদীর পাড়ে বসেছিলেন। সেনাপতিমণ্ডলী তাঁর ভয়ে ছিলেন তটস্থ। তাঁরা যা-ই চেষ্টা করেন না কেন, রাজার চেহারার মলিনতা আর কাটে না। তবে রাজার ছিল এক অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ভাঁড়। সেনাপতিমণ্ডলী তাকে টাকা দেয়ার ওয়াদা করেন যাতে সে রাজার মুখে হাসি ফোটাতে সক্ষম হয়। অতঃপর ওই

ভাঁড় রাজার সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে হাসাতে চেষ্টা করে; কিন্তু সব চেষ্টার পরও রাজা এমন কী তার চেহারার দিকেও তাকাননি। তিনি শুধু নদীর দিকেই তাকিয়ে থাকেন এবং মাথাও তোলেননি।

এমতাবস্থায় ভাঁড় রাজাকে জিজ্ঞেস করে, "নদীর পানিতে আপনি কী দেখতে পাচ্ছেন?"

রাজা বলেন, "আমি এক অবিশ্বস্ত স্ত্রীর স্বামীকে দেখতে পাচ্ছি।"

ভাঁড় বলে, "হে দুনিয়ার রাজা, আপনার এ গোলামও অন্ধ নয়।"

ঠিক তেমনটি-ই হচ্ছে তোমার নিজের বেলায়। তুমি যদি তোমার স্বজাতি কারো মাঝে কোনো কিছু দেখে ব্যথিত হও, তবে তারাও একদম অন্ধ নয়। তারাও তা দেখে যা তুমি দেখো।

খোদার সামনে বা উপস্থিতিতে দুটি 'আমি'র অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তুমি (একাধারে) নিজের সত্তা ও খোদাতা'লার সত্তা মোবারককে জানতে সক্ষম নও; হয় তোমাকে তাঁর সামনে মৃত্যুবরণ করতে হবে, নয়তো খোদাকে তোমার সামনে মরতে হবে যাতে দ্বৈততা না থাকে। কিন্তু খোদাতা'লার মৃত্যু অসম্ভব ও ধারণাতীত, কেননা তিনি চিরঞ্জীব সত্তা। তিনি এতোটাই দয়াপরবশ যে যদি কোনোভাবে সম্ভব হতো, তবে তিনি তোমার খাতিরে মৃত্যুবরণও করতে পারতেন। কিন্তু যেহেতু তা অসম্ভব, সেহেতু তোমাকে মৃত্যুবরণ (মানে নফস-এর লয় সাধন) করতে হবে যাতে খোদাতা'লা নিজেকে তোমার কাছে প্রকাশ করতে পারেন, আর দ্বৈততাও দূর হতে পারে।

দুটি পাখিকে এক সাথে বাঁধো, তাদের (উড়ার ক্ষেত্রে) সাযুজ্য থাকা সত্ত্বেও এবং তাদের দুটি করে পাখাকে চারটিতে রূপান্তরের পরও তারা উড়বে না। এটি এ কারণে যে তাতে দ্বৈততা বিরাজমান। কিন্তু একটি পাখিকে জীবন দিতে দাও, তখন অপর পাখিটি প্রথমটির সাথে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও উড়বে; কেননা দ্বৈততা তখন দূর হয়ে গিয়েছে।

(হযরত) শামস-এ-তাবরিয (রহ:) ছিলেন আল্লাহতা'লার এক (খাস্) বান্দা যিনি কোনো বন্ধুর খাতিরে জীবন উৎসর্গ করতে সমর্থ ছিলেন। তিনি ওই বন্ধুর জন্যে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন, কিন্তু মহান প্রভু



তাঁর ফরিয়াদ কবুল করেননি। এক (গায়েবী) কণ্ঠস্বরকে বলতে শোনা যায়, "আমি চাই না তুমি তাকে সাহায্য করো।" হযরত শামস, ওই সূর্য-সন্তান (শামস-এ-তাবরিয অর্থ তাবরিয নগরীর সূর্য), তাঁর ফরিয়াদে অটল থাকেন এবং বারংবার আরয করেন এই বলে, "হে খোদা! আপনি-ই ওই বন্ধুর জন্যে (অন্তরে) এ শুভকামনা সন্নিবেশিত করেছেন, এ তো আমাকে ছেড়ে যাবে না।" অবশেষে গায়েবী কণ্ঠস্বর বলেন, "তুমি কি এ বিধান জারি হতে দেখতে চাও? তাহলে আত্মোৎসর্গ করো এবং শূন্যে পরিণত হও। অপেক্ষা করো না, এ দুনিয়াকে পেছনে ফেলে এসো।" হযরত শামস্ (রহ:) জবাবে বলেন, "ওহে প্রভু, আমি তাতে রাজি (সন্তুষ্ট)।" তিনি তা-ই করেন; ওই বন্ধুর জন্যে তিনি নিজের জীবন বাজি রাখেন, আর তাঁর শুভকামনা চরিতার্থ হয়। [আরবেরীর নোট: এ কাহিনিতে বন্ধুটি হলেন মওলানা রূমী (রহ:) স্বয়ং। মওলানার ঈর্ষাপরায়ণ ভক্ত-অনুরক্ত অনুসারীরা হযরত শামস (রহ:)-কে তাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু মওলানা তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। কথিত আছে, ওই সকল ঈর্ষাপরায়ণ ভক্ত ও মওলানার নিজের ছেলেদের একজন হযরত শামস (রহ:)-কে পরবর্তীকালে শহীদ করে। মওলানা রূমী (রহ:) তাঁর হারানো পীর ও মোর্শেদ হযরত শামস (রহ:)-এর তালাশ করে তাঁকে নিজের মধ্যেই খুঁজে পান; এই উপলব্ধি-ই মওলানার অনেক কবিতা রচনার উৎস।]

খোদাতা'লার কোনো বান্দা যদি নিজের জীবন উৎসর্গ করার মতো এ ধরনের (খোদাপ্রদত্ত) করুণার অধিকারী হতে পারেন, যে জীবনের (মাত্র) একদিনের অংশ গোটা দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত (প্রাণিকুলের) জীবনের সমান, তাহলে ওই করুণার যিনি (মূল) উৎস (মানে খোদাতা'লা), তিনি কি এ মহব্বতের অধিকারী নন? এর পরিপন্থী চিন্তা করাই অযৌক্তিক হবে। কিন্তু যেহেতু খোদাতা'লার পক্ষে মৃত্যুবরণ করা অসম্ভব, অন্ততঃ তোমার পক্ষে তো তা সম্ভব।

এক নির্বোধ লোক এসে কোনো এক মহান দরবেশের বসার স্থানের চেয়ে উঁচু আসনে উপবিষ্ট হলো। সূফী-দরবেশদের জন্যে এতে কী আসে যায় যদি কেউ প্রদীপের ওপরে বা নিচে অবস্থান করে? প্রদীপ যদি উঁচুতে উঠতে চায়, তবে তা তার নিজের খাতিরে কামনা করে না। বরঞ্চ তা অন্যদের মঙ্গলের খাতিরেই উদ্দেশ্যকৃত; যাতে তারা ওই আলো হতে

তাদের নিজ নিজ অংশ পায়। ওপরে বা নিচে, প্রদীপ যেখানেই অবস্থিত হোক না কেন, তা তবুও চিরস্থায়ী সূর্যের (রূপকার্থে খোদাতা'লার) প্রদীপ। ওই দরবেশ দুনিয়াবী পদমর্যাদা ও আভিজাত্য তালাশ করলেও তা এ উদ্দেশ্যেই অন্বেষিত: সূফী-দরবেশবৃন্দ দুনিয়ার পদমর্যাদা ও আভিজাত্যের মোহ দ্বারা সেসব দুনিয়াদার লোকদের ফাঁদে ফেলেন, যারা তাঁদের (বুযূর্গমণ্ডলীর) প্রকৃত উচ্চ-মকাম বা মর্যাদা দর্শন বা উপলব্ধি করার সামর্থ্য রাখে না। এরই মাধ্যমে দুনিয়াদার লোকেরা হয়তো উচ্চতর (তথা উন্নত আধ্যাত্মিক) জগতের পথ খুঁজে পায়, আর খোদায়ী করুণাধারার হিস্যাদার হয়।

একইভাবে মহানবী (দ:) মক্কা মোয়াযযমা ও আশপাশের অঞ্চল জয় করেছিলেন এ কারণে নয় যে তাঁর এগুলোর প্রয়োজন ছিল। তিনি তা জয় করেছিলেন (তাতে) জীবনদান করতে এবং সকল মানুষকে আলো (নূর) দ্বারা আলোকিত করতে। "এ মোবারক হাত অভ্যস্ত শুধু করতে দান, নয়কো অভ্যস্ত করতে গ্রহণ।" সূফী-দরবেশবৃন্দ মানুষদেরকে টোপ দেন কেবল তাদেরকে বড় বড় এনাম/পুরস্কার বা দান মঞ্জুর করতেই, কোনো কিছু কেড়ে নিতে নয়।

কেউ যখন ছোট ছোট পাখি খাওয়ার উদ্দেশ্যে বা বিক্রির জন্যে ফাঁদ পেতে সেগুলো ধরে, তখন তাকে ধূর্ততা বলা হয়। কিন্তু যদি কোনো রাজা একটি অপ্রশিক্ষিত ও মূল্যহীন বাজপাখি, যার নিজের আসল প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই, তাকে ধরার জন্যে ফাঁদ পাতেন এবং তাকে নিজের (শাহী) বাহু দ্বারা উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত করার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দেন, এমতাবস্থায় তাঁর এ কাজকে ধূর্ততা বলা যায় না। বাহ্যতঃ তা ধূর্ততাপূর্ণ দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তা যত্ন ও মহানুভবতা, মৃতের মাঝে প্রাণের সঞ্চার, নিকৃষ্ট পাথরকে হীরে-জহরতে রূপান্তর এবং তারও ঊর্ধ্বে কোনো কিছু বলে জ্ঞাত হবে। বাদশাহ যে উদ্দেশ্যে বা কারণে বাজপাখিকে আটক করতে চেয়েছেন তা যদি বাজপাখি জানতো, তাহলে তার টোপের প্রয়োজন পড়তো না। তখন সেটি জান-প্রাণ দিয়ে ওই ফাঁদের তালাশ করতো এবং (স্বেচ্ছায়) রাজার (শাহী) হাতে উড়ে এসে বসতো।



মানুষেরা কেবল সূফী-দরবেশবৃন্দের বাণীর বাহ্যিক তাৎপর্যের দিকেই খেয়াল করে বা সেগুলো শোনে। তারা বলে, "আমরা এগুলো প্রচুর শুনেছি। আমাদের অন্তর এ ধরনের কথায় ভরা।" আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ মাফ করুন এ থেকে যে তোমাদের অন্তরগুলো ওসব কথায় পূর্ণ! বস্তুতঃ তোমাদের অন্তর তোমাদের নিজেদেরই অপবাদের ফিসফিসানি ও মিথ্যে আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ। তোমরা পুরোপুরি মোহাচ্ছন্ন ও লোভে পূর্ণ। না, তোমরা বরঞ্চ অভিসম্পাতেই পূর্ণ।"

আহা, তারা যদি এরকম অর্থহীন প্রলাপ হতে মুক্ত হতে পারতো! তাহলে তারা (সূফী-দরবেশের) ওসব বাণী গ্রহণের জন্যে উন্মুক্ত হতে সক্ষম হতো। কিন্তু তা গ্রহণের জন্যে তারা উন্মুক্ত নয়। খোদাতা'লা তাদের কান, চোখ ও অন্তরগুলোতে মোহর মেরে দিয়েছেন। তাই তাদের চোখ সবকিছু উল্টো দেখছে; তারা জ্ঞানের কথাকে ছাইপাশ ও প্রলাপ হিসেবে শুনছে। তাদের অন্তর আত্মপ্রেম ও অহমিকার আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে। শীতকালের (কুয়াশাচ্ছন্ন) কালো আঁধারি ও অহঙ্কার তাদের ওপর ভর করেছে। তাদের অন্তর ঠাণ্ডা ও শক্ত বরফ দ্বারা কঠিন হয়ে গিয়েছে।

"আল্লাহতা'লা তাদের অন্তরে ও শ্রবণশক্তিতে মোহর মেরে দিয়েছেন আর তাদের চোখে পড়েছে এক পর্দা।" [সরাসরি অনুবাদ]

এ বাণী ওই সব লোকের জন্যে কতোই না সত্য! তারা তো কখনো এসব কথার (মানে'র) এক ঝলকও দেখতে পায়নি। তারা বা তাদের উপাস্যরা অথবা তাদের হতভাগা পরিবার-সদস্যরা তাদের সারা জীবনে এর এক ফোঁটাও স্বাদ গ্রহণ করেনি। পরওয়ারদেগার-এ-আলম সবাইকেই একটি কলস দেখান। কাউকে কাউকে তিনি তা পানিপূর্ণ দেখান, আর তাঁরা তেষ্টা না মেটা পর্যন্ত জলপান করেন। কিন্তু খোদাতা'লা কাউকে কাউকে আবার পানিশূন্য কলস প্রদর্শন করেন। খালি কলসের জন্যে কেউ কী-ই বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে? খোদাতা'লা যাঁদেরকে পানিপূর্ণ কলস প্রদর্শন করেন, শুধু তাঁরাই এ ঐশীদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে সক্ষম হন।

## উপদেশ বাণী - ৭

আমীর (শাসক)-এর পুত্র মওলানা রূমী (রহ:)-এর দরবারে প্রবেশ করেন। মওলানা বলেন: আপনার বাবা সব সময়-ই আল্লাহর ধ্যানে ব্যস্ত। তাঁর আকীদা-বিশ্বাস পরিপূর্ণ এবং তাঁর কথাবার্তায় তা প্রতিফলিত হয়। একদিন আপনার বাবা বলেন, "রোম (আসলে তুরস্কের কোনিয়া) অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ আমাকে তাকিদ দিয়েছেন যাতে আমি আমার কন্যা তাঁতারদের কাছে (বিয়েতে) সম্প্রদান করি; এর ফলে আমাদের ধর্ম একই ধর্মে পরিণত হবে, আর মুসলমানদের এই নতুন ধর্ম-ও অদৃশ্য হয়ে যাবে।"

আমি (আমীর) বল্লাম: "ধর্ম কবে এক হয়েছে? সব সময়-ই দুই বা তিনটি ধর্ম বিদ্যমান ছিল, আর তাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ-ও সর্বদাই লেগে ছিল। সব ধর্মকে কীভাবে এক করার আশা করছেন আপনারা? একমাত্র পরকালেই তথা পুনরুত্থানেই তা এক হবে। বর্তমান এ দুনিয়ায় এটি সম্ভব নয়, কেননা প্রতিটি ধর্মেরই আলাদা আলাদা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিরাজমান এবং সেগুলোর রূপরেখাও ভিন্ন। এখানে ঐক্য অসম্ভব ব্যাপার। পুনরুত্থানের সময়েই কেবল তা সম্ভব হবে, যখন মানব সমাজ এক (কাতারবদ্ধ) হবে এবং একটি স্থানের দিকেই তাদের দৃষ্টিকে স্থির রাখবে, আর সবার হবে একটি কান ও একটি জিহ্বা।"

আমাদের ভেতরে অনেক বস্তুর বাস। আমাদের মধ্যে রয়েছে ইঁদুর, আবার রয়েছে পাখিও। একদিকে পাখি (দেহ-) খাঁচাটি ওপরে বহন করে নিয়ে যায়, অপরদিকে ইঁদুর নিচের দিকে টানে। আমাদের ভেতরে একত্রে বাস করে এমন-ই এক লাখ ভিন্ন ভিন্ন জাতের বন্য জন্তু-জানোয়ার; তারা সবাই সমবেত হবে ওই মুহূর্তটিতে, যখন ইঁদুর বা পাখি তার আপন সত্তা ত্যাগ করবে, আর সবাই এক হবে। কেননা, লক্ষ্য ওপরে ওঠা বা নিচে নামা নয়। লক্ষ্য যখন নিজেকে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করবে, তখন তা ওপরে কিংবা নিচে হবে না।

কোনো নারী তার একটি জিনিস হারিয়েছে। সে ডানে, বাঁয়ে, সামনে ও পেছনে তাকায়। একবার তা পেয়ে গেলে সে ওপরে, নিচে, ডানে, বাঁয়ে, সামনে বা পেছনে, কোনো দিকেই আর খোঁজ করে না। তৎক্ষণাৎ সে



শান্ত ও সৌম্যভাব ধারণ করে। অনুরূপভাবে, পুনরুত্থান দিবসেও সকল মানুষের একই চোখ, একই জিহ্বা, একই কান ও উপলব্ধি হবে।

দশজন বন্ধু যখন একই সাথে কোনো বাগান বা দোকান ভাগাভাগি করে বা তার অংশীদার হয়, তখন তারা এক হয়ে কথা বলে, এক হয়েই পরিকল্পনা করে, আর একযোগে কাজ করে; কেননা তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই। অতএব, পুনরুত্থান দিবসেও যেহেতু তাদের বিষয়গুলো হবে খোদাতা'লার সাথে, সেহেতু তারা হবে এক।

এই দুনিয়ায় একেকজন একেক বিষয় নিয়ে মগ্ন। কেউ নারীর প্রেমে বিভোর, কেউ বা সম্পদের, আবার কেউ জমি-সম্পত্তি সংগ্রহের চিন্তায়; আর কেউ জ্ঞানার্জনে রয়েছে ব্যস্ত। সবাই বিশ্বাস করে যে তাদের আরোগ্য, তাদের আনন্দ-বিনোদন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব ওই একটি বিষয়ের মাঝেই পাওয়া যাবে। আর তা হচ্ছে খোদায়ী তথা ঐশী করুণা, কারণ তারা যখন খোঁজ করে তখন (তা) পায় না; আর তাই তারা ফিরে আসে। কিছুকাল অপেক্ষার পরে তারা আবার বলে, "ওই খুশি ও আনন্দ তালাশ করা দরকার। হয়তো আমি যথেষ্ট চেষ্টা করিনি। অতএব, আমি আবার খুঁজে দেখবো।" অতঃপর তারা আবার এর সন্ধান করে, কিন্তু তবু তারা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার দেখা পায় না। এমতাবস্থায় তারা তালাশ করতেই থাকে, যতোক্ষণ না হক্ক (সত্য তথা খোদাতা'লা)-এর নিজস্ব পর্দা ওঠাবার সময় উপস্থিত হয়। অতঃপর তারা (ভেদ) জানতে পারে।

কিন্তু খোদাতা'লার এমন কিছু বান্দা আছেন, যাঁরা পুনরুত্থানের আগেই বিষয়টি জানেন। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহূল করীম (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই ও তাঁর মেয়ের জামাতা) বলেন, "পর্দা ওঠানো হলেও আমার ঈমান (বিশ্বাস) বৃদ্ধি পাবে না।" এর মানে হলো, "দেহত্যাগ ও পুনরুত্থান হলেও আমার এয়াকিন (নিশ্চিত বিশ্বাস) আর বাড়বে না।" এর উদাহরণ হলো একদল মানুষের মতো, যারা কোনো অন্ধকার রাতে এবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন; তারা কিছু দেখতে না পেয়ে প্রতিটি দিকেই মুখ ফেরায়। দিনের আলো ফুটলে তারা সবাই (দিক পরিবর্তন করে) ঘুরে দাঁড়ায়, ব্যতিক্রম শুধু একজন যিনি সারা রাত মক্কা শরীফের দিকে কেবলামুখী ছিলেন। ওই ব্যক্তি কেন-ই বা ঘুরবেন? অতএব, খোদাতা'লার ওই সকল খাস্ (প্রিয়) বান্দা রাতেও খোদার দিকে

মুখ করে থাকেন, আর তাঁরা যাবতীয় বস্তু হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তাই তাঁদের জন্যে পুনরুত্থান ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে এবং তা বর্তমান।

কথার কোনো শেষ নেই, তবে তা অন্বেষণকারীর (উপলব্ধির) সামর্থ্য অনুযায়ী বলা হয়ে থাকে।

জ্ঞান-প্রজ্ঞা হচ্ছে বারিধারার মতো। এর জোগান অসীম, কিন্তু এর বর্ষণ হয় পরিস্থিতি অনুযায়ী - শীত ও বসন্তে, গ্রীষ্ম ও হেমন্তে সবসময়-ই পর্যাপ্ত পরিমাণে কম-বেশি নেমে আসে। কিন্তু ওই বৃষ্টির উৎস হচ্ছে মহাসাগর নিজে, যার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। ওষুধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা এক ফালি কাগজের মোড়কে চিনি ও ওষুধ স্থাপন করেন, কিন্তু ওই কাগজে রাখা চিনির পরিমাণ তো চিনিকে সীমিত করতে পারে না। চিনি ও ওষুধের মওজূদ হলো সীমাহীন; এক টুকরো কাগজ কীভাবে তা ধারণ করবে?

কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ (দ:)-কে বিদ্রুপ করে বলেছিল, "কেন আপনার প্রতি কুরআন শব্দের পর শব্দে অবতীর্ণ হয়? কেন অধ্যায়ের পর অধ্যায় নয়?" তিনি উত্তর দেন, "এই নির্বোধ লোকেরা বলে কী? যদি তা আমার প্রতি একবারেই অবতীর্ণ হতো, তবে আমি গলে গিয়ে মিলিয়ে যেতাম।"

সামান্য যাঁরা বোঝেন, তাঁরা ভালোই বোঝেন; কোনো এক বিষয় সম্পর্কে বুঝলে অনেক বিষয় সম্পর্কেই বোঝেন; এক লাইন বুঝলে গোটা গোটা বই-ই বোঝেন। এর উদাহরণ হলো এমন একটি দল যারা বসে গল্প শুনছে। কিন্তু একজন মহিলা ওই কাহিনীর সমস্ত ঘটনা-ই জানেন, কেননা তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কাহিনীর সূচনাতেই তিনি পুরো ঘটনা সম্পর্কে বুঝে যান। তিনি প্রথমে ফ্যাকাশে, তারপর টকটকে লালবর্ণ এবং এরপর এক অনুভূতি থেকে আরেক পরিবর্তিত অনুভূতি লাভ করতে থাকেন। অন্যান্যরা যতোটুকু শোনে শুধু ততোটুকুই বোঝে, যেহেতু তারা জানে না আসলে কী ঘটেছিল। কিন্তু যিনি জানেন তিনি মাত্র কয়েকটি কথাতেই সম্পূর্ণ ঘটনা বুঝতে পারেন।

আবার আমাদের কথায় ফিরে আসি, আপনি যখন ওষুধ বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারকের কাছে গমন করেন, তখন তাদের কাছে প্রচুর চিনি থাকে।



কিন্তু তারা দেখেন আপনি কী পরিমাণ অর্থ (কতো টাকা) এনেছেন, আর সে অনুযায়ী তারা চিনি সরবরাহ করেন। 'অর্থ' শব্দটি দ্বারা আন্তরিকতা ও বিশ্বাসকে বোঝানো হয়েছে। কারো আন্তরিকতা ও বিশ্বাস অনুযায়ী শব্দগুলো শিক্ষা দেয়া হয়। আপনি যখন চিনির খোঁজে আসেন, তাঁরা তখন আপনার থলের সামর্থ্য যাচাইয়ের জন্যে থলে পরীক্ষা করেন; এরপর তারা সে অনুযায়ী মেপে এক বা দুই বুশেল (মেট্রিক পদ্ধতির আগে পরিমাপের একক) দেন। কিন্তু কেউ যদি এক সারি উট নিয়ে আসেন, তবে তারা (পাল্লায়) মাপবার লোকদের সাহায্য চান।

অতঃপর, এমন কারো আগমন হয় যাকে সাগর-মহাসাগরও সন্তুষ্ট করতে পারে না; (আবার) আরেকজন কয়েক ফোঁটায় খুঁজে পান সন্তুষ্টি, আর এর বেশি পাওয়াকে ক্ষতিকর মনে করেন।

এ ব্যাপারটি শুধু চিন্তা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বেলাতেই প্রযোজ্য নয়, বরং তা সব বিষয়ের ক্ষেত্রেই সত্য। সম্পত্তি, সম্পদ, স্বর্ণ, এগুলোর সবই সীমাহীন ও অশেষ, কিন্তু এগুলো কোনো ব্যক্তির সামর্থ্য অনুযায়ী (তাকে) দেয়া হয়। অশেষ, অফুরন্ত এক জোগান পেলে কার না মাথা খারাপ হবে? আপনি কি দেখেননি কীভাবে মজনূন ও ফরহাদ এবং অন্যান্য প্রখ্যাত প্রেমিকবর্গ নিজ নিজ প্রেমিকার জন্যে নিয়ন্ত্রণহীন এক প্রেমের টানে পাহাড়ে বা মরুভূমিতে ছুটে গিয়েছিলেন? আপনি কি দেখেননি ফেরাউন কেমন করে সীমাহীন সাম্রাজ্য ও অঢেল সম্পদ (খোদার কাছ থেকে) পেয়ে নিজেকে খোদা দাবি করে বসেছিল?

হ্যাঁ, অবশ্যই এসব লোকের বিশ্বাস আছে, কিন্তু তারা জানে না ওই বিশ্বাস কোথায় নিহিত। একইভাবে কোনো শিশু বিশ্বাস করে সে রুটি খেতে পাবে, কিন্তু শিশুরা জানে না কোথা হতে তাদের এ রুটি আসে। বেড়ে ওঠে এমন সব কিছুর বেলায়ও এ কথা প্রযোজ্য। তেষ্টার কারণে গাছ হলুদ ও শুষ্ক হয়ে যায়, কিন্তু এটি জানে না তেষ্টা প্রকৃতপ্রস্তাবে কী বস্তু।

আমাদের (ধর্ম-) বিশ্বাস হচ্ছে একটি পতাকার মতো। প্রথমে আমরা নিজেদের বিশ্বাসের ঘোষণা দিতে ওই পতাকা হাওয়ায় পতপত করে মেলে ধরি; আর ওর সমর্থনে ওর পাদদেশে চারদিক থেকে সৈন্য প্রেরণ করি। আমরা ওর সমর্থনে নিরন্তর যুক্তি ও উপলব্ধি, রাগ-রোষ, ধৈর্য ও

উদারতা, শঙ্কা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার শরণাপন্ন হই। দূর থেকে যে কেউ দেখতে পান শুধু পতাকাটিকে; কিন্তু কাছে থেকে যে ব্যক্তি দেখেন, তিনি আমাদের অন্তঃস্থ গুণাবলী ও বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে পারেন।

কেউ একজন দরবারী মজলিশে প্রবেশ করলে মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: তুমি কোথায় ছিলে? তোমার দেখা পেতে আমরা কতোই না উদগ্রীব ছিলাম। কেন তুমি দূরে ছিলে?

দর্শনার্থী উত্তর দেন: "ঘটনাচক্রেই এরকম হয়েছে।"

মওলানা বলেন: আমাদের দিক হতে আমরা এ চক্রের ইতি কামনা করে দোয়া করেছি। যে ঘটনাচক্র বিচ্ছেদ ঘটায় তা অসঙ্গত। হ্যাঁ, খোদার কসম, সেটিও খোদার তরফ থেকেই আগত; আর খোদার সাথে সম্পর্কিত বিষয় ভালো। এটি সত্য ভাষণ যে খোদার সাথে সম্পর্কিত সবকিছু-ই ভালো ও নিখুঁত; কিন্তু আমাদের সাথে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে এটি কীভাবে সত্য হতে পারে? অবৈধ যৌনাচার ও (তা হতে) সততা/সতীত্ব, নামায তরক করা (এড়ানো) ও নামায আদায়, অবিশ্বাস (কুফরী) ও ইসলাম (ধর্মে বিশ্বাস), অংশীবাদ (মূর্তি পূজা) ও খোদাতা'লার একত্ব - এসবই খোদাতা'লার বেলায় ভালো। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে অবৈধ যৌনাচার ও চুরি, কুফরী ও শেরেক (অংশীবাদ) হচ্ছে মন্দ; অপরদিকে খোদাতা'লার একত্ব ও নামায-দোয়া উত্তম, যদিও খোদাতা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এগুলোর সবই ভালো।

কোনো রাজার রাজ্যে রয়েছে কয়েদখানা ও ফাঁসিকাষ্ঠ, (রাষ্ট্রীয়-) সম্মানের ভূষণ ও ধনসম্পদ, জমি-সম্পত্তি ও খাদেমদার, ভোজ ও আনন্দ-উৎসব, ঢোল-বাদ্য ও পতাকা। রাজার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এগুলোর সবই ভালো। সম্মান ও মর্যাদার ভূষণ যেমন তাঁর রাজ্যের নিখুঁত সমৃদ্ধি, কয়েদখানা ও ফাঁসিকাষ্ঠ-ও তেমনি উৎকৃষ্ট অলঙ্করণ। তাঁর ক্ষেত্রে এগুলোর সবই নিখুঁত; কিন্তু তাঁর প্রজা সাধারণের বেলায় সম্মানের ভূষণ ও ফাঁসিকাষ্ঠ কীভাবে একই ও অনুরূপ হতে পারে?



## উপদেশ বাণী - ৮

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) জিজ্ঞেস করেন: "নামাযের চেয়ে বড় কী?"

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: একটি উত্তর হলো, নামাযের রূহ (আত্মা) নামাযের চেয়ে বড়, যেমনটি আমি ব্যাখ্যা করেছি। দ্বিতীয় উত্তরটি হলো, ঈমান তথা বিশ্বাস আরও বড়।

নামায তথা প্রার্থনা হচ্ছে দৈনন্দিন কর্মের একটি ক্রম, অপরদিকে ঈমান চলমান (প্রক্রিয়া)। নামায কোনো বৈধ কারণে বাদ কিম্বা পিছিয়ে দেয়া যায়; কিন্তু কোনো অজুহাতেই ঈমানকে বাদ কিম্বা পিছিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। আর যেখানে ঈমানবিহীন নামায-দোয়া নিষ্ফল, যেমনটি ঘটে থাকে মোনাফেকদের বেলায়, সেখানে নামাযহীন ঈমান কিন্তু মূল্যবান।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়: প্রতিটি ধর্মের প্রার্থনা-পদ্ধতি যেখানে একেবারে ভিন্ন, বিশ্বাসের (ধরন/রীতি) কিন্তু এক ধর্ম থেকে আরেক ধর্মের বেলায় তেমন পার্থক্য নেই। এর থেকে সৃষ্ট হাল বা (মনের) অবস্থাসমূহ, জীবনে এর স্থান ও প্রভাব সর্বত্র একই।

বিশ্বাসের অন্যান্য সুবিধাও বিদ্যমান, তবে সেগুলোর সন্ধান পাওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে শ্রোতার অন্তঃস্থ সচেতনতার ওপর। প্রত্যেক শ্রোতাই হলো আটার কাই প্রস্তুতকারীর হাতে আটার মতো। কথা (উপদেশ বাণী) ওই আটার কাইয়ে চাহিদা মতো আদ্রতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ছিটানো পানির মতো। কিন্তু যতোক্ষণ পর্যন্ত পানি দ্বারা আটা না ভিজবে, ততোক্ষণ সেটি কাই বানাতে পারবে না।

কোনো এক কবি বলেন:

মোর আঁখি রয়েছে স্থির অন্যত্র, আমার করণীয় কী?
নিজের দিকে চাও, কারণ তুমি-ই ওই নয়নের জ্যোতি।

"মোর আঁখি রয়েছে স্থির অন্যত্র।" এর মানে তুমি তোমার থেকে পৃথক কোনো কিছু অন্বেষণ করছো, যেমনটি নাকি আটার কাই প্রস্তুতকারীর হাতে অবস্থিত আটার শুষ্কতা পানি খুঁজে থাকে। "আমার কী করণীয়?" জেনে রাখো, তুমি শুধু তোমার নিজেকেই তালাশ করো; ওই অন্তরের

আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে তোমারই জন্যে। তুমি যে জ্যোতির অন্বেষণ করো, তা তোমারই আলোর প্রতিবিম্ব। কিন্তু তুমি তো বাইরের এই চোখ-ধাঁধানো আলোর তীব্র চাহনি থেকে রেহাই পাবে না, যদি না তোমার নিজস্ব অন্তঃস্থ জ্যোতি (তার চেয়ে) লক্ষ গুণ তীব্রতর হয়।

কোনো এক সময়ে ছিল এক হাড্ডিসার ব্যক্তি; সে ছিল চড়ুই পাখির মতো দুর্বল এবং দেখতে মাত্রাতিরিক্ত কুৎসিত। সে এতোই বিশ্রী ছিল যে এমন কী অন্যান্য কুৎসিত লোকেরাও তাকে ঘৃণার চোখে দেখতো এবং আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করতো; অথচ তাকে দেখার আগে তারাই নিজেদের কুৎসিত চেহারার ব্যাপারে মহা প্রভুর কাছে ফরিয়াদ করতো। এতদসত্ত্বেও সে তার কথাবার্তায় ছিল রূঢ় এবং বড় বড় কথা বলতো। সে রাজার দরবারে হাজিরা দিতো, আর তার আচরণে উজির খুবই ব্যথিত হতেন, যদিও তিনি তা (উচ্চবাচ্য না করেই) হজম করতেন। কিন্তু একদিন আর উজির মেজাজ সামলাতে পারেননি।

উজির চিৎকার করে বলেন, "রাজদরবারের সভাসদবৃন্দ, আমি এই জন্তুকে বস্তি থেকে তুলে এনে হৃষ্টপুষ্ট করেছি। আমারই রুটি খেয়ে, আমারই টেবিলে বসে, আমারই দান-সদকা ও সম্পদ এবং আমার পূর্বপুরুষদের সম্পদ ভোগ করে বর্তমানে সে কেউ একজন বনেছে। এখন সে আমাকে এ ধরনের কথা বলার মতো অবস্থায় উপনীত হয়েছে!"

অতঃপর ওই কুৎসিত লোকটি উজিরের সামনে লাফিয়ে ওঠে উচ্চস্বরে বলে, "রাজদরবারের সভাসদমণ্ডলী, রাজ্যের কর্ণধারবৃন্দ! উজির যা বলেছেন তা নির্ভেজাল সত্য। আমি তাঁর সম্পদ ও দান-সদকায় এবং তাঁরই পূর্বপুরুষদের সম্পদে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছি - যতোদিন না আমি বেড়ে ওঠেছি, আপনাদের নজরে ঘৃণিত ও স্থূল ব্যক্তিটিকে যেমনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি যদি অন্য কারো রুটি খেয়ে আর সম্পদ ভোগ করে হৃষ্টপুষ্ট হতাম, তাহলে নিশ্চয় আমার আকৃতি, আচার-ব্যবহার ও মূল্য এর চেয়ে বেশি হতো। তিনি আমাকে বস্তি থেকে তুলে এনেছেন ঠিকই, তবে আমি এতোটুকু বলবো যে আমি যদি ধুলো হতে পারতাম, তবে তা-ই উত্তম হতো। অন্য কেউ আমাকে বস্তি থেকে তুলে আনলে আমি এরকম হাসির খোরাক হতাম না।"



খোদাতা'লার কোনো আশেকের টেবিলে যে শিষ্যকে খাওয়ানো হয়, তাঁর আত্মা খাঁটি ও নির্মল। কিন্তু কোনো ছদ্মবেশী ভণ্ড ও বড়াইকারীর হাত দ্বারা যাদেরকে খাওয়ানো হয়, তারা তার কাছ থেকে ওই বিদ্যা শিখে তাদের শিক্ষকের মতোই ঘৃণিত ও দুর্বল এবং কোনো কিছুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

আমাদের সত্তার অভ্যন্তরে সকল জ্ঞান-ই মৌলিকভাবে একটি (জ্ঞান) হিসেবে সংযুক্ত ছিল, যাতে আমাদের আত্মাসমূহ সমস্ত লুকোনো বস্তু প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়; যেমনটি জল নিজের ভেতরে লুকোনো নুড়ি, মাটির পাত্রের ভাঙ্গা টুকরো ইত্যাদি বস্তু নিজ পৃষ্ঠভাগ হতে আয়নার মতো ওপরের আকাশে প্রতিফলন করে থাকে। এটি-ই পরিশোধন বা প্রশিক্ষণ ছাড়া রূহ তথা আত্মার আসল প্রকৃতি। কিন্তু একবার রূহ দুনিয়ার (পৃথিবীর) সাথে এবং দুনিয়াবী উপাদানগুলোর সাথে মিশলে এই স্বচ্ছতা রূহ হতে দূর হয়ে যায় এবং তা বিস্মৃত-ও হয়ে যায়। তাই খোদাতা'লা তাঁর আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া (রহ:)-বৃন্দকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন - এমনভাবে যেন এক আলোকপ্রবাহী মহাসাগর, যেটি সকল জলধারা-ই গ্রহণ করে, আর ওই জলধারা যতো নোংরা ও কালো-ই হোক না কেন, মহাসাগরটি খাঁটি ও নির্মল থাকে। অতঃপর রূহ স্মরণ করতে সক্ষম হয় (ইতিপূর্বেকার অবস্থা)। যখন সে নিজের প্রতিফলন ওই পরিষ্কার, স্বচ্ছ পানিতে দেখতে পায়, তখন রূহ নিশ্চিত জানে প্রারম্ভে সে-ও খাঁটি ছিল, আর এসব ছায়া ও রং স্রেফ দুর্ঘটনা-ই।

অতএব, আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া (আ:)-বৃন্দ আমাদেরকে নিজেদের মৌলিক হাল তথা অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেন; তাঁরা নতুন কোনো কিছু আমাদের মধ্যে প্রোথিত করেন না। অতঃপর প্রতিটি জলধারা, তা যতো কালো-ই হোক না কেন, যখন ওই মহা জলধারাকে চিনতে পারে, তখন তা বলে "আমি এই জলধারা থেকে এসেছি এবং এরই অংশ"; এমতাবস্থায় তা প্রকৃতপ্রস্তাবেই ওই মহাসাগরের অংশ বটে। কিন্তু মহাসাগরকে চিনতে অক্ষম কালো উপাদানগুলো বিশ্বাস করে যে তারা অন্য কোনো ধরনের উপাদানের সমগোত্রীয়; তারা তাই দুনিয়ার রং ও ছায়াসমূহের মাঝে বসতি স্থাপন করে।

এ কারণেই মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান, "তোমাদের কাছে এসেছেন এক রাসূল তোমাদেরই মধ্য হতে।" আরেক কথায়, মহাসাগরটি তোমাদের নিজ নিজ জলধারার মতো একই বস্তু (উপাদান); এগুলোর সবই এক সত্তা ও এক উৎস থেকে নিঃসৃত। কিন্তু ওই সকল উপাদান যেগুলো সাযুজ্যের আকর্ষণ বোধ করে না, তাদের এই ব্যর্থতা স্বয়ং পানি হতে সৃষ্ট নয়, বরং ওই পানিতে নিহিত দূষণ হতে সৃষ্ট। এই দূষণ এতো গভীরভাবে মিশেছে যে জলধারা জানেই না মহাসাগর হতে তার দূরে সরে যাওয়াটি নিজের কারণে, না দূষণের নির্যাসের জন্যে ঘটেছে। আর তাই মন্দ লোকেরা জানে না তাদের মন্দপ্রীতি নিজেদের প্রকৃতি থেকে নিঃসৃত, না সংমিশ্রিত কোনো কৃষ্ণ উপাদান থেকে পয়দা।

আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া (রহ:) যে কাব্যের প্রতিটি লাইন উপস্থাপন করেন, বা প্রতিটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন, কিংবা প্রতিটি পংক্তি লেখেন, তা একেকটি সাক্ষ্যের বিবরণের মতো। তাঁরা প্রতিটি পরিস্থিতির প্রকৃতি অনুযায়ী ওই পরিস্থিতির সাক্ষ্য বহন করেন। আমাদের যেমন কোনো বাড়ির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে দুজন সাক্ষী লাগে, কিম্বা কোনো দোকান বিক্রির সময়ও দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন পড়ে, অথবা বিয়েতেও দুজন সাক্ষীর দরকার হয়, ঠিক তেমনি আউলিয়া (রহ:)-ও সাক্ষ্য বহন করেন। তাঁদের সাক্ষ্যের অভ্যন্তরীণ আকার-আকৃতি সবসময় একই রকম হয়ে থাকে; কেবল বাহ্যিক অর্থের ক্ষেত্রেই পার্থক্য বিরাজমান। আমি দোয়া করি যেন খোদাতা'লা (আমার) এই (উপদেশ-) বাণীকে তাঁর কাছে এবং তোমাদের মাঝেও সাক্ষ্যবহনের তৌফীক (সামর্থ্য) দেন (আমীন)।

## উপদেশ বাণী - ৯

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) বলেন: "এক ব্যক্তি আপনার (মওলানা রূমীর) সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তিনি বারবার বলছিলেন, আহা, আমি যদি মোর্শেদের দেখা পেতাম।"

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: এ মুহূর্তে মোর্শেদকে ওই ব্যক্তি দেখবে না, কেননা তাঁর দেখা পাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা ওকে গ্রাস করেছে, তা আসলে একটি পর্দা, যেটি মোর্শেদকে আড়াল করে রেখেছে। আর এই একই



অবস্থা বিরাজ করে সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে, যা মানুষেরা লালন বা পোষণ করে বিভিন্ন বিষয় বা বস্তুর প্রতি; যেমন মা-বাবা, বেহেশ্‌ত, দুনিয়া, বাগান, প্রাসাদ, জ্ঞান, পানাহারের দ্রব্য ইত্যাদি। খোদার আশেক তথা প্রেমিকজন জানেন এসব আকাঙ্ক্ষা আসলে খোদাতা'লারই প্রতি আকাঙ্ক্ষা, এবং এগুলোর সবই মানবচক্ষে বসানো পর্দা বটে। আমরা যখন পরলোকে গমন করবো এবং এসব পর্দা ছাড়াই বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করবো, তখন আমরা অনুধাবন করতে পারবো যে ওগুলো পর্দামাত্র; আর এ-ও উপলব্ধি করবো যে বাস্তবে আমাদের প্রকৃত অন্বেষণ হচ্ছে একজন। এমতাবস্থায় সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, আমরা আমাদের অন্তরে সকল প্রশ্নের উত্তর-ই শুনতে পাবো; আর সবকিছুই তখন সামনাসামনি প্রত্যক্ষ করা হবে।

প্রতিটি সমস্যার উত্তর আলাদা আলাদাভাবে দেয়া খোদাতা'লার স্বভাব বা রীতি নয়, বরঞ্চ তিনি একটি উত্তরেই সব প্রশ্নের চাহিদা পূরণ করেন। একবারেই সমগ্র সাধনা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে থাকে। একইভাবে শীতকালে প্রত্যেকে গরম কাপড়-চোপড় পড়েন এবং ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে আশ্রয় খোঁজেন। সব উদ্ভিদ, গাছ-গাছালি ও লতা-গুল্ম হিমপ্রবাহে আক্রান্ত হয়ে একইভাবে পাতা ও ফলবিহীন থাকে; তবে তারা আপন আপন মালামাল ও পুষ্টি নিজেদের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখে যাতে শীত তা কব্জা করতে না পারে। অতঃপর বসন্ত যখন এক ঈদের দিবসের মতোই তাদের সকল অনুরোধ গ্রহণ করে নেয়, তখন তাদের নানা সমস্যা, চাই তা মানবের বা জীবজন্তুরই হোক, অথবা উদ্ভিদেরই হোক, একই সাথে সমাধান হয়ে যায়; আর ওই সকল গৌণ উপসর্গ-ও (হাওয়ায়) মিলিয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা চিন্তামগ্ন হয়ে তাদের দুঃখকষ্টের কারণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

খোদাতা'লা একটি ভালো উদ্দেশ্যে এসব পর্দা সৃষ্টি করেছেন। কেননা যদি কোনো পর্দা ছাড়া খোদার সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটতো, তাহলে আমরা তা সহ্য করতে পারতাম না। এসব পর্দার মধ্যস্থতায় আমরা জীবন ও সুখ-আনন্দ আহরণ করে থাকি।

সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখো। এর আলো দ্বারা আমরা মন্দ হতে ভালোকে পৃথক করতে পারি, আর উত্তাপও পেয়ে থাকি। গাছ-গাছালি ও ফলের

বাগান এর তাপ হতে ফলদায়ক হয় এবং সেগুলোর অপরিপক্ক ও তেতো ফলগুলো পেকে মিষ্ট স্বাদে পরিণত হয়। সূর্যকিরণের প্রভাবে সোনা ও রূপা, লালমণি ও মৃদুরক্তিম সীসমণির খনিগুলো উৎপন্ন হয়। কিন্তু যদি সূর্য এর আরো কাছে আসতো, তাহলে তা কোনো উপকার-ই বহন করে আনতো না। পক্ষান্তরে, সমগ্র পৃথিবী ও প্রতিটি প্রাণি-ই জ্বলে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যেতো।

খোদাতা'লা যখন নিজেকে পাহাড়ের কাছে কোনো পর্দার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন, তখন পাহাড়ের ওই ঢালগুলো গাছ-গাছালি, পুষ্প ও তাজা শ্যামলিমায় সুশোভিত হয়। তবে তিনি যখন পর্দা ছাড়াই ওহী (ঐশী বাণী) প্রকাশ করেন, তখন তা পাহাড়কে গলিত করে এবং অণুকণায় করে রূপান্তরিত। [নোট: হযরত মূসা (আ:)-এর ঘটনা]

এ পর্যায়ে কেউ একজন জিজ্ঞেস করেন: "উত্তম, শীতকালে এটি কি ওই একই সূর্য নয়?"

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: এখানে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল একটি তুলনা দেয়া। এটি অণুকণা সংক্রান্ত বিষয় নয়, বা আদম (আ:)-এর ব্যাপারও নয়। সাযুজ্য এক কথা, তুলনা আরেক। যদিও আমাদের মস্তিষ্ক ওই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে অক্ষম, তবু-ও তা কীভাবে সেটিকে বোঝার চেষ্টা পরিত্যাগ করতে পারে? আমাদের বিচার-বুদ্ধি এ অনুধাবন প্রয়াসের হাল যদি ছেড়ে দেয়, তবে তা আর বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তি থাকবে না। যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধি হচ্ছে ওই জিনিস যা রাত-দিন চিন্তা ও সংগ্রামে রত থাকে, বোঝার চেষ্টা করে - যদিও খোদাতা'লাকে জানা যাবে না এবং তিনি অবোধগম্য।

যুক্তি হচ্ছে আলোর পোকার মতো, আর প্রেমাস্পদ (মানে খোদাতা'লা) হলেন চেরাগ বা মোমবাতির মতো। পোকা যখনই মোমবাতির দিকে ধেয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ তা জ্বলে খাক হয়; কিন্তু পোকার স্বভাব তো ওই রকমই। ওই আগুন ও তাতে জ্বলে পোড়া যতোই বেদনাদায়ক হোক না কেন, আলোর পোকা মোমবাতি থেকে উড়ে দূরে যেতে পারে না। আলোর পোকার মতো যদি আরেকটি প্রাণি থাকতো যেটি মোমবাতির আলো থেকে দূরে উড়ে যেতে পারে না, আর নিজেকে তাতে পুড়িয়ে খাক করে, তাহলে তা স্রেফ তুলনা হবে না, বরং তা স্বয়ং আলোর পোকাই



হবে। কিন্তু যদি আলোর পোকা মোমবাতির আলোর দিকে ধেয়ে যায় এবং তাতে না পোড়ে, তাহলে নিশ্চয় তা কোনো মোমবাতি নয়।

অতএব, যে মানব-সত্তা খোদাকে ছেড়ে থাকতে পারে, এমন কী তাঁর (নৈকট্যপ্রাপ্তির) আকাঙ্ক্ষাও নিজ অন্তরে লালন করে না, সে কোনো মানুষই নয়। কিন্তু মানুষ যদি খোদাকে অনুধাবন করতে পারে, তাহলে সেটিও কোনো খোদা নয়। তাই (খোদাতা'লার) প্রকৃত আশেক-ভক্তবৃন্দ কখনোই নিরন্তর সাধনা থেকে মুক্ত নন; তাঁরা খোদাতা'লার জ্যোতির চারদিকে অস্থির ও বিরামহীনভাবে ঘুরে বেড়ান। আর খোদাতা'লা তাঁদের পুড়িয়ে খাক করেন, তাঁদের যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধিরূপ পর্দাকে (ঠুলিকে) ভস্মিভূত করে দেন।

## উপদেশ বাণী - ১০

আমীর (রাজ্যের শাসক) মওলানা রূমী (রহ:)-কে বলেন: "আপনার এই মাত্র এখানে আসার আগে আপনারই জ্যেষ্ঠপুত্র বাহাউদ্দীন আমার কাছে বিনীতভাবে বলেছিল, 'আমার বাবা (মওলানা রূমী) জানিয়েছেন আপনি যখন দরবারি মজলিশে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান, তখন আপনাকে কোনো ঝামেলা পোহাতে তিনি দেখতে চান না। বাবা বলেন, আমার বিভিন্ন হাল (আধ্যাত্মিক অবস্থা) বর্তমান। কোনো হালতে আমি কথা বলি, আবার আরেক হালতে বলি না। কোনো হালতে আমি অন্যান্যদের বিষয়াদি দেখতে ব্যস্ত থাকি, আবার আরেক হালতে আমি নিজেকে গুটিয়ে নির্জনতায় আশ্রয় নেই। আবার অন্য এক হালতে আমি একদম নিবিষ্ট হই এবং এই জগতেরও অতীত হয়ে যাই। আমি চাই না আমীর এমন সময়ে আসেন যখন আমি কোনো বেমানান হালতে থাকি, যখন আমি তাঁকে উপদেশ দেয়ার বা আলাপ করার অবস্থায় না থাকি। অতএব, আমি যখন (এ থেকে) মুক্ত থাকি এবং আমার বন্ধুদের খেদমতে তাদের কিছু ভালাই করতে সমর্থ হই, তখন বের হয়ে তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যাওয়াই শ্রেয়তর হবে'।"

আমীর আরো বলেন: "আমি বাহাউদ্দীনকে জবাবে বলেছি, 'আমি এখানে এ কারণে আসি না যে আমাদের মোর্শেদ আমার প্রতি মনোনিবেশ

করবেন এবং আমার সাথে কথা বলবেন। আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর সেবকদের সঙ্গ লাভের সম্মান অর্জন করা।' উদাহরণস্বরূপ, এই মাত্র আপনি (মওলানা রূমী) আচ্ছন্ন ছিলেন এবং দীর্ঘ সময় অপেক্ষা পর্যন্ত আপনি আমাকে দেখা দেননি। এটি এ কারণে যে এতে আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো আমার দরজায় আগত অন্যদেরকে যখন আমি অপেক্ষায় রাখি এবং তাৎক্ষণিকভাবে দেখা না দেই, তখন তা কতো কঠিন ও বেমানান হতে পারে। আপনি আমাকে ওই তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন এবং আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যাতে ওই রকম আচরণ আর আমি অন্যদের সাথে না করি।"

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: তা সত্য নয়। পক্ষান্তরে, আমার দ্বারা আপনাকে অপেক্ষায় রাখা পরম এক স্নেহময় মহব্বত বটে। যেমনটি খোদাতা'লা বলেন, "ওহে বান্দা, আমি তোমার ক্ষুদ্রতম আরজি ও সামান্যতম অভিযোগ-ও দেরি না করে কবুল করতাম, শুধু এ কারণে (করি) না যে তোমার আবেদনের কণ্ঠস্বর আমার কানে খুবই মধুর শোনায়। আমার জবাব অব্যক্তভাবে বিলম্বিত হয় এ আশায় যে তুমি হয়তো বারবার তোমার আরজি পেশ করবে; কেননা তোমার কণ্ঠস্বর আমার কাছে অত্যন্ত মধুর শোনায়।"

উদাহরণস্বরূপ, কোনো এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির দ্বারে দুজন ভিক্ষুক (প্রতিদিন) আসতো। তাদের একজন পরম পছন্দের ও কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু অপরজন অপছন্দের। বাড়ির মালিক কোনো এক গোলামকে বলেন, "ওই ঘৃণিত জনকে তাড়াতাড়ি এক টুকরো রুটি দিয়ে সত্বর বিদায় করো, যাতে সে চলে যায়।" পছন্দের অপর ভিক্ষুককে গৃহকর্তা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, "রুটি এখনো বানানো হয়নি; ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো যতোক্ষণ না রুটি ভালোভাবে তৈরি হয়।"

আমার বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে আমারই বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ, তাদেরকে চোখ চেয়ে দেখা এবং তাদেরও আমাকে একইভাবে দেখা। কেননা এখানে, এ ধরণীতলে বন্ধুরা যখন পরস্পর পরস্পরকে গভীরভাবে দেখেন, আর এই জানা-শোনার পর যখন তাঁদেরকে পরবর্তী জগতে পুনরুত্থিত করা হবে, তখন তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে একে অপরকে



চিনতে সক্ষম হবেন। এই নশ্বর জগতে তাঁরা যে ঘনিষ্ঠ ছিলেন তা জেনে পরকালে তাঁদের পুনর্মিলিত হওয়ার ঘটনা মহানন্দ বয়ে আনবে।

কেননা অতি দ্রুত আমরা আমাদের বন্ধুদের হারিয়ে ফেলি। আপনি কি দেখেন না এই নশ্বর পৃথিবীতে কিছু মানুষের কাছে আপনি কীভাবে বন্ধু ও প্রিয়ভাজন হয়ে যান, আর তারাও আপনার চোখে খোদ ইউসুফ (আ:)-এর সৌন্দর্যরূপী প্রিয়ভাজন হন? অতঃপর একটিমাত্র লজ্জাজনক কর্মদোষে তারা আপনার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায়, আর আপনি তাদেরকে চিরতরে হারিয়ে বসেন। ওই ইউসুফ (আ:)-রূপী আকৃতি তখন নেকড়ের রূপ পরিগ্রহ করে। যে ব্যক্তিটিকে আপনি ইউসুফ (আ:)-এর মতো দেখতেন, তাকে এখন নেকড়ের মতো মনে হয়। তবু তাদের প্রকৃত আকৃতির পরিবর্তন হয়নি, তারা যেমনটি ছিল ঠিক তেমনই আছে। শুধু ওই একটি আকস্মিক ঘটনায় আপনি তাদের হারিয়ে ফেলেছেন। কালকে যখন এই বর্তমান বৈশিষ্ট্যটি আরেকটি বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তিত হবে, যেহেতু আপনি ওই ব্যক্তিটিকে কখনোই ভালোভাবে চেনেন-জানেননি, আর তার বৈশিষ্ট্যগুলো গভীরভাবে মূল্যায়নও করেননি, এমতাবস্থায় আপনি তাকে কীভাবে চিনবেন?

এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হলো, আমাদের সবারই একে অপরকে খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করতে হবে। প্রত্যেকের মাঝে বিদ্যমান অস্থায়ী ভালো ও মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলোর ঊর্ধ্বে উঠে অন্যের খোদ সত্তাটিকে আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে। আমাদেরকে অসাধারণ স্পষ্টতাসহ দেখতে সক্ষম হতে হবে যে মানুষের দ্বারা একে অপরের মাঝে পর্যবেক্ষণকৃত এসব বৈশিষ্ট্য মোটেও তাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য নয়।

এক লোকের কাহিনি; সে বলেছিল, "আমি অমুক লোককে খুব ভালোভাবে চিনি। আমি তাকে চেনার চিহ্ন-ও বলে দিতে পারি।" তার বন্ধুরা বল্লো, "অনুগ্রহ করে চিহ্নগুলো বলো।" সে জবাব দিলো, "ওই লোক এক সময় আমার খচ্চর-চালক ছিল। তার ছিল দুটি কালো গাভী।" মানুষেরা এভাবেই কথা বলে থাকে; "আমি অমুক-তমুককে বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করি। আমি তাদের চিনি।" তবু চেনার স্পষ্ট চিহ্ন যেটি তারা প্রদান করে, তা ওই দুটো কালো গাভীর মতোই। সেগুলো তো চেনার স্পষ্ট চিহ্ন নয়। সেগুলো কোনো কাজেই আসে না।

অতএব, অন্যদের মাঝে বিদ্যমান ভালো ও মন্দ বৈশিষ্ট্যের ঊর্ধ্বে উঠে আমাদেরকে তাদের সত্তার ভেতরে দেখতে হবে যে তারা আসলে কী। সেটি-ই প্রকৃত দেখা ও জানা।

আমাকে তাজ্জব করে এ ব্যাপারটি, কিছু লোক যে বলে, "সূফী-দরবেশ ও খোদার আশেক-ভক্তবৃন্দ কীভাবে স্থান-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে উঠে অনন্ত জগতের মাঝে প্রেম-মহব্বত খুঁজে পান? তাঁরা কীভাবে শক্তি ও সাহায্য অর্জন করেন? আকার-আকৃতি বা শরীরবিহীন বস্তু দ্বারা কীভাবে তাঁরা প্রভাবিত হন?"

সমস্ত প্রাণের জগৎ, রাত ও দিন কি খোদ এসব জিনিস নিয়ে বিজড়িত নয়? এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ভালোবাসেন এবং তা থেকে সাহায্য লাভ করেন; তাঁরা ভালোবাসা ও অনুগ্রহ, দয়া ও জ্ঞান, সুখ ও দুঃখ পান। এগুলোর সবই ওই আকার-আকৃতিহীন জগতের বস্তু। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তাঁরা এসব বিমূর্ত হতে ফায়দা পেয়ে থাকেন এবং এগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হন। তবে এ বিষয়টিতে সন্দেহ পোষণকারীদের বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না। তারা তাজ্জব হয়ে যায় শুধু এই ব্যাপারটিতে যে ফকির-দরবেশবৃন্দ কীভাবে অদৃশ্য জগতে প্রেম-মহব্বত খুঁজে পান, আর আকার-আকৃতি ছাড়াই সাহায্য লাভ করতে সক্ষম হন।

এক সময় ছিল এক দার্শনিক। সে এই বাস্তবতা (নিরাকারে দরবেশদের প্রেমের বিষয়টি) অস্বীকার করতো। একদিন সে এতোই অসুস্থ হয়ে পড়লো যে বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারছিলো না, আর তার অসুস্থতা দীর্ঘকাল ধরে চলতে লাগলো। এমতাবস্থায় কোনো নির্দিষ্ট এক ধর্মতত্ত্ববিদ তাকে দেখতে গেলেন।

ধর্মতত্ত্ববিদ জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী অন্বেষণ করছো?"

দার্শনিক বল্লো, "স্বাস্থ্য।"

ধর্মতত্ত্ববিদ বল্লেন, "আমাকে বলো স্বাস্থ্যের আকার-আকৃতি কেমন, যাতে আমি তোমার জন্যে তা খুঁজতে পারি।"

দার্শনিক জবাব দিলো, "এর কোনো আকার নেই। এটি বর্ণনাতীত তথা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।"



ধর্মতত্ত্ববিদ জানতে চাইলেন, "এটি যদি বর্ণনাতীত হয়েই থাকে, তাহলে কীভাবে একে খুঁজে পাবে?"

দার্শনিক উত্তর দিলো, "আমি যতোদূর জানি, স্বাস্থ্য যখন আসে, তখন আমি শক্তি ফিরে পাই। আমি হৃষ্টপুষ্ট, সতেজ ও জীবন্ত হয়ে উঠি।"

অতঃপর ধর্মতত্ত্ববিদ বল্লেন, "অসুস্থতা থেকে আমরা স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানতে পারি। বর্ণনাযোগ্য বিষয় থেকে আমরা বর্ণনাতীত বা অবর্ণনীয় বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি। এক্ষণে তুমি তোমার সন্দেহ বাতিক পরিত্যাগ করো, তাহলে আমিও তোমাকে তোমার জীবনের জন্যে অপরিহার্য সত্তায় ফিরিয়ে দেবো।"

যদিও আধ্যাত্মিক সত্য অবোধগম্য ও রহস্যময়, তবুও আকার-আকৃতির মূর্ত প্রকাশ দ্বারা আমরা সবাই এর থেকে ফায়দা পেয়ে থাকি। যেমনটি আপনি দেখতে পান আকাশে আবর্তমান চাঁদ, তারা ও সূর্যের নিয়ে আসা পরিবর্তনগুলো, যা'তে অন্তর্ভুক্ত গ্রীষ্ম ও শীত মওসুমে ঋতু অনুযায়ী মেঘমালা হতে বারি বর্ষণ, আর সময়ের রূপান্তর-ও। আপনি এগুলোর সবই ঘটতে দেখেন এবং জানেন যে এগুলো সঠিক ও জ্ঞান-প্রজ্ঞার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু ওই দূর আকাশে ভাসমান মেঘমালা কীভাবে জানতে পারে বৃষ্টিপাতের নির্ধারিত সময়ে বর্ষণ হওয়া প্রয়োজন? কিংবা এই পৃথিবী কীভাবে জানতে পারে কোনো বীজ বপনের পরে তার দশগুণ ফলন ফিরিয়ে দিতে হবে? নিশ্চয় কেউ একজন এটি করেন। ওই মহান সত্তাকে (খোদাতা'লাকে) এ জগতের মূর্ত প্রকাশ দ্বারা প্রত্যক্ষ করুন, আর পুষ্টি খুঁজে নিন। কোনো ব্যক্তির সত্তার সাথে যোগাযোগের জন্যে যেমন তার শরীরের মধ্যস্থতা গ্রহণ করতে হয়, তেমনি এই জগতের মূর্ত প্রকাশের সাহায্যে ওই মহান সত্তার হাকীকত তথা বাস্তবতাকে স্পর্শ করুন।

মহানবী (দ:) যখন হালত (আধ্যাত্মিক তন্ময়ভাব) এবং আত্মভোলা অবস্থায় উপনীত হতেন, তখন তিনি বলতেন, "আল্লাহতা'লা বলেন।" অথচ মূর্ত প্রকাশের দৃষ্টিকোণ্ থেকে তাঁর পবিত্র জিহ্বা-ই কথা বলছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি তো সেখানে নেই। ওই বক্তা তাঁর চেয়ে মহত্তর কেউ হবেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজেকে ওই (ঐশী) বাণীর প্রবক্তা নন জেনে নিজের ঠোঁট থেকে ওই

জ্ঞানের সুধা প্রকাশ হতে দেখে বুঝতে পারেন তিনি আগে যা ছিলেন তা আর তিনি নেই। কোনো মহত্তর সত্তা তাঁকে (ঐশী) প্রেরণা যোগাচ্ছেন। এমতাবস্থায় তিনি (তাঁর যুগ হতে) হাজার হাজার বছর আগেকার নবী-রাসূল (আ:) ও মনুষ্য জাতি-গোষ্ঠীর কাহিনীসমূহ বর্ণনা করেন, আর এমন কী এ বিশ্বজগতের শেষ সময় পর্যন্ত কী কী ঘটবে, তা-ও তিনি বর্ণনা করেন। তাঁর সত্তার (হায়াতে জিন্দেগী) কয়েক বছরের ব্যাপার। কোনো মরণশীল সত্তা নিশ্চয় এসব বিবরণ দিতে পারেন না। কোনো জমানায় জন্মগ্রহণ করা সৃষ্টি কীভাবে আদি-অন্তহীন সম্পর্কে তথ্য দিতে পারেন? আর তাই এটি জ্ঞাত হয়েছে যে এসব কথা তিনি বলছিলেন না। আল্লাহতা'লা-ই কথা বলছিলেন।

আল্লাহতা'লা সম্পূর্ণভাবে আকার-আকৃতি ও বাণী হতে মুক্ত। তাঁর ভাষণ অক্ষর ও কণ্ঠস্বরের উর্ধ্বে। তথাপি তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী নিজ (ঐশী) বার্তা কোনো অক্ষর ও কণ্ঠস্বরের এবং জিহ্বার মাধ্যমে পৌঁছে দিতে পারেন।

মানুষেরা রাস্তার ধারে ও সরাইয়ের পাশে জলাশয়ের পাড়ে নর-নারী ও পাখির প্রস্তরমূর্তি খোদাই করে রাখে, আর ওইসব মূর্তির মুখ দিয়ে পানি জলাশয়ে পড়তে থাকে। বুদ্ধিসম্পন্ন যে কেউই এটি বুঝতে সক্ষম যে পাখির প্রস্তরমূর্তির মুখ দিয়ে প্রবাহমান ওই পানির উৎস সেখানে নয়, বরং অন্য কোথাও অবস্থিত।

আপনি যদি মানুষকে জানতে চান, তাহলে তাদের সাথে আলাপ করুন। তাদের কথাবার্তা থেকেই আপনি তাদের জানতে সক্ষম হবেন। তারা যদি ভণ্ড ও কপট লোক হয়, এমন কী মানুষকে কথাবার্তায় চেনা যায় মর্মে কেউ তাদেরকে তা জানালেও এবং তারা ধরা পড়ার থেকে বাঁচার জন্যে সতর্কতার সাথে কথাবার্তা বল্লেও, শেষমেশ একদিন আপনি ঠিকই বুঝতে পারবেন তারা কারা।

এর দৃষ্টান্ত হলো এক শিশু ও তার মায়ের কাহিনী। মরুভূমিতে ওই মেয়েটি তার মাকে বল্লো, "অন্ধকার রাতে এক ভয়ঙ্কর দেও/দানব আমার কাছে এসে দেখা দেয়, আর আমি ভীষণ ভয় পাই।"



মা তাকে বল্লেন, "ভয় পেয়ো না। এর পরের বার ওই দানব এলে সাহস নিয়ে তাকে আক্রমণ করো। তখন তুমি স্পষ্ট দেখতে পাবে এ তোমার কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।"

শিশুটি বল্লো, "কিন্তু মা, ওই ভয়ঙ্কর দানবের মাও যদি তাকে একই কথা শিখিয়ে থাকে, তাহলে কী হবে? আমি কী করবো যদি তার মা তাকে শিখিয়ে থাকে এ কথা বলে, 'হার মানবে না, তাহলে শিশুটি তোমাকে প্রকৃত ও শক্তিশালী (দানব) মনে করবে। আর একটি কথাও বলবে না যাতে তুমি ধরা পড়ে না যাও?' এমতাবস্থায় আমি কীভাবে তাকে চিনতে পারবো?"

মা তাকে বল্লেন, "দানবের বিরোধিতা না করে চুপ করে থেকো। আগে হোক বা পরে, তার মুখ থেকে কথা বের হবেই। অথবা তা যদি না-ও হয়, তবু তোমার নিজ অন্তর থেকেই কিছু কথা অজ্ঞাতসারে বের হবে, কিংবা তোমার মস্তিষ্ক থেকে কিছু ভাবনার উদয় বা বুদ্ধি বের হবে, যার দরুন তুমি তার আসল রূপ জেনে যাবে। কেননা, এভাবেই সে তোমার ওপর প্রভাব ফেলেছে। এটি-ই তার প্রকৃত সত্তার ও অনুভূতির প্রতিফলন, যেটি তোমার অন্তরকে গ্রাস করেছে।"

শায়খ সার-রাযী (রহ:) একদিন তাঁর মুরীদানবৃন্দের মাঝে বসেছিলেন। জনৈক মুরীদের রোস্টকৃত ভেড়ার মাথা খাওয়ার খুব ইচ্ছা হলো। শায়খ তাঁর এক খাদেমকে ডেকে বল্লেন, "একে কিছু ভেড়ার মাথার রোস্ট এনে দাও।"

মুরীদানবৃন্দ তাঁদের শায়খকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কীভাবে জানলেন এর ভেড়ার মাথার রোস্ট খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে?"

শায়খ সার-রাযী (রহ:) উত্তর দিলেন, "এ কারণে যে এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা আমাকে পূর্ণ করে রেখেছে গত ত্রিশ বছর যাবত। আমি সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছি এবং এক ঝকঝকে আয়নার মতো স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছি। যখন রোস্টকৃত ভেড়ার মাথার চিন্তা আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করলো, আমার ক্ষুধা বৃদ্ধি করলো, আর একটি আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হলো, আমি বুঝতে পারলাম যে এটি ওই

মুরীদেরই বাসনা। কেননা আয়নার নিজস্ব কোনো ছায়া নেই। এটি যে ছায়া প্রতিফলন করে, তা অন্যের।"

একবার এক লায়েক তথা যোগ্য ব্যক্তি আধ্যাত্মিকভাবে আলোকিত হওয়ার লক্ষ্যে কোনো এক গুহায় (সূফী রীতি অনুযায়ী) চল্লিশ দিনের চিল্লায় (নির্জন-বাসে) নিজেকে আবদ্ধ করেন। তিনি এক কণ্ঠস্বরকে বলতে শোনেন, "এতো উঁচু লক্ষ্য তো চল্লিশ দিনের চিল্লায় কখনোই অর্জিত হবে না। তোমার গুহা ত্যাগ করো যাতে কোনো মহান ওলীর মহব্বত তোমাকে ছুঁতে পারে এবং তোমার লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে।"

ওই ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, "সেই মহান ওলীর দেখা আমি কোথায় পাবো?"

কণ্ঠস্বর জবাব দেয়, "মসজিদে নামাযের জামাতে।"

ওই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, "এতো মানুষের ভিড়ে তিনি কে তা কীভাবে চিনবো?"

কণ্ঠস্বর জবাব দেয়, "যাও, তিনি-ই তোমাকে চিনবেন এবং তোমার প্রতি সুদৃষ্টি (নেক নজর) করবেন। তোমার প্রতি তাঁর মহব্বতের প্রমাণ তখন-ই মিলবে, যখন তোমার হাত থেকে পানির পাত্র (কলস) পড়ে যাবে এবং তুমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। তখন-ই তুমি বুঝবে যে তাঁর নেক নজর তোমার কাছে পৌঁছেছে।"

ওই ব্যক্তি তাই করলেন। তিনি একখানি কলস পানি দ্বারা পূর্ণ করে পানি বণ্টনকারীর মতো মসজিদে মুসুল্লীদের মাঝে বিতরণ করতে লাগলেন। নামাযীদের বিভিন্ন সারির মাঝে তিনি যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, এমনি সময় হঠাৎ তাঁকে আত্মিক উচ্ছ্বাস গ্রাস করলো। তিনি এক চিৎকার দিলেন এবং তাঁর হাত থেকে পানির কলস পড়ে গেল। মসজিদের এক কোণায় তিনি অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রইলেন। সবাই মসজিদ ত্যাগ করার পর তাঁর জ্ঞান ফিরলে তিনি নিজেকে একা দেখতে পেলেন। যে আধ্যাত্মিক বাদশাহ তাঁর প্রতি নেক নজর করেছিলেন, তাঁকে তিনি দেখতে পেলেন না বটে, কিন্তু তিনি তাঁর লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হলেন।



খোদাতা'লার এমন নির্দিষ্ট কিছু আশেক-ভক্ত আছেন, যাঁরা নিজেদের মহা রাজকীয়তার কারণে এবং খোদার প্রতি অনন্যচিত্ত আনুগত্য ও সর্বাত্মক উপাসনা ও সেবার অভিকাঙ্ক্ষী হওয়ার দরুন নিজেদেরকে প্রকাশ্যে প্রদর্শন করেন না; তবে তাঁরা শিষ্যদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের কারণ হন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত-ও করেন। এ ধরনের শক্তিশালী আধ্যাত্মিক ওলী-দরবেশ বিরল ও মহামর্যাদাবান।

কেউ একজন বল্লেন: "এসব মহান ওলী-দরবেশ কি আপনার সামনেও আসেন?"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দিলেন: আমার কাছে আর 'সামনে' বলতে কিছু নেই। দীর্ঘকাল কেটে গিয়েছে আমার 'সামনে' এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছে। তাঁরা যদি আসেন, তবে তাঁরা আসেন এমন এক প্রতিচ্ছবির সামনে যাকে তাঁরা আমি বলে মনে করেন। কিছু মানুষ ঈসা (আ:)-কে বলে, "আমরা আপনার বাড়ি আসবো।" তিনি জবাব দেন, "এ জগতে আমার বাড়ি কোথায়, আর আমারই বা কীভাবে বাড়ি থাকতে পারে?"

বর্ণিত আছে যে হযরত ঈসা (আ:) মরুভূমিতে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, এমনি সময় প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়। তিনি গুহার কোণায় একটি শেয়ালের আস্তানায় আশ্রয় নেন, যতোক্ষণ না বৃষ্টি থেমে যায়। অতঃপর তাঁর কাছে এক ওহী আসে এ কথা বলে, "শেয়ালের ডেরা থেকে বের হও, কেননা তোমার কারণে শেয়ালের ছানাগুলো বিশ্রাম নিতে পারছে না।" হযরত ঈসা (আ:) উচ্চস্বরে বলেন, "হে প্রভু, শেয়াল ছানাদের একখানি আশ্রয় আছে, কিন্তু মরিয়ম-তনয়ের বাড়ি বলে কোনো জায়গা-ই নেই।"

যদিও শেয়াল-ছানার বসবাসের জন্যে একটি গুহা আছে, তবু তার কোনো মাহবুব তথা প্রেমাস্পদ নেই তাকে ঘর-ছাড়া করার জন্যে। কিন্তু আপনাদের ওই রকম এক মাহবুব (খোদাতা'লা) আছেন, যিনি আপনাদের ঘর-ছাড়া করেন। আপনাদের যদি ঘর না থাকে তাতে কী আসে যায়? ওই পরিচালনাকারীর মহব্বতপূর্ণ দয়া-অনুগ্রহ এবং এ ধরনের সম্মানের ভূষণ হতে নিঃসৃত ঐশী করুণা, পরিচালনার জন্যে যেটি আপনাদেরকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পৃথক করেছে, তার মূল্য অনেক অনেক

বেশি - যা ইহ ও পরলোকে এক লক্ষ আসমান ও বিশ্বজগতকেও ছাড়িয়ে যায়।

আমীর (রাজ্য শাসক) দরবারি মজলিশ ছেড়ে চলে যাবার পর মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: আমীরের এখানে আসা এবং সাথে সাথে তাঁকে আমার মুখ না দেখানো তাঁর জন্যে চিন্তার কারণ হওয়া উচিত নয়। তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য ছিল হয় আমাকে সম্মান প্রদর্শন, নয়তো নিজেকে তা দেখানো। আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয়ে থাকলে তিনি যতো বেশিক্ষণ এখানে বসেছেন এবং অপেক্ষা করেছেন, ততোই সম্মান অর্জন করেছেন। পক্ষান্তরে, যদি তাঁর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে নিজেকে সম্মানিত করা এবং কোনো পুরস্কারপ্রাপ্তির অন্বেষণ করা, তাহলে যেহেতু তিনি এখানে অপেক্ষা করেছেন এবং অপেক্ষার কষ্ট ভোগ করেছেন, সেহেতু তাঁর পুরস্কার আরো বেশি হবে। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য বহুগুণ মাত্রায় পূরণ হয়েছে। তাই তাঁর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এবং নিজেকে সৌভাগ্যবানও মনে করা উচিত।

## উপদেশ বাণী - ১১

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: "অন্তরগুলো একে অপরের সাক্ষ্য বহন করে" - এই প্রবাদটি একটি গোপন বাস্তবতাকে নির্দেশ করে। যদি সমস্ত বাস্তবতাকেই খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করা হতো, তাহলে কথার কী প্রয়োজন থাকতো? অনুরূপভাবে, অন্তর যখন সাক্ষ্য বহন করে, তখন জিহ্বার সাক্ষ্যের কী-ই বা প্রয়োজন?

আমীর (কোনিয়া রাজ্যের শাসক) বলেন: "নিশ্চয় অন্তর সাক্ষ্য বহন করে থাকে। কিন্তু অন্তর আপনাআপনি একাংশ বহন করে, আরেক অংশ বহন করে কান, আরেক অংশ চোখ, আরেক অংশ জিহ্বা। প্রত্যেকটিরই দরকার আছে, যাতে গোটাটুকু বাস্তবায়িত হয়।"

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: অন্তর যদি (পুরো মাত্রায়) নিবিষ্ট হয়, তাহলে অন্যান্য সব ইন্দ্রিয় তাতে থাকে নিশ্চিহ্ন; আর ওই অবস্থায় জিহ্বার কোনো প্রয়োজন থাকে না। লায়লা'র বিষয়টি-ই ধরা যাক: তিনি কোনো আত্মাগত সত্তা ছিলেন না, বরং ছিলেন রক্ত-মাংসে গড়া, মাটি ও



পানির তৈরি মানুষ। অথচ তাঁর প্রতি মজনুনের প্রেমাবেগ তাঁর (মজনূনের) মধ্যে সর্বগ্রাসী এমনই নিবিষ্টতা সৃষ্টি করেছিল যে তাঁর লায়লাকে নিজ চোখে দেখার, তাঁর কণ্ঠস্বর শোনার কোনো প্রয়োজন পড়েনি। তিনি তাঁর প্রেমাস্পদের চিন্তা থেকে নিজেকে পৃথক করতে পারেননি, যার দরুন তিনি আর্তনাদ ব্যক্ত করেন:

মোর জিহ্বায় তব নাম স্থাপিত
তব ছায়া মোর দৃষ্টিতে কাঙ্ক্ষিত
মোর হৃদয়ে তব স্মৃতি রয় গচ্ছিত
মোর লেখা এ বাণী কোথায় করি প্রেরিত।।

শারীরিক বিষয়ের এমনই ক্ষমতা যে প্রেমাবেগ আমাদেরকে সে হালতে পৌঁছে দিতে সক্ষম, যেখানে আমরা আমাদের প্রেমাস্পদ হতে আর বিচ্ছিন্ন থাকি না। আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই এমতাবস্থায় নিবিষ্ট হয়: দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ইত্যাকার সবই। কোনো অনুভূতি-ই আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি তালাশ করে না, বরং সবই থাকে একতাবদ্ধ। যদি প্রত্যেকটি অনুভূতি আপন আপন অংশ পূরণ করতে সমর্থ হয়, তাহলে সবগুলো একই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং অন্য কিছু কামনা করে না। আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি তালাশ করাটা কোনো একটি অনুভূতির প্রকৃত ও পূর্ণ মঞ্জুরিপ্রাপ্ত না হওয়ার প্রমাণবহ। সেটি অপূর্ণ একটি অংশের ধারক এবং তাই (অভিজ্ঞতার সাগরে অবগাহন উদ্দেশ্যে) পরিপূর্ণ নিমজ্জিত হয়নি, পূর্ণতাপ্রাপ্ত-ও হয়নি। এমতাবস্থায় অন্যান্য অনুভূতিগুলোও আপন আপন অংশ তালাশ আরম্ভ করে, আর সবগুলোই বিভক্ত হয়ে পড়ে।

বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে সবগুলো অনুভূতিরই একটি বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু বাহ্যিক আকৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে সেসব অনুভূতি একে অপরের থেকে আলাদা। যখন একটি অনুভূতি নিবিষ্টতা লাভ করে, তখন সব অনুভূতি-ই তাতে নিবিষ্ট হয়। কোনো মাছি ওপরের দিকে উড়া আরম্ভ করলে সেটি নিজ পাখা, মুণ্ডু ও গোটা শরীর আলাদা আলাদাভাবে নাড়তে থাকে; কিন্তু যখন সেটি মধুতে ডুব দেয়, তখন তার সমস্ত শারীরিক অংশ এক হয়ে যায় - কোনো অংশই নড়াচড়া করতে পারে না।

নিবিষ্টতা এমন এক ভাব যা'তে কেউ প্রবেশ করলে আপন অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। তারা কোনো চেষ্টা করে না (তা হতে বেরোবার); তারা চলৎশক্তি

হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় তারা জলে নিমজ্জিত হয়। কোনো কর্ম-ই আর তাদের কর্ম নয়; সকল কর্ম-ই জলের। কিন্তু যদি তারা জলে নিজেদের হাত ও পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে, তাহলে নিশ্চয় তারা তাতে পূর্ণ নিমজ্জিত হয়নি। "আমি ডুবে যাচ্ছি" বলে তারা চিৎকার করলে তাও নিবিষ্টতা হিসেবে সাব্যস্ত হবে না।

"আনাল হক্ক" (আমি খোদা) শীর্ষক প্রখ্যাত বাণীটির কথাই ধরা যাক। কিছু মানুষ এটিকে মহা এক দাম্ভিকতা মনে করে থাকে, কিন্তু "আমি খোদা" প্রকৃতপক্ষে এক মহা বিনয়। এর পরিবর্তে যারা বলে "আমি খোদার একজন বান্দা", তারা আসলে বিশ্বাস করে যে দুটি সত্তা অস্তিত্বশীল, তারা নিজেরা এবং খোদাতা'লা। কিন্তু যাঁরা বলেন "আনাল হক্ক", তাঁরা (খোদার মাঝে) বিলীন হয়ে গিয়েছেন এবং নিজেদের অস্তিত্বের লয় সাধন করেছেন। তাঁরা যখন বলেন, "আমি খোদা", তখন তার মানে দাঁড়ায়, "আমি নই, খোদাতা'লাই সব কিছু। তিনি ছাড়া কোনো অস্তিত্ব নেই। আমি (তাঁর থেকে) সব রকমের বিচ্ছেদমুক্ত। আমার কোনো অস্তিত্ব-ই নেই।" এতে (এ কথায়) বিনয় আরো বড়।

এটি এমন এক বিষয় যা সাধারণ মানুষ বোঝে না। তারা যখন খোদাতা'লার মহিমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে খেদমত আঞ্জাম দেয়, তখনো তাদের গোলামি অস্তিত্বশীল থাকে। যদিও তা খোদাতা'লার ওয়াস্তে বা খাতিরে হয়, তবুও তারা খোদাতা'লার পাশাপাশি নিজেদেরকে এবং নিজেদের কর্মগুলোকে দেখে থাকে। ওই (পুণ্যাত্মা) ব্যক্তিবৃন্দ-ই (প্রকৃত) নিমজ্জিত যখন কোনো নড়াচড়া বা কর্ম তাঁদের আয়ত্তাধীন থাকে না; তাঁদের সমস্ত গতিময়তাই জলের সঞ্চালন থেকে উদ্ভূত।

একটি সিংহ হরিণকে তাড়া করছে, আর হরিণটি পালাচ্ছে। এখানে দুটি সত্তা দৃশ্যমান: সিংহ ও হরিণ। কিন্তু যখন সিংহ হরিণকে ধরে ফেল্লো, আর তার থাবার আওতায় হরিণ চলে এলো এবং ভয়ে সেটি জ্ঞানও হারালো, তখন সিংহের সামনে সেটি বিলুপ্ত হয়ে শুধু সিংহ-ই বিরাজমান রইলো। হরিণ নিশ্চিহ্ন হলো এবং সেটি আর অস্তিত্বশীল রইলো না।

প্রকৃত নিবিষ্টতা হচ্ছে তখন-ই, যখন খোদাতা'লা সূফী-দরবেশদের মধ্যে পয়দা করেন এক শঙ্কা। এই শঙ্কা সাধারণ নারী-পুরুষের অন্তরে অবস্থিত ভীতি নয়, যারা সিংহ, বাঘ ও মৃত্যুর ভয়ে থাকে তটস্থ। বরঞ্চ এই শঙ্কা



বিচ্ছেদের। এটি খোদাতা'লার তরফ থেকে একটি উপহার, ঠিক যেমনটি হচ্ছে নিরাপত্তা, আনন্দ-ফুর্তি, পানাহার ও নিদ্রা যাপন খোদাতা'লারই উপহার।

আল্লাহতা'লা ফকির-দরবেশবৃন্দকে তাঁদের পূর্ণ সচেতন অবস্থায় বিভিন্ন আকার-আকৃতি প্রদর্শন করেন; এগুলো শুধু তাঁরাই দেখতে পান। সিংহ, বাঘ ও আগুনের অভ্যন্তরীণ আকৃতি (তাঁদের সামনে) দৃশ্যমান হয়, যার দরুন তাঁরা জানতে পারেন যে বাস্তবতা এ জগতের নয়, বরং এক অদৃশ্য জগতের, যেটি তাঁদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে তাঁদের আপন আপন সত্তাকেও অপূর্ব আকৃতিতে তাঁদের কাছে প্রদর্শন করা হয়। অনুরূপভাবে, বাগান ও নহর, বেহেশ্‌তী হুর (নারী) ও প্রাসাদ, সকল ধরনের পানাহারের দ্রব্য, সম্মানের ভূষণ, তেজী ও ক্ষিপ্র ঘোড়া, নগর, দুর্গ এবং প্রত্যেক ধরনের চমকপ্রদ বস্তু-ই যে এ জগতের নয়, তা-ও তাঁরা জানেন। খোদাতা'লা এসব গোপন বিষয় তাঁদের চোখের সামনে দেখান ও প্রকাশ করে থাকেন। ফলে তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন যে এই বিচ্ছেদের শঙ্কা খোদাতা'লা হতে আগত, যেমনিভাবে নিরাপত্তা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রকাশিত সমস্ত আত্মিক অনুভূতি তাঁরই কাছ থেকে আগত।

তবে বিচ্ছেদের এই শঙ্কা অধিকাংশ নারী-পুরুষের জ্ঞাত ভয়-ভীতির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয়, কেননা এটি (খোদায়ী) প্রকাশ ও (এতদসংক্রান্ত) অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত। আল্লাহ পাক স্পষ্টভাবে সূফী-দরবেশকে প্রদর্শন করেন যে সকল বস্তু তাঁরই মালিকানাধীন। দার্শনিকরাও এটি জানতে পারেন, তবে তারা জানতে পারেন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের সাহায্যে, আর এই প্রমাণটি চিরস্থায়ী নয়। প্রমাণ হতে প্রাপ্ত সুখ ও তুষ্টি টেকে না। প্রমাণের স্মৃতি বিস্মৃত হওয়ামাত্রই এর উষ্ণতা ও রোমাঞ্চ-ও মিলিয়ে যায়।

অতএব, প্রমাণ দ্বারা আমরা জানি, এই ঘরের একজন 'নির্মাতা' বিরাজমান। এ-ও প্রমাণের ভিত্তিতে জানি, তাঁর চোখ আছে এবং তিনি অন্ধ নন; তিনি ক্ষমতাবান এবং ক্ষমতাহীন নন; তিনি জীবিত এবং মৃত নন; আর তিনি ঘরটি নির্মিত হওয়ার আগেও বিরাজমান ছিলেন। এসব তথ্য আমরা জানি, কিন্তু এগুলো প্রমাণের সাহায্যেই আমরা জানি। এ ধরনের প্রমাণ চিরস্থায়ী নয়, আর তাই এটি সত্বর বিস্মৃত হয়। খোদার

আশেক-ভক্তবৃন্দ কিন্তু তাঁর মাঝে নিবিষ্ট হয়ে 'নির্মাতা' (খোদা)-কে জেনেছেন এবং জানার (আ'রেফের) হালত (আধ্যাত্মিক অবস্থা) বা গুণসমৃদ্ধ দৃষ্টিক্ষমতা দ্বারা (তাঁকে) দেখেছেন। তাঁরা রুটি ও লবণ একই সাথে খেয়েছেন, আর দুটোকেই সংমিশ্রিত করেছেন। ওই 'নির্মাতা' (খোদাতা'লা) কখনোই তাঁদের অন্তর ও দৃষ্টি হতে অনুপস্থিত নন। এ ধরনের (পুণ্যাত্মা) নারী ও পুরুষ খোদার মাঝে বিলীন হয়ে যান। তাঁদের নিবিষ্টতার কারণে তাঁদের বেলায় পাপ পাপ নয়, অপরাধ অপরাধ নয়।

কোনো নির্দিষ্ট এক রাজা তাঁর সকল গোলামকে সোনার পানপাত্র হাতে এক মেহমানের প্রতি সম্ভাষণ জানাতে আদেশ দেন। তাঁর প্রিয়ভাজন গোলামকেও ওই একই আদেশ দেয়া হয়। রাজা যখন তাঁর চেহারা প্রকাশ করেন, তখন ওই বিশেষ গোলাম তাঁকে দেখে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন এবং আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় তাঁর হাত থেকে পাত্রটি পড়ে ভেঙ্গে যায়। অন্যান্য গোলামবর্গ এ ঘটনা দেখে বলে, "আমাদেরও মনে হয় এরকম করা উচিত।" অতঃপর তারা সবাই নিজেদের হাতের পাত্র ইচ্ছাকৃতভাবে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে।

রাজা তাদের তিরস্কার করে বলেন, "তোমরা কেন এরকম করেছো?"

তারা উত্তর দেয়, "তিনি আপনার প্রিয়ভাজন, আর তিনি তো তা-ই করেছেন।"

রাজা গর্জে উঠে বলেন, "আহাম্মকের দল! সে তো তা করেনি, বরং আমি-ই তা করেছিলাম।"

বাহ্যিক দৃষ্টিতে সকল গোলাম-ই দোষী। কিন্তু (প্রিয়ভাজন গোলামের) ওই একটি কাজ-ই আনুগত্যের চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করেছে। সত্য বটে, সেটি আনুগত্য এবং দোষ বা পাপেরও ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছে। তাদের সবার মাঝে ওই গোলাম-ই প্রকৃত আশেক-ভক্ত। বাদ বাকি সবাই স্রেফ রাজার অনুসারী মাত্র। তাই তারা ওই গোলামকে অনুসরণ করেছে, কেননা তিনি (প্রতিভূ হিসেবে) রাজার সত্তা-ই হয়ে গিয়েছেন; কেবল বাহ্যিক দৃষ্টিতে গোলামের আকৃতি। তিনি রাজার সৌন্দর্য দ্বারা কানায় কানায় পূর্ণ (কামেল ওয়াল মোকাম্মেল)।



আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন, "(হে রাসূল), আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি আসমানসমূহ সৃষ্টি করতাম না।" এটি "আনাল হক্ক" বা "আমি খোদা" বাক্যটির মতোই। এর মানে "আমি আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছি, কেননা আমি আপনাকে ভালোবাসি আমার মতোই।" এটি আরেকটি ভাষায়, আরেকটি বচনে "আনাল হক্ক" বলা।

মহান সূফী-দরবেশদের কথা একশটি ভিন্ন ভিন্ন আকার-আকৃতিতে প্রকাশিত হলেও যেহেতু আল্লাহ এক এবং রাহা (পথ)-ও একটি-ই, সেহেতু তাঁদের মর্মবাণী কীভাবে ভিন্ন হতে পারে? তাঁদের (তরীকতী) শিক্ষাগুলো পরস্পরবিরোধী বলে দৃশ্যমান হলেও সেগুলোর মানে'-মতলব (অন্তর্নিহিত গূঢ়তত্ত্ব) একই। পার্থক্য শুধু সেগুলোর বাহ্যিক আকৃতিতেই বিরাজমান; অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সবগুলোর একই।

কোনো যুবরাজ তাঁবু সেলাইয়ের আদেশ করলেন। একজন কারিগর রশি পেঁচালেন, আরেকজন পেরেক গাঁথলেন, আরেকজন কাপড় বুনলেন, আরেকজন সেলাই করলেন, আরেকজন (কাপড়) ফাড়লেন, আরেকজন সুঁই ব্যবহার করলেন। বাহ্যতঃ তাঁরা বিভিন্ন রূপের ও বৈচিত্র্যময় হলেও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যে সবাই একতাবদ্ধ; আর তাঁরা একটি কাজ-ই করে চলেছিলেন।

এই দুনিয়ার বিষয়াদির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। আপনি যদি সেটির দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখবেন সবাই খোদাতা'লার খেদমতে ব্যস্ত; দুর্নীতিপরায়ণ ও ন্যায়পরায়ণ, পাপী ও (সত্যান্বেষী) মুরীদ, শয়তান ও ফেরেশতা সবাই। উদাহরণস্বরূপ, রাজাধিরাজ তাঁর গোলামবর্গের পরীক্ষা নিতে চান যাতে অটল, অবিচল গোলামদেরকে দুর্বল চিত্তসম্পন্নদের থেকে, অনুগতদেরকে বিশ্বাসঘাতকদের থেকে, বিশ্বস্তদেরকে ভুয়া-ভণ্ডদের থেকে পৃথক করা যায়। তাঁর (এ উদ্দেশ্যের) পক্ষে যদি প্রলোভন প্রদর্শনকারী ও উস্কানিদাতা কাজ না করতো, তাহলে তিনি কীভাবে তাঁর গোলামদের আনুগত্যের পরীক্ষা নিতেন? অতএব, প্রলোভন প্রদর্শনকারী ও উস্কানিদাতারাও মহারাজের খেদমতরত। কেননা, তাঁর ইচ্ছাতেই তারা তাদের কাজে লিপ্ত। তিনি এক (প্রবল) হাওয়া প্রেরণ করেন (আকীদা-বিশ্বাসে) সুস্থিত জন ও নড়বড়ে জনের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরার জন্যে, চড়ুই-বাজপাখি হতে ডাঁশ-মশাকে

আলাদা করার জন্যে, যাতে ডাঁশ-মশা মিলিয়ে যায়, আর চড়ুই-বাজপাখি অবশিষ্ট (বাকাবিল্লাহ) থেকে যায়।

কোনো এক রাজা তাঁর বাঁদিকে আদেশ দিলেন তাঁরই গোলামদের কাছে নিজেকে নিবেদনের জন্যে সুন্দরভাবে সাজগোজ করতে। এ পরীক্ষায় গোলামবর্গের বিশ্বস্ততা প্রকাশ পাবে। যদিও বাহ্যতঃ মেয়েটির আচরণ পাপপূর্ণ দেখা যায়, তবুও বাস্তবে সে রাজার পক্ষেই কাজ করে চলেছে।

মহান সূফী-দরবেশবৃন্দ স্বয়ং দেখেছেন, কোনো প্রমাণ বা মুখস্থ কিছু থেকে নয়, বরং সামনাসামনি ও পর্দাবিহীনভাবে এই মর্মে যে নেককার হোক বা বদকার, সকল মানব-ই খোদাতা'লার অনুগত গোলাম। এমন কিছুই অস্তিত্বশীল নেই যেটি মহান প্রভুর প্রশংসাস্তুতি বর্ণনা করে না। অতএব, সূফী-দরবেশদের কাছে এই দুনিয়া-ই হলো পুনরুত্থান; কেননা পুনরুত্থান মানে সবাই খোদাতা'লার খেদমতে রত হওয়া এবং খোদাতা'লার কাজ ছাড়া আর অন্য কোনো কাজ না করা। এই সকল দরবেশ এখানে, এ ধরণীতলেই এ সত্যটি প্রত্যক্ষ করেন। কেননা এমন কী (ভেদের) পর্দা ওঠানো হলেও তাঁদের এয়াকীন (নিশ্চিত বিশ্বাস) মোটেও বাড়বে না।

সবাই হয়তো খোদার গোলাম হতে পারে, কিন্তু কেউ কেউ তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্তিতে অন্যদের চেয়ে উচ্চ মকামের অধিকারী। যাঁরা নিবিষ্ট, তাঁদের কাছে সব পার্থক্যই বিলীন। যারা এখনো এসে (মকামে) পৌঁছেননি, তাদের কাছে এক পর্যায় হতে অপরটির মাঝে অনেকগুলো ধাপ দৃশ্যমান হয়।

চলুন, একটি উপমা দেয়া যাক। বাগানের কোনো এক মালী একটি গাছের চারা রোপণ করলো। সেটি ফল দিলো। নিশ্চয় ফলবতী এই বৃক্ষটি ফলবিহীন একশটি বৃক্ষ হতে উত্তম। অন্যান্য বৃক্ষগুলো হয়তো কখনোই ফলবতী না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কেননা এই বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় এমন অনেক ধাপ আছে যেখানে রোগ-ব্যাধির সংক্রমণ হতে পারে। কা'বা শরীফে পৌঁছেছেন এমন হাজ্বী মরুভূমিতে ভ্রমণকারী হাজ্বীর চেয়ে শ্রেয়তর। মরুভূমিতে সফরকারী হাজ্বীবৃন্দ বিভিন্ন চিহ্নিত স্থান পেরিয়ে কা'বা শরীফে পৌঁছুতে না পারার ব্যাপারে থাকেন শঙ্কিত।



অপরদিকে, প্রথমোক্ত হাজ্বী সাহেবান ইতোমধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছেন। একটি নিশ্চিত বিশ্বাস একশটি সন্দেহের চেয়ে শ্রেয়তর।

আমীর (শাসক) বল্লেন: "যারা এখানে (বেলায়াতের মাকামে) পৌঁছুতে পারেননি, তাদের এখনো আশা আছে (মকামে পৌঁছুনোর)।"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দিলেন: (মকামে) উপনীত জনের সাথে আশাবাদী ব্যক্তির তুলনা হতে পারে কি? শঙ্কা ও অর্জনের মাঝে রয়েছে বিশাল এক পার্থক্য। আমি এই ভিন্নতা সম্পর্কে কেন আলোচনা করবো, যেখানে সবার কাছেই এ বিষয়টি স্পষ্ট। আমি অর্জন সম্পর্কেই আলাপ করছি; কেননা অর্জনের মাকাম তথা পর্যায়গুলোর মধ্যে অনেক পার্থক্য বিরাজমান।

আশঙ্কার বিভিন্ন স্তর ও মাকামগুলো ইঙ্গিত করা সম্ভব, কিন্তু অর্জনের মাকামগুলোর কোনো চিহ্ন নেই। আশঙ্কার জগতে খোদাতা'লার সম্মানার্থে প্রত্যেকে কী কী উৎসর্গ করবেন সে ব্যাপারে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কেউ শারীরিক খেদমত আঞ্জাম দেন, কেউ বা দান করেন অর্থ-সম্পদ, আবার কেউ করেন জীবন দান। কেউ আরাধনা করেন রোযা রেখে, কেউ পড়েন নামায-দোয়া, কেউ দেন দশটি সেজদা, কেউ বা একশটি। এসব স্তর একদম ভিন্ন এবং এগুলোকে সহজেই আলাদাভাবে চেনা যায়। একই উপায়ে কোনিয়া থেকে কায়সারিয়া ভ্রমণে স্পষ্টভাবে চেনা যায় ও প্রসিদ্ধ কতোগুলো পর্যায় রয়েছে: এই সফরে কাউকে কায়মায, উপরোখ, সুলতান এবং এ জাতীয় স্থান অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু সমুদ্রপথে আনাতোলিয়া হতে আলেকজান্দ্রিয়া যাওয়ার পর্যায়গুলোতে কোনো স্থানের চিহ্ন নেই। জাহাজের কাপ্তান চিহ্নগুলো জানেন, কিন্তু সেগুলো স্থলপথ প্রদর্শকদের জানানো হয় না; কেননা তারা এগুলো বুঝবে না।

আমীর (শাসক) বল্লেন: "কিন্তু এ সম্পর্কে আলোচনাও কিছু ফায়দা এনে দেয়। আমরা হয়তো সব কিছু জানি না, তবু আমরা কিছু তো শিখি এবং বাকিটুকু আন্দাজ করে জানতে পারি।"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দিলেন: হ্যাঁ নিশ্চয়, আল্লাহর কসম! কেউ একজন অন্ধকার রাতে জেগে বসে আছে, আর এই চিন্তা করছে কীভাবে

দিনের দেখা পাওয়া যাবে। যদিও তারা জানে না কীভাবে সেখানে পৌঁছুবে, তথাপি দিনের অপেক্ষায় থাকা অবস্থায় দিনের আগমন হয়। অপর এক ব্যক্তি কাফেলায় অন্ধকার রাতে ঝড়বৃষ্টির মধ্য দিয়ে চলেছে। তারা জানে না কোথায় গিয়ে তারা পৌঁছেছে, কোন্ পথ অতিক্রম করছে বা কতোটুকু দূরত্ব তারা পেরিয়েছে, কিন্তু দিনের আলো ফুটলে তারা ওই ভ্রমণের ফলাফল দেখতে পায় এবং সেখান থেকে এগোয়। যে কেউ আল্লাহতা'লার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও প্রশংসাস্তুতিতে সাধনা করলে, যদিও তাদের অন্তর্চক্ষু দৃষ্টিসম্পন্ন না হয়, তবুও তাদের সাধনা বৃথা যায় না। এমন কী একটি অণুকণার ওজনসম্পন্ন ভালাই-ও বৃথা যায় না। যদিও অভ্যন্তরের সবই অন্ধকার ও পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত, আর তারা দেখতে পায় না কতোদূর তারা অগ্রসর হয়েছে, তথাপিও অবশেষে তারা জানতে পারে। "এই দুনিয়া হচ্ছে পরবর্তী জগতের শষ্যক্ষেত্র।" তারা এখানে যা রোপণ করে, পরবর্তী জগতে সে ফসল তারা কাটবে।

হযরত ঈসা (আ:) অনেক হাসতেন, আর হযরত ইয়াহইয়া (আ:) অনেক কাঁদতেন। হযরত ইয়াহইয়া (আ:) হযরত ঈসা (আ:)-কে বলেন, "আপনি সকল সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচপূর্ণ ধোকার ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন হয়ে গিয়েছেন, যার দরুন এতো হাসছেন।" হযরত ঈসা (আ:) উত্তর দেন, "আর আপনি খোদাতা'লার সূক্ষ্ম, রহস্যময়, বিস্ময়কর দান ও প্রেমময় অনুকম্পা সম্পর্কে একেবারেই বে-খেয়াল হয়ে গিয়েছেন, যার দরুন এতো কাঁদছেন।" ওই সময় সেখানে একজন আল্লাহর ওলী উপস্থিত ছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে আরয করেন, "এঁদের দুজনের মধ্যে কে বেশি উচ্চ মাকামের?" আল্লাহতা'লা উত্তর দেন, "তাঁরই, যিনি আমার সম্পর্কে উচ্চ ধারণা রাখেন।" আরেক কথায়, "আমি (খোদা) আসি যখন তুমি আমার সম্পর্কে চিন্তা করো। প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই আমার একখানা প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান এবং আমার সম্পর্কে একটি ধারণাও তাতে অস্তিত্বশীল। সে আমার সম্পর্কে যে (ধারণার) চিত্র আঁকে, আমি তা-ই। আমি সে চিত্র পূরণ করি, যেখানে (আমি) খোদা বসত করি। খোদাতা'লার অস্তিত্ব নেই যে দৃষ্টিভঙ্গিতে, তাকে আমি মোটেও গণনা করি না। ওহে মানব, তোমাদের চিন্তাভাবনাকে পরিশুদ্ধ করো, কেননা ওই চিন্তাভাবনাতেই রয়েছে আমার বসতি ও আবাসস্থল।"



এক্ষণে কান্না-হাসি, নামায-রোযা, নিঃসঙ্গতা ও মানুষের সঙ্গ এবং বাকি সব কিছুর ব্যাপারে আপনার নিজের পরীক্ষা নিন। এগুলোর কোনটি আপনার জন্যে বেশি লাভজনক? যেটি-ই আপনাকে সহজ-সরল রাস্তায় নিয়ে আসে এবং সেরা অর্জন এনে দেয়, সেটি বেছে নিন। আপনার অন্তরের (বিবেকের) পরামর্শ গ্রহণ করুন, যদিও বা অন্যরা তাতে দ্বিমত পোষণ করেন। সত্য আপনার মাঝেই বিরাজমান। অন্যরা যা বলেন তার সাথে সেটিকে তুলনা করুন। ঐকমত্য হলে তবেই ওই রাস্তা (পদক্ষেপ) নিন।

চিকিৎসক অসুস্থ কাউকে দেখতে এলে (তার) অভ্যন্তরে বিরাজমান ডাক্তারকে প্রশ্ন করে থাকেন; কেননা আপনার অভ্যন্তরে রয়েছে একজন ডাক্তার, যেটি আপনারই স্বাভাবিক প্রকৃতি, সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতা। এমতাবস্থায় বাইরে অবস্থিত ডাক্তার তাকে প্রশ্ন করেন: "আপনি যে খাবার গ্রহণ করেছিলেন, তা কেমন ছিল? সেটি কি হাল্কা ছিল, না ভারী? আপনার ঘুম কেমন হয়েছিল?" অভ্যন্তরে অবস্থিত ডাক্তার যে উত্তর প্রদান করে, তার ওপর ভিত্তি করেই বাইরের ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র দেন। অতএব, বিষয়টির মূল হচ্ছে অভ্যন্তরে অবস্থানকারী ডাক্তার; রোগীর নিজস্ব সাড়া দেয়ার সামর্থ্য। এই ভেতরের ডাক্তার দুর্বল হলে এবং তার স্বাভাবিক প্রকৃতি ত্রুটিযুক্ত থাকলে অসুস্থ ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুকে ভুল দেখেন এবং বাঁকাভাবে বোঝেন। তারা বলেন, চিনি তেতো, সিরকা মিষ্ট স্বাদের। এমতাবস্থায় তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্যে বাইরের চিকিৎসকের প্রয়োজন পড়ে, যতোক্ষণ না তাদের নিজস্ব সহজাত প্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি ফিরে আসে। এরপর তাদের চাহিদা মোতাবেক তারা কেবল তাদের ভেতরের ডাক্তারের পরামর্শ-ই গ্রহণ করে।

আমাদের আত্মিক সত্তার অভ্যন্তরেও অনুরূপ এক ডাক্তার বিরাজ করে। এই উন্নত সত্তা যদি দুর্বল হয়, আমাদের অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়গুলো ভুল উপলব্ধি করে; আর আমরা যা-ই কিছু অনুসরণ করি, তা সত্যেরই পরিপন্থী হয়। অতএব, সূফী-দরবেশমণ্ডলী হলেন চিকিৎসকের মতো, যাঁরা মানুষকে পথপ্রদর্শন করেন, যতোক্ষণ না তাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি ভারসাম্য ফিরে পায় এবং তাদের ধর্ম ও বিবেক শক্তি সঞ্চয় করে।

"আমাদের প্রতিটি বস্তু সেভাবে দেখান, যেটির বাস্তব অবস্থা যেমন"

মানবতা হচ্ছে এক বিশাল বড় ব্যাপার। এই দুনিয়ার মানুষেরই অভ্যন্তরে সব কিছু লেখা রয়েছে, কিন্তু পর্দা ও অন্ধকার নারী-পুরুষকে তাদের অভ্যন্তরে বিরাজমান এই জ্ঞান আহরণ বা বিদ্যা অর্জনে বাধা দেয়। এই পর্দা ও অন্ধকার হচ্ছে যাবতীয় আচ্ছন্নতা এবং সব ধরনের পার্থিব কামনা-বাসনা ও চিন্তা। মানুষ যদিও অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এতোগুলো পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত, তথাপিও তারা কিছু না কিছু উপলব্ধি করতে সক্ষম এবং এরই ফলশ্রুতিতে শিখতেও সক্ষম। বিবেচনা করুন, এই অন্ধকার ও পর্দা অপসারিত হলে তারা কী না শিখতে পারবে, আর কতো বৈচিত্র্যময় জ্ঞান-ই না তারা নিজেদের ভেতরে আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে!

কেননা, বস্ত্র সেলাই, বাড়িঘর নির্মাণ শিল্প, কাঠের কাজ, স্বর্ণকার, বিজ্ঞানচর্চা, জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ও পৃথিবীর অসংখ্য ও অগণিত পেশা ও ব্যবসা কারো না কারো অভ্যন্তর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এটি পাথর ও ধুলো থেকে প্রকাশিত হয়নি। তারা যখন বলে একটি দাঁড় কাক মৃতকে দাফন করার পদ্ধতি মানুষদেরকে শিক্ষা দিয়েছিল, তখন তা-ও কোনো না কোনো মানবের চিন্তা-ভাবনার ফলশ্রুতিতে ঘটেছিল। কারো নিজস্ব অভ্যন্তরীণ তাকিদ তাদেরকে সেটি শিখতে পরিচালিত করেছিল। অধিকন্তু, পাখিদের সহজাত প্রবৃত্তি মানবতারই একটি অংশবিশেষ, কিন্তু কোনো একটি অংশ তো গোটাটুকুকে আজ্ঞাধীন করে রাখতে পারে না।

আমীর (শাসক) মওলানা রূমী (রহ:)-এর দরবার হতে প্রস্থানের পর কেউ একজন বলেন: "আমীর দরবারে এলে পীর-মোর্শেদ নিগূঢ় (রহস্যপূর্ণ) কথা বলেন। তাঁর কথা আর শেষ হয় না, কেননা তিনি ভাষার পণ্ডিত। কোনো বিরতি ছাড়াই তাঁর মুখ দিয়ে কথা বের হতে থাকে।"

মওলানা বলেন: শীতকালে গাছ-গাছালিতে পাতা ও ফল না ধরলে মানুষদের এ কথা ভাবা উচিত নয় সেগুলো কাজ করছে না। সেগুলো নিয়মিত-ই কাজ করছে। শীতকাল হচ্ছে সঞ্চয়ের মৌসুম; আর গ্রীষ্মকাল ব্যয়ের। সবাই ব্যয়টুকুই দেখে, কিন্তু সঞ্চয়টুকু দেখে না। একইভাবে কেউ দাওয়াত দিয়ে অজস্র অর্থ তাতে ব্যয় করলে সবাই তা দেখে, কিন্তু ওই আনন্দের খাতিরে অল্প অল্প করে জমানোর প্রচেষ্টাকে কেউই দেখে



না। তবুও ওই সঞ্চয়-ই মূল বিষয়বস্তু, কেননা সমস্ত ব্যয় ওই আয় হতেই নির্গত হয়।

যে কারো সাথে আমরা (মোর্শেদবৃন্দ) একাত্ম হলে আমরা তাদের সাথে প্রতিটি মহূর্তে যোগাযোগ রক্ষা করে চলি, এমন কী তা নীরবতায়, অনুপস্থিতি বা উপস্থিতি নির্বিশেষেও। এমন কী অন্যদের সাথে যুদ্ধেও আমরা এক সাথেই আছি। আমরা হয়তো আমাদের মুষ্টি দ্বারা অন্যদের আঘাত করতে পারি; তবু আমরা তাদের সাথে কথা (নসীহত) বলে চলেছি এবং তাদের সাথে একটি কাজেই নিবিষ্ট। অতএব, আমরা একাত্ম। মুষ্টি দেখে তোমাদের মনোযোগ যেন নষ্ট না হয়, কেননা ওই মুষ্টি হচ্ছে আধ্যাত্মিক উপহার। তোমরা কি তাতে বিশ্বাস করো না? তাহলে ওই মুষ্টি খুলে দেখো, আর একাত্মতার মহানন্দ ও মহামূল্যের মুক্তোর মধ্যকার পার্থক্য প্রত্যক্ষ করো।

অনেক লোক গদ্যে ও পদ্যে চমৎকার, মহা জ্ঞান-প্রজ্ঞাময় ও সুন্দর সুন্দর কথা বলে। এই উচ্চস্তরের জ্ঞান, সুন্দর বচন ও নসীহতের কারণে আমীরের ঝোঁক আমাদের প্রতি দেখা দেয়নি। ওই ধরনের জিনিস সর্বত্রই পাওয়া যায়, আর কোনোক্রমেই তার ঘাটতি নেই। আমার প্রতি আমীরের মহব্বত ও ঝোঁক ওই সব জিনিসের কারণে হয়নি। তিনি অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছেন। তিনি অন্যদের মধ্যে যা দেখেছেন, তার চেয়েও তীব্র এক নূর তথা জ্যোতি (এখানে) দেখতে পাচ্ছেন।

বর্ণিত আছে যে কোনো এক বাদশাহ মজনুনকে তার রাজ-দরবারে ডেকে পাঠান। তিনি প্রশ্ন করেন, "আপনার কী হয়েছে? কেন আপনি এতো অধঃপতিত, যার দরুন আপনি নিজের মান-সম্মান খুইয়েছেন, বাড়িঘর ছেড়েছেন, আর সম্পূর্ণভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছেন? লায়লা কী? তার কী এমন সৌন্দর্য? আমি আপনাকে আরো অনেক সুন্দরী সুন্দরী নারী দেখাবো। আপনার ধার্যকৃত মূল্য বলুন, আমি তা পরিশোধ করবো।"

ওই সুন্দরী নারীদের শাহী দরবারে আনা হলে তাদেরকে মজনূনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। মজনূন তাঁর মাথা নত করে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকেন। রাজা তাঁকে আদেশ দেন, "আপনার শির উঠিয়ে দেখুন!" মজনূন উত্তর দেন, "লায়লার জন্যে আমার প্রেম উন্মুক্ত

তরবারির মতো। আমি যদি মাথা তুলি, তাহলে তা আমার শিরোচ্ছেদ করবে!"

মজনূন লায়লার প্রেম-সাগরে ডুব দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য নারীদেরও তো চোখ, ঠোঁট ও চুল ছিল। তাহলে এই (বিভোর) অবস্থায় উপনীত হওয়ার জন্যে তিনি লায়লার মধ্যে এমন কী দেখতে পেয়েছিলেন?

## উপদেশ বাণী - ১২

মওলানা রূমী (রহ:)-এর খানেগাহ'তে আমীর (রাজ্যের শাসক) আগমন করার পর মওলানা বলেন: আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার জন্যে উদগ্রীব ছিলাম। কিন্তু আপনি মানুষের নানা বিষয় দেখাশুনার কাজে ব্যস্ত থাকেন জেনে আমি আপনাকে বিরক্ত করিনি।

আমীর উত্তরে বলেন: "ওই কর্তব্য পালন আমার ওপর বেশ চাপ সৃষ্টি করে রেখেছিল। এখন যখন জরুরাত ফুরিয়েছে, আমি আপনার দর্শনপ্রার্থী হবো।"

মওলানা বলেন: এতে কোনো পার্থক্য নেই। এটি একই কথা। আপনি এতো ভদ্র/সৌজন্যময় যে সব বিষয়-ই আপনার কাছে এক। যেহেতু আজকে আপনি-ই নেক আমল (সৎ কর্ম) ও দান-সদকাহ করতে ব্যস্ত, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই আমি আপনার সাক্ষাৎ পেতে সক্ষম হয়েছি।

এক্ষণে আমাদের কেউ কেউ আলোচনা করছিলেন এ প্রশ্নটি: খোদার গোপন রত্নভাণ্ডারের (তথা ঐশী করুণার) অধিকারী কোনো সূফী-দরবেশ যদি কাউকে আঘাত করেন এবং তার নাক বা চোয়াল ভেঙ্গে দেন, তাহলে কে দোষী সাব্যস্ত হবেন? প্রত্যেকেই বলেন যাকে ব্যথা দেয়া হয়েছে, তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, তিনি হলেন (নাক/চোয়ালে) আঘাতকারী ওই দরবেশ। যে ব্যক্তিকে আঘাত করে নাক বা চোয়াল ভাঙ্গা হয়েছে, সে-ই হলো অন্যায়কারী; আর অবশ্যই ওই দরবেশ হলেন অন্যায়ের শিকার, কেননা তিনি খোদার রত্নভাণ্ডারের অধিকারী। তিনি খোদার মাঝে নিবিষ্ট, আর



তাই তাঁর কাজ আল্লাহরই সৃষ্ট কাজ। আমরা আল্লাহকে অন্যায়কারী বলতে পারি না।

মহানবী (দ:) (পাল্টা)-আক্রমণ করেছিলেন, (যুদ্ধে) জান নিয়েছিলেন এবং ফলশ্রুতিতে রক্ত-ও ঝরেছিল, কিন্তু (মক্কার) কাফের ও মুশরিকবর্গ-ই ছিল অন্যায়কারী; আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছিলেন অন্যায়ের শিকার। উদাহরণস্বরূপ, একজন পশ্চিমা লোক পাশ্চাত্যে বসবাস করেন। কোনো প্রাচ্যদেশীয় লোক বেড়াতে এলেন সেখানে। পশ্চিমা লোকটি প্রাচ্যদেশীয় লোকটির কাছে একজন অপরিচিত, অচেনা মানুষ। কিন্তু আসল অচেনা ব্যক্তিটি কে? ওই প্রাচ্যদেশীয় লোকটি কি গোটা পশ্চিমের কাছে অচেনা নয়?

তথাপিও এই গোটা পৃথিবী একটি বাড়ির মতো, এর বেশি কিছু নয়। আমরা এর এ কক্ষ থেকে ও কক্ষ, কিংবা এক কোণা থেকে আরেক কোণায় গেলেও আমরা কি একই বাড়িতে অবস্থান করছি না? কিন্তু সূফী/দরবেশ যাঁরা খোদাতা'লার রত্নভাণ্ডার (মানে আধ্যাত্মিকতা) লাভ করেছেন, তাঁরা এই বাড়ি ত্যাগ করে এর উর্ধ্বে উঠে গিয়েছেন। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান, 'ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় আরম্ভ হয়েছে এবং ওই অবস্থায় ফিরে যাবে।' তবু এ জগৎ কি সত্যিকার অর্থে অপরিচিত নয়? তাই মহানবী (দ:)'কে যখন (মক্কা থেকে) হিজরতে বাধ্য করানো হলো, তখন তিনি ছিলেন অন্যায়ের শিকার, আর যখন তিনি (মক্কা বিজয় করে) শত্রুদের পরাভূত করলেন, তখনো তিনি ছিলেন অন্যায়ের শিকার। কেননা, উভয় ক্ষেত্রেই তিনি হক্ক তথা সত্যের ওপর ছিলেন প্রতিষ্ঠিত; আর যিনি সত্যপন্থী তিনি-ই অন্যায়ের শিকার হিসেবে সাব্যস্ত হন (খোদার দরবারে)।

রাসূলুল্লাহ (দ:)'র মোবারক অন্তর তাঁরই বন্দীদের জন্যে বেদনার্ত ছিল। তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে আল্লাহতা'লা আয়াত নাযেল করেন এ মর্মে: "হে রাসূল, আপনার হাতে বন্দীদের বলুন, তোমরা যদি সত্য ও ন্যায়ের পথ গ্রহণ করো, তাহলে আল্লাহতা'লা তোমাদেরকে এ বন্দী দশা থেকে মুক্তি দেবেন। তোমরা যা হারিয়েছো, তা তিনি ফিরিয়ে দেবেন এবং তার চেয়েও বেশি দেবেন, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পরবর্তী জগতের রত্নসম্ভার।"

আমীর প্রশ্ন করেন: "যখন আল্লাহর কোনো বান্দা একটি নেক আমল পালন করেন, তখন ঐশী করুণা ও ভালাই কি তা হতে অবতীর্ণ হয়, না-কি এটি (আমলটি) আল্লাহরই একটি পুরস্কার?"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: এটি আল্লাহরই একটি পুরস্কার এবং তাঁর করুণাও বটে। তবু আল্লাহতা'লা তাঁর পরম ভালোবাসার খাতিরে ওই (নেক) আমল ও (ঐশী) করুণা উভয়ের কৃতিত্ব-ই তাঁর বান্দাকে দেন এ কথা বলে, "এ দুটোই তোমার।"

আমীর (শাসক) বলেন: "যেহেতু খোদাতা'লার এ রকম ভালোবাসা বিদ্যমান, তাই সত্যান্বেষী যে কেউই তা খুঁজে পাবেন।"

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: কিন্তু একজন পথপ্রদর্শক ছাড়া এটি হবার নয়। তাই বনী ইসরাঈল যখন হযরত মূসা (আ:)-এর অনুগত ও হুকুম-বরদার ছিল, তখন বিভিন্ন রাস্তা তাদের সামনে খুলে দেয়া হয়েছিল, এমন কী সাগরেও (নীল নদে)। কিন্তু তারা যখন তাঁর কথা অমান্য করেছিল, তখন তারা বেশ অনেক বছর জঙ্গলে বিচরণ করেছিল। নির্দিষ্ট কোনো সময়ের নেতৃবৃন্দকে দায়িত্ব দেয়া হয় (তাঁদের সময়কার) সেসব মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করার, যারা তাঁদের প্রতি অনুগত এবং তাঁদেরকে দৃঢ়ভাবে মান্যকারী। উদাহরণস্বরূপ, কোনো সৈন্যদল যদি তাদের সেনাপতির আদেশ-নির্দেশ মান্য করে, তবে তিনিও তাদের কল্যাণের ব্যাপারে যত্নবান হন এবং তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে কাজ করতে দায়বদ্ধ থাকেন। কিন্তু তারা অবাধ্য হলে তাদের স্বার্থের প্রতি নজর রাখার ব্যাপারটি সেনাপতির কাছ থেকে কীভাবে আশা করা যায়?

মস্তিষ্ক (মন) হচ্ছে শরীরের সেনাপতি তথা নিয়ন্ত্রক। যতোক্ষণ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেটির প্রতি সমর্পিত থাকে, ততোক্ষণ সমস্ত শরীরের বিষয়াদি নিখুঁতভাবে পরিচালিত হয়; কিন্তু যখনি সেগুলো অমান্য করে, তৎক্ষণাৎ প্রাকৃতিক নিয়ম ভেঙ্গে পড়ে। আপনি কি দেখেননি কোনো ব্যক্তি মদ্যপ হলে তার হাত, পা ও জিহ্বা তাকে মানতে অস্বীকার করে বসে? অতঃপর পরের দিন-ই যখন সে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরে, তখন সে আর্তনাদ করে বলে, "আমি এ কী করেছি? আমি কেন এসব ভয়ানক কাজ করেছি এবং আজেবাজে কথা বলেছি?"



একইভাবে, কোনো গ্রামের অধিবাসীবর্গের মান্যকৃত একজন নেতা যদি ওই গ্রামে থাকেন, তাহলে গ্রামটি নিখুঁতভাবে নিয়মমাফিক পরিচালিত হয়।

মস্তিষ্ক যেমন শরীরের মাঝে নিয়ন্ত্রক, ঠিক তেমনি গোটা মানবজাতি তাদের নিজ নিজ মস্তিষ্ক, জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা ও শিক্ষা-দীক্ষাসহ মানবতার শরীরসদৃশ, আর তাদের মাঝে সূফী-দরবেশ হলেন মস্তিষ্ক। এসব লোক যখন ওই মস্তিষ্ককে অনুসরণ করে না, তখন তাদের সমস্ত বিষয়াদি ও কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উদ্ভব হয়।

এসব মানুষকে এমনভাবে সমর্পিত হওয়া চাই যাতে সূফী-দরবেশ যা-ই করুন, তাদেরকে তা গ্রহণ করে নিতে হবে, আর এব্যাপারে নিজেদের মস্তিষ্কের যুক্তি মানা চলবে না। কেননা, অহরহ-ই তাদের মস্তিষ্ক দ্বারা ওই দরবেশের কর্মকাণ্ডকে তারা উপলব্ধি বা অনুধাবন করতে পারে না। অতএব, সূফী-দরবেশ যা বলেন, তাতেই তাদের সমর্পিত হওয়া চাই। অনুরূপভাবে, কোনো শিশুকে যখন একজন দরজির কাছে কাজ শিখতে দেয়া হয় (শিক্ষানবিশ হিসেবে), তখন দরজি যা বলেন তা-ই তাকে করতে হয়। সেলাইয়ের কোনো কিছু জোড়া দিতে বলা হলে শিক্ষানবিশ তা-ই করে; পাড় সেলাই করতে বলা হলে সে তা-ই করতে বাধ্য থাকে। ওই পেশা শিখতে চাইলে তাদেরকে নিজেদের আকাঙ্ক্ষাগুলো পুরোপুরিভাবে সমর্পণ করা চাই এবং দরজির আদেশের অধীনে থাকা চাই।

"শবে কদরের রাত এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।" [সরাসরি অনুবাদ]

আল্লাহতা'লা আমাদেরকে হেদায়াত তথা ঐশী পথপ্রদর্শন ও যত্ন মঞ্জুর করেছেন (পীর-বুযূর্গের মাধ্যমে), যা এক লাখ বার সাধনা ও সংগ্রামের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। মহান প্রভুর তরফ থেকে একটি সবল টান মারা হলে তা আমাদের প্রয়োগকৃত সমস্ত শক্তির চেয়ে শ্রেয়তর হবে। আরেক কথায়, খোদায়ী যত্ন এলে তা এক লক্ষাধিক সংগ্রামের চেয়েও বেশি কাজ করে। সংগ্রাম করা ভালো ও উপকারী, কিন্তু তা খোদায়ী হেদায়াত ও যত্নের তুলনায় কী-ই বা মূল্য রাখে?

আমীর (শাসক) বলেন: "আল্লাহতা'লার যত্নের কারণে কি সংগ্রামের সূত্রপাত হয়?"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: কেন তা সূত্রপাত করবে না? যখন খোদায়ী যত্ন আগমন করে, সংগ্রাম তখন আরম্ভ হয়। ঈসা (আ:) কতোই না সংগ্রাম করেছিলেন! তবু ইয়াহইয়া (আ:) ওই খোদায়ী দানকে চিনতে পেরেছিলেন যখন তিনি মরিয়ম (আ:)-এর গর্ভেই ছিলেন। ঐশী করুণা আগে আসে। অতঃপর যদি দৈবক্রমে সচেতনতা জাগ্রত হয়, তবে তা খোদাতা'লার করুণারই ফল - মহান প্রভুর খাঁটি এক উপহারই বটে। এটি সত্য না হলে ঈসা (আ:)'র শিষ্য (হাওয়ারী)-বৃন্দ কীভাবে এই আশীর্বাদ পেলেন?

(ঐশী) করুণা ও (খোদার প্রতি) সমর্পণ হচ্ছে আগুনের স্ফূলিঙ্গ, যা লাফিয়ে ওঠে। প্রথমে আমরা (ঐশী) দানটি পাই। কিন্তু যদি আপনি ওই স্ফূলিঙ্গ বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত তাতে তুলো যোগ করতে থাকেন, তাহলে সেটি হবে সমর্পণ। শুরুতে আপনার স্ফূলিঙ্গ ক্ষুদ্রকায় ও দুর্বল থাকে। কিন্তু একবার ওই দুর্বল আগুনকে আপনি বাড়তে দেয়ায় সেটি পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশ্বজগতকে গ্রাস করে। ক্ষুদ্র স্ফূলিঙ্গ পরিণত হয় মহা শক্তিশালী দাবানলে।

কেউ একজন আমীরকে বলেন: "আমাদের মোর্শেদ (মওলানা রূমী) আপনাকে খুবই মহব্বত করেন।"

মওলানা উত্তর দেন: আমার (এখানে) আসা বা কথা বলা আমার মহব্বতের চিহ্ন নয়। আমি তা-ই বলে থাকি, যা আমার মনে আসে। আল্লাহ চাইলে তিনি এই সামান্য বাণীকে ফায়দাপূর্ণ করতে পারেন, যাতে এগুলো আপনাদের অন্তরে বেড়ে উঠতে পারে এবং (ফলশ্রুতিতে) মহা পুরস্কার বয়েও আনতে পারে। আর যদি তিনি ইচ্ছা না করেন, তাহলে এমন কী লক্ষ কথা বল্লেও তা অন্তরে গাঁথবে না, বরং বিস্মৃত-ই হবে। কোনো স্ফূলিঙ্গ একটি পোড়া ন্যাকড়ার ওপর এসে পড়লে এবং আল্লাহর ইচ্ছা হলে ওই একটি স্ফূলিঙ্গ-ই ন্যাকড়াটিকে গ্রাস করবে। আর খোদাতা'লার ইচ্ছা না হলে একশটি স্ফূলিঙ্গ-ও ওই দাহ্য ন্যাকড়ায় পড়ে কোনো ফলাফল আনতে সক্ষম হবে না।



(আমাদের) এসব বাণী খোদাতা'লার ফৌজ (বাহিনী)। তাঁর অনুমতিক্রমে এগুলো দুর্গ অবরোধ করে তার দরজা খুলে দখল নেয়। খোদাতা'লা যদি হাজার হাজার অশ্বারোহীকে অমুক দুর্গে যেয়ে নিজেদের চেহারা দেখাতে আদেশ করেন, কিন্তু দখল করতে নিষেধ করেন, তবে তা-ই হবে। আর তিনি যদি একজন অশ্বারোহীকে ওই দুর্গ দখল করার আদেশ দেন, তবে ওই একজনই দুর্গের ফটক খুলে তা দখল করে নিতে সক্ষম হবেন।

আল্লাহতা'লা নমরূদের বিরুদ্ধে একটি ডাঁশ-মশা পাঠিয়েছিলেন এবং সেটি তার বিনাশ সাধন করেছিল। "আ'রেফীন তথা খোদা সম্পর্কে জ্ঞানীদের চোখে এক পয়সা ও এক টাকা সমান, একটি সিংহ ও একটি বিড়ালও সমান।" যদি খোদাতা'লা তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন, তাহলে এক পয়সা এক হাজার টাকা বা তারও বেশি টাকার সমান কাজ করে। আর যদি তিনি এক হাজার টাকার ওপর থেকে নিজ রহমত-বরকত সরিয়ে নেন, তবে তা এক পয়সার কাজও করতে পারে না। একইভাবে, খোদাতা'লা যদি বিড়ালকে ক্ষমতা দেন, তাহলে তা সিংহকেও ধ্বংস করতে পারে, যেমনিভাবে ডাঁশ-মশা নমরূদের বিনাশ সাধন করেছিল। সংক্ষেপে, আমরা যখন বুঝতে সক্ষম হই যে সকল বিষয়-ই আল্লাহতা'লা হতে আগত, তৎক্ষণাৎ সব কিছুই আমাদের চোখে এক ও অনুরূপ হয়ে যায়।

আমিও আশা করি, আপনারা এসব কথা আপনাদের হৃদয়ের গভীরে শুনতে পাবেন; কেননা তা লাভজনক হবে। কিন্তু যদি এক হাজারটি চোর বাইরে থেকে হানা দেয়, তাও তারা (ঘরের) ভেতরে অবস্থানরত সহযোগীর সহায়তা ছাড়া দরজা খুলতে পারে না। বাইরে থেকে এক হাজারটি কথা বলুন, তবু ভেতর থেকে সাড়া দেয়ার জন্যে যদি কেউ উপস্থিত না থাকে, তবে দরজা কখনোই খুলবে না। একই অবস্থা একটি গাছেরও; যতোক্ষণ পর্যন্ত তার শেকড়ে পানির তেষ্টা না থাকে, ততোক্ষণ আপনারা এক হাজারটি প্রবল জলধারা তাতে সেচন করলেও তা ফলদায়ক হবে না। তার শেকড়ে পানি দ্বারা প্রাণের সঞ্চার হতে হলে তাতে প্রথমতঃ তেষ্টা থাকতে হবে। যদিও গোটা পৃথিবী সূর্য কিরণে জ্বলন্ত রয়েছে, তবুও চোখের মধ্যে ওই আলোর স্ফূলিঙ্গ না থাকলে কেউই ওই আলো (কিরণ) দেখতে পায় না। বিষয়টির মূল হচ্ছে রূহ তথা আত্মার গ্রহণোন্মুখতা।

রূহ এক জিনিস, নফস (একগুঁয়ে সত্তা) আরেক। আপনারা কি দেখেন না ঘুমের মধ্যে রূহ কীভাবে দূর-দূরান্তে ঘুরে বেড়ায়? নফস্ শরীরেই অবস্থান করে এবং এটিকে জিইয়ে রাখে। কিন্তু রূহ ভ্রমণ করে এবং রূপান্তরিত হয়। হযরতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন এরশাদ করেন, "মান আ'রাফা নাফসাহূ ফাক্কাদ আ'রাফা রাব্বাহূ" [যে ব্যক্তি নিজের নফসকে চিনেছে, সে তার প্রভু খোদাতা'লাকে চিনেছে], তখন তিনি রূহকে চেনার ব্যাপারটি-ই বুঝিয়েছিলেন।

আমরা যদি বলি মহানবী (দ:) অমুক রূহ বা তমুক রূহ সম্পর্কে এ কথা বলেছিলেন, তাহলে তা হবে একদম ভিন্ন একটি বিষয়। অপরদিকে, আমরা যদি এটিকে স্বয়ং রূহের অর্থে ব্যাখ্যা করি, তাহলে শ্রোতামণ্ডলী হয়তো তখনো ভাবতে পারেন আমরা একটি রূহকেই বুঝিয়েছি; কেননা তারা এখনো স্বয়ং রূহকে চেনেন না। এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি স্রেফ কথায় ব্যক্ত করা যায় না। কথা শুধু তা-ই ব্যক্ত করতে পারে যা অন্তরের কান শ্রবণ করতে সক্ষম।

এই জগতেরও অতীত আরেকটি জগৎ আমাদের জন্যে অপেক্ষমান। দুনিয়া ও তার আনন্দ-ফুর্তি আমাদের অভ্যন্তরে বিরাজমান জানোয়ারটির সেবায় নিয়োজিত। এসব ফুর্তি আমাদের পাশবিক প্রকৃতিকে পূর্ণতা দেয়, আর ইত্যবসরে আমাদের প্রকৃত সত্তা ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করে। লোকে বলে, "মানুষ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণি।" তথাপি আমরা দুটো বিষয়েরই সমষ্টি। বস্তুর এই জগতে কাম ও আকাঙ্ক্ষাসমূহ আমাদের পাশবিকতাকে পুষ্টি জোগায়। কিন্তু আমাদের প্রকৃত সত্তার (রূহের) খাদ্য হচ্ছে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও খোদার পাক নজর (করুণাপূর্ণ চাহনি)। আমাদের অভ্যন্তরে অবস্থিত পাশবিকতা আল্লাহতা'লা হতে পলায়নপর, আর আমাদের আত্মিক সত্তা (রূহ) এই দুনিয়া হতে পলায়নপর।

"তোমার (অভ্যন্তরে) একজন বে-ঈমান,
অপরজন মো'মেন,
তোমার মধ্যে উভয়ে করছে রণ,
কে হবে সাফল্যমণ্ডিত, সৌভাগ্যবান?
তাকদীর যাকে করবে তার আপন জন।



এই দুনিয়া হচ্ছে শীতের এক জগৎ। "কঠিন" বা "নিয়তাকার" নামটি কি জড় পদার্থকে দেয়া হয়নি? এসব পাথর ও পর্বত, আর এ পৃথিবীর পরিধানকৃত সমস্ত বস্ত্র-ই কঠিন বা ঘন করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই জগতের অভ্যন্তরীণ মৌলিক স্বভাব বা গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী সম্পর্কে জানা যায় এরই প্রভাব হতে: এটি হচ্ছে বায়ু ও তীব্র শীত; ঠিক শীত মৌসুমের মতোই যখন সব কিছু ঠাণ্ডায় জমে যায়। এটি কেমন ধরনের শীত? মস্তিষ্কের শীত। যখন ঐশী মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হবে, তখন এই পর্বতগুলো গলতে আরম্ভ করবে, আর এ জগতের কাঠিন্য-ও তখন গলে যাবে, ঠিক যেমনটি গ্রীষ্মের নিয়ে আসা গরমে সমস্ত তুষার ও বরফ জলে পরিণত হয়। পুনরুত্থান দিবসে যখন ওই মৃদুমন্দ বাতাস বইবে, সব কিছুই গলে যাবে।

খোদাতা'লা (আমাদের) এসব কথাকে এমনই এক সৈন্যবাহিনী বানিয়েছেন যা আপনাদেরকে ঘিরে রাখে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাদের জন্যে একটি রক্ষণব্যূহ হিসেবে কাজ করে, আর শত্রুকে পরাভূত করার একটি মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, ভেতরে এবং বাইরে অনেক শত্রু বিরাজমান। তবু তারা আসলে কিছুই নয়। তারা কী-ই বা হতে পারতো?

আপনারা কি দেখেন না কীভাবে এক সহস্র খোদাহীন (মানে খোদাবিরোধী) লোক একজন নেতার কাছে নিজেদের সমর্পণ করেন যিনি তাদের নেতা হন, আর ওই শাসক নিজেরই ভাবনা-চিন্তার কাছে থাকেন বন্দী? এ থেকে চিন্তা-ভাবনার প্রভাব দেখা সহজ হয়; কেননা একটি দুর্বল ও তালগোল পাকানো চিন্তার দ্বারা সহস্র সহস্র মানুষ ও জগতকে কয়েদ করা হয়। অতএব, বিবেচনা করুন, যাঁদের (অর্থাৎ, সূফী-বুযূর্গবৃন্দের) চিন্তা সীমাহীন, তাঁরা কতোই না মহিমা ও গৌরবের অধিকারী; কতো সহজেই না তাঁরা শত্রুকে পরাভূত করেন; আর কতো জগত-ই না তাঁরা বশীভূত করেন!

আমি যখন বিরাজমান সীমাহীন জ্ঞান-প্রজ্ঞাকে দেখি, অপরদিকে সৈন্যবাহিনীগুলোকে অন্তহীন ধ্বংসযজ্ঞের পর ধ্বংসযজ্ঞে বিস্তৃত দেখি, যাদের সবাই একজন লোকেরই বন্দী, আর ওই লোক একটি ঘৃণ্য ক্ষুদ্র চিন্তারই কয়েদী, তখন তারা সবাই সুগভীর ও শক্তিশালী, অনন্ত-অফুরন্ত

জ্যোতির্ময়তাপূর্ণ, পুতঃপবিত্র ও মহামহিমান্বিত চিন্তার তুলনায় কোথায় অবস্থান করে?

অতএব, চিন্তার বাস্তব প্রভাব রয়েছে। এই পার্থিব জগতে সব জীবিত প্রাণি-ই কেবল চিন্তার নিমিত্তক হিসেবে কাজ করে এবং তাকেই অনুসরণ করে। চিন্তা ব্যতিরেকে তারা জড় ও ঘন পদার্থ। একইভাবে, যারা কেবল বাহ্যিক আকৃতি-ই (যাহের) বোঝে, তারাও ঘন পদার্থ। তারা (অন্তর্নিহিত) অর্থ বোঝে না। তারা রূহানী/আধ্যাত্মিকভাবে শিশু এবং অপরিণত, এমন কী যদি তারা এক শ বছর বয়সী সূফী শায়খ-ও হয়।

"আমরা ছোট জ্বেহাদ (জ্বিহাদ-এ-আসগর) থেকে প্রত্যাবর্তন করেছি বড় জ্বেহাদের (জ্বিহাদে আকবর) দিকে।" [সরাসরি অনুবাদ]

আমরা সবাই বাহ্যিক বস্তু ও মানুষের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখতে পাই, আর এসব আকার-আকৃতিসম্পন্ন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের সৈন্য-সামন্ত প্রস্তুত করি। আমাদেরকে চিন্তার ফৌজের বিরুদ্ধেও সৈন্য-সামন্ত প্রস্তুত রাখতে হবে, যাতে কাঙ্ক্ষিত চিন্তা-ভাবনা ধ্বংসাত্মক চিন্তাকে পরাভূত করতে পারে এবং আমাদের দেহ থেকে তাকে বিতাড়নও করতে পারে। তাই এটি-ই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সংগ্রাম ও বড় জ্বেহাদ।

চিন্তা-ভাবনার প্রভাব বিদ্যমান। এগুলো দেহের প্রভাবেরও ঊর্ধ্বে কাজ করে, যেমনিভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম কোনো নিমিত্তক ছাড়াই সৌরমণ্ডলকে ঘূর্ণীয়মান রাখে। তাই দার্শনিকবৃন্দ বলে থাকেন চিন্তার জন্যে কোনো দেহের প্রয়োজন পড়ে না। আর দেহ তো একটি দৈব ব্যাপার মাত্র। কোনো দৈব ঘটনার ভেতর কেউ কেন বসতি করতে যাবেন?

বাস্তবতা হলো একটি কস্তুরি বা মৃগনাভির লম্বা বীজাধার, আর এই পার্থিব জগৎ ও এর আনন্দ-ফুর্তি স্রেফ ওই কস্তুরিরই সুগন্ধ। কিন্তু এ সুগন্ধ ক্ষণস্থায়ী, স্রেফ একটি দৈব ঘটনা। যে ব্যক্তি কেবল সুগন্ধে সন্তুষ্ট না হয়ে খোদ কস্তুরির তালাশ করেন, তিনি-ই প্রকৃত জ্ঞানী। কিন্তু যে কেউ ওই সুগন্ধ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে সে এক বোকা লোক নিঃসন্দেহে। এ ধরনের লোকেরা এমন জিনিসের খোঁজে ছুটেছে, যেটি তাদের করায়ত্ত হবার নয়। কেননা, ওই সুগন্ধ কস্তুরিরই একটি গুণ মাত্র। অতএব, কস্তুরি যতোক্ষণ এ জগতে বর্তমান, ততোক্ষণই এর সুগন্ধ নাকে এসে পৌঁছে। কিন্তু এটি



যখন দুনিয়া ত্যাগ করে এবং ওই অদৃশ্য পর্দা অতিক্রম করে যায়, তখন যারা এর সুগন্ধের আকর্ষণে বেঁচে ছিল তারা সবাই মৃত্যুবরণ করে। ওই সুগন্ধ কস্তুরিকেই অনুসরণ করে এবং সেটি যেখানে যায় সেখানেই পিছু পিছু যায়।

সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি, যিনি সুগন্ধের রেশ ধরে কস্তুরিকে খুঁজে পান এবং এরপর কস্তুরিওয়ালা হন। এ ধরনের ব্যক্তিবৃন্দ কখনোই মৃত্যুবরণ করেন না, বরঞ্চ ওই কস্তুরির সত্তার গুণাবলী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তারই এক চিরন্তন অংশ হন (বাকাবিল্লাহ)। তাঁরা সেটির সুগন্ধ বিশ্বজগতে বহন করে আনেন, আর তাঁদের দ্বারাই এ জগৎ পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। ওই মহাত্মা যা ছিলেন শুধু তাঁর নাম-ই রয়ে যায়, যেমনটি কোনো ঘোড়া বা অন্য প্রাণির মরদেহ মরুভূমিতে লবণে পরিণত হলেও কেবল তার নামটি-ই রয়ে যায়। কার্যতঃ ও প্রকৃতপক্ষে সেটি এক্ষণে লবণের মহাসমুদ্রের একটি অংশে পরিণত হয়েছে। একটি নাম কী ভালাই বা ক্ষতি করতে পারে? এটি তো এর লবণাক্ততা থেকে একে বের করে আনতে সক্ষম নয়। আর আপনারা যদি এই লবণখনিকে অন্য কোনো নাম দিতে চান, তাতে তো এর স্বাদ পরিবর্তিত হবে না।

অতএব, আমাদের কর্তব্য হলো মুখ ফিরিয়ে নেয়া এই দুনিয়ার আনন্দ-ফুর্তি থেকে, যেগুলো খোদাতা'লার কিরণ ও প্রতিফলন মাত্র। শুধু এগুলোতে সন্তুষ্ট থাকা আমাদের উচিত নয়, যদিও এতোটুকু তাঁরই করুণা ও সৌন্দর্যদীপ্তি দ্বারা অস্তিত্বশীল রয়েছে। খোদাতা'লার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি চিরন্তন, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। এটি সূর্যরশ্মির মতোই যা আমাদের বাড়ির মধ্যে কিরণ বিচ্ছুরণ করে; কেননা যদিও এগুলো সূর্যকিরণ ও আলো, তথাপি এগুলো তারই অধিকারে রয়েছে। যখন সূর্য ডোবে, তার আলো-ও নিভে যায়। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সূর্য হয়ে যাওয়া, যাতে বিচ্ছেদের শঙ্কা আমাদের জীবনকে আচ্ছন্ন না করতে পারে।

দানশীলতা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে জানার অবস্থা। কারো রয়েছে উদারতা ও অনুগ্রহ, কিন্তু নেই প্রকৃত জ্ঞান। আবার কারো রয়েছে জ্ঞান, কিন্তু নেই ত্যাগ-তিতিক্ষা। উভয় গুণ যাঁর মধ্যে বিরাজমান, তিনি-ই আশীর্বাদধন্য ও সফল। এ ধরনের মহান সত্তা সত্যি অতুলনীয়।

রাস্তার সাথে অপরিচিত জনৈক ব্যক্তি কোনো এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে জানতো না কোথায় এর আরম্ভ বা কোথায় শেষ, কিংবা সে পথ হারিয়ে ফেলেছে কি না। এ ধরনের পথচারী অন্ধের মতো এগোয় এই আশায় যে, হয়তো কোনো মোরগ ডেকে উঠবে, অথবা জনবসতির অন্য কোনো চিহ্ন দৃশ্যমান হবে। রাস্তা চিনতে ওই ধরনের অক্ষম ব্যক্তিবর্গকে কীভাবে সড়ক-চিহ্ন ছাড়াই রাস্তা চেনেন ও সহজে চলাফেরা করতে পারেন এমন ব্যক্তিবৃন্দের সাথে তুলনা করা যায়? তাঁদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য তাঁদের সামনে স্পষ্ট। অতএব, জানার অবস্থা (জ্ঞান)-টুকু সব কিছুর ওপরে বা সর্বাগ্রে।

## উপদেশ বাণী - ১৩

হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন, "রাত দীর্ঘ, তোমাদের ঘুম দ্বারা তাকে কমিয়ে ফেলো না। দিন উজ্জ্বল, তোমাদের পাপ দ্বারা তাকে অন্ধকার করো না।"

অন্যদের কৃত চিত্তবিক্ষেপ, কিংবা শত্রু-মিত্রের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ব্যতিরেকেই তোমাদের সবচেয়ে গোপন বিষয় ও চাহিদাগুলো (মহাপ্রভুর দরবারে) আরয করার জন্যে রাত-ই হলো দীর্ঘ সময়। খোদাতা'লা এই সময় অন্যদের চোখে যখন পর্দা টেনে দেন, তখন তোমাদেরকে শান্তি ও একান্ত গোপনীয়তা মঞ্জুর করা হয়, যাতে তোমাদের আমল (পুণ্যদায়ক কাজ) সততা ও সত্যনিষ্ঠাসহ এবং একমাত্র আল্লাহতা'লার উদ্দেশ্যেই কৃত হয়।

রাতে মোনাফেক (কপট) লোকের কপটতা প্রকাশ পায়। পৃথিবী হয়তো রাতের অন্ধকারে ঢাকা থাকতে পারে এবং দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখা যেতে পারে, কিন্তু রাতে কপট লোক সৎ ও আন্তরিক মানুষ হতে আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়।

কপট লোক বলে, "যেহেতু কেউই দেখছে না, এমতাবস্থায় কার খাতিরে আমি ভান করবো?"

কেউ একজন তো অবশ্যই দেখছেন, কিন্তু মোনাফেকের চোখ একদম বন্ধ এবং সে ওই মহান সত্তাকে দেখতেই পাচ্ছে না।



বিপদে প্রত্যেকেই সাহায্য চায়; দাঁতের ব্যথায় ও কানের যন্ত্রণায়, সন্দেহ, ভয়-ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতায়। গোপনে প্রত্যেকেই আরযি পেশ করে এই আশায় যে ওই মহান সত্তা তাদের দোয়া কবূল করে প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন। একান্তে, গোপনে মানুষেরা দুর্বলতা দূর করার ও নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে নেক আমল পালন করে এই আশায় যে, ওই চিরঞ্জীব সত্তা তাদের উপহার ও প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করবেন। যখন তাদের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হয় ও মানসিক শান্তি ফিরে আসে, তখন অকস্মাৎ তাদের বিশ্বাস মিলিয়ে যায়, আর দুশ্চিন্তার ভূত আবারো ঘাড়ে চেপে বসে।

এমতাবস্থায় তারা আবার আরয করে, "হে খোদা, আমরা এমন-ই এক শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়েছিলাম যখন সমস্ত আন্তরিকতাসহ আমাদের কয়েদখানার কোণা থেকে আমরা আপনার কাছে আরয করেছিলাম। এক শ প্রার্থনার ওয়াস্তে আপনি আমাদের আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন। এক্ষণে কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়েও আমরা ওই রকম-ই অভাবগ্রস্ত আছি। আমাদেরকে এই অন্ধকার দুনিয়া থেকে বের করে পয়গম্বর (আ:)-বৃন্দের আলোকোজ্জ্বল জগতে নিয়ে আসুন। মুক্তি কেন কয়েদখানা ও দুঃখ-বেদনা ছাড়া আসে না? এক হাজারটি ভালো ও ধোকাপূর্ণ উভয় ধরনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের গ্রাস করে রেখেছে; আর এসব ভূতের দ্বন্দ্ব এক হাজারটি পীড়ন ও যন্ত্রণা নিয়ে আসে যা আমাদের করে থাকে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। সকল ভূতকে জ্বালিয়ে খাক করা সেই নিশ্চিত বিশ্বাসটি কোথায়?"

আল্লাহতা'লা উত্তর দেন, "তোমাদের মাঝে আনন্দ-ফুর্তির অন্বেষণকারী সত্তা (নফস্) তোমাদের শত্রু এবং আমারও শত্রু।

'তোমাদের শত্রু ও আমার শত্রু যে সত্তা,
মিত্র বলে তাকে গ্রহণ করো না।'

আনন্দ-তালাশী নফস (একগুঁয়ে সত্তা)-কে যখন বন্দী করা হয়, আর সে দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়, তখন-ই তোমাদের স্বাধীনতা আগমন করে এবং শক্তি সঞ্চয় করে। এক হাজার বার তোমরা প্রমাণ করেছো যে মুক্তি তোমাদের কাছে এসেছে দাঁতের ব্যথা, মাথায় ব্যথা ও ভয়-ভীতির মাধ্যমে। তাহলে কেন তোমরা শারীরিক শান্তি-স্বস্তির শেকলে আবদ্ধ

থাকবে? কেন তোমরা শরীরের মাংসের সেবায় সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকবে? (ওপরের) ওই সূত্রের শেষটুকু ভুলে যেয়ো না: দেহের ওই কামনা-বাসনার জট খোলো যতোক্ষণ না তোমাদের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা তোমরা অর্জন করেছো, আর অন্ধকার কয়েদখানা থেকে মুক্তিও খুঁজে পেয়েছো।"

## উপদেশ বাণী - ১৪

শায়খ ইবরাহীম (সম্ভবতঃ মওলানা রূমীর খানেগাহ'তে অবস্থানরত কোনো দরবেশ) বলেন: "(শায়খ) সাইফুদ্দীন ফারূক যখন-ই কাউকে (শাস্তিস্বরূপ) প্রহারের নির্দেশ দিতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি (শায়খ) নিজেকে ব্যস্ত করে নিতেন, যতোক্ষণ না ওই শাস্তি শেষ হতো; এটি এ কারণে করা হতো যাতে কেউ এসে সুপারিশ করতে না পারে।"

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: আপনারা এই দুনিয়ায় যা কিছু প্রত্যক্ষ করছেন, এর সবই হুবহু পরবর্তী জগতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এসব বাস্তবতা অপর (জগতের) বাস্তবতারই নমুনা মাত্র। এ জগতে যা কিছু অস্তিত্বশীল, তার সবই ওখান থেকে এসেছে।

বা'আলাবাক শহরের (লেবানন) টেকো লোকটি তার মাথায় ট্রে'র মধ্যে বিভিন্ন ভেষজের নমুনা বহন করতো - এক চিমটি গোলমরিচ, এক চিমটি আঠা, প্রত্যেকটি স্তূপ থেকেই একটি করে চিমটি। স্তূপের সংখ্যা অশেষ হলেও তার ট্রে'তে এর বেশি কিছু রাখার জায়গা কিন্তু থাকতো না। (দুনিয়ার) মানুষেরা হলো বা'আলাবাক শহরের ওই টেকো লোকটির মতো; তারা ভার বহন করে চলেছে খোদাতা'লার জ্ঞান ও ধনভাণ্ডারের একেক চিমটি ও টুকরো পরিমাণ, কিছু জ্ঞাত ও কিছু গোপন, যেমন নাকি এক টুকরো শ্রবণশক্তি, এক টুকরো বাকশক্তি, এক টুকরো যুক্তি/সুবিবেচনা, এক টুকরো উদারতা, এক টুকরো জ্ঞান ইত্যাদি। এ কারণে আমাদের কাজ-কর্ম সবসময় আল্লাহতা'লারই প্রতিফলন ঘটায়।

এমন কয়েকজন সত্তা আছেন যাঁরা আল্লাহতা'লার 'হকার'। রাত-দিন তাঁরা ট্রে ভরে দেন। দিনে তোমরা জীবিকার প্রয়োজনে তোমাদের অংশ খরচ করে ফেলো, আর রাতে এসকল সত্তা তোমাদের ট্রে আবার ভরে দেন।



উদাহরণস্বরূপ, অপর (অর্থাৎ, পরবর্তী) জগতে বিভিন্ন ধরনের দর্শন ও দিব্যদৃষ্টি বিদ্যমান। ওগুলোর কিছু নমুনা তোমাদের দেখার জন্যে এ জগতে পাঠানো হয়েছে। দর্শনক্ষমতা কেবল এ জগতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু মানবদেহ এর চেয়ে বেশি ধারণ করতে অক্ষম।

প্রজন্ম হতে প্রজন্মান্তরে সহস্র সহস্র মানুষ এসেছেন এবং ওই মহাসাগর (মানে খোদাতা'লা) হতে নিজেদের (পাত্র) পূর্ণ করেছেন, আর পুনঃপুনঃ ফিরেছেন (তাঁর কাছে)। ওই উৎস অশেষ, অসীম। ওই অসীম দরিয়ার কাছে যতো বেশিক্ষণ আমরা অবস্থান করি, ততোই আমাদের অন্তর হতে এই নমুনার জগতের প্রতি মায়া উবে যায়।

এই দুনিয়া ওই টাকশাল (অর্থাৎ, খোদা'লা) হতে তৈরিকৃত মুদ্রা এবং তাকে অবশ্যই ওই টাকশালে ফিরে যেতে হবে। আমাদের সমস্ত অংশ-ই ওই টাকশাল থেকে নিঃসৃত, ওই টাকশালেরই নমুনা সমগ্র, আর তাতেই ফিরে যেতে হবে; এই বিধান ছোট হোক, বড় হোক, সকল প্রাণবিশিষ্ট সৃষ্টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। তবু এই জগতের ট্রে'র ওপরে জীবন দৃশ্যমান হয়; ট্রে ব্যতিরেকে তা দৃশ্যমান হয় না।

ওই অনন্ত, অসীম জগৎ একটি সূক্ষ্ম আলম (জগৎ), আর তা নিজেকে সরাসরি প্রকাশ করে না। তথাপি দেখো তা কী সুন্দরভাবে নিজের চেহারাকে এ দুনিয়ায় তুলে ধরে! তোমরা কি দেখো না বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাস কীভাবে গাছ-গাছালিতে ও ঘাসে, গোলাপ বাগানে ও মিষ্টস্বাদের নানা উদ্ভিদে নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়? ক্ষেতের শস্য ও ফুলের আন্দোলিত হওয়ার মাধ্যমে তোমরা বসন্তকে প্রত্যক্ষ করো। কিন্তু তোমরা যখন খোদ ওই বাতাসের দিকে লক্ষ্য করো, তখন কিছুই দেখতে পাও না। এটি এ কারণে নয় যে ওই গোলাপ-বাগানের সৌন্দর্য মৃদুমন্দ বাতাসের বাস্তবতার বাইরে অবস্থিত। কেননা, বসন্তের মৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দোলায়মান গোলাপ-বাগান ও মিষ্টস্বাদের উদ্ভিদের প্রতিচ্ছবি; তবে ওইসব প্রতিচ্ছবি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য। শুধু কিছু মাধ্যম দ্বারাই ওগুলোর সূক্ষ্মতা প্রকাশ পায়।

অনুরূপভাবে, মানবসত্তায়ও এসব গুণ/বৈশিষ্ট্য গোপন রয়েছে, আর কোনো অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক মাধ্যম দ্বারাই এগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে; কারো জন্যে বাচনিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা, কারো জন্যে কাজের মাধ্যমে,

আবার কারো জন্যে যুদ্ধ অথবা শান্তিকালীন সময় দ্বারা। এসব গুণকে নিজেদের মধ্যে দেখতে পাও না। তাকিয়ে দেখো, কিছুই খুঁজে পাবে না। এমতাবস্থায় তোমরা নিজেদেরকে এসব বৈশিষ্ট্যশূন্য বলে বিশ্বাস করো। এসব গুণ সরাসরি এসে তোমরা যা ছিলো তা হতে তোমাদেরকে অন্য কোনো কিছুতে পরিবর্তিত করে না। বরঞ্চ এগুলো তোমাদের মাঝেই লুকোনো রয়েছে, যেমনটি সাগরে নিহিত জলরাশি।

পানি সমুদ্রকে ছেড়ে যেতে পারে না, কেবল সূর্যতাপে মেঘমালায় পরিবর্তিত হয়েই তা পারে। এটি ঢেউয়ের আকৃতিতে ছাড়া দৃশ্যমান হতে পারে না। তোমাদের ঊর্মি হচ্ছে তোমাদেরই মধ্যে দৃশ্যমান এক উত্তালতা, কিন্তু যতোক্ষণ সাগর শান্ত ও স্থির থাকে, ততোক্ষণ তোমরা কিছুই দেখতে পাও না। তোমাদের শরীর সাগরসৈকতে অবস্থিত, আর রূহ (আত্মা) খোদ ওই মহাসাগরেরই অংশ। তোমরা কি দেখো না কতো মাছ, সাপ, পাখি ও জীবজন্তু বেরিয়ে এসে নিজেদের প্রদর্শন করে, আবার ওই সমুদ্রেই ফিরে যায়? তোমাদের বৈশিষ্ট্য ধৈর্য, বন্ধুত্ব, আনুগত্য ও বাকি সবগুলো এই সাগর হতেই প্রবাহিত।

এ সকল বৈশিষ্ট্য খোদাতা'লার সূক্ষ্ম প্রেমিক। তোমরা কেবল জিহ্বার মাধ্যমে ওগুলোর ভেতর উঁকি দিতে সক্ষম হবে। কিন্তু ওগুলোর সূক্ষ্মতার কারণে বচন ব্যতিরেকে ওগুলো উন্মুক্ত, আর তাই ওগুলো দৃষ্টির আড়ালে খোদার কাছে ফিরে যায়।

## উপদেশ বাণী - ১৫

মানুষের অভ্যন্তরে বিরাজ করে এক আকুল আকাঙ্ক্ষা ও কামনা, যার দরুন এমন কী তারা যদি লক্ষ জগতেরও মালিক হতো, তথাপিও তারা কোনো শান্তি বা স্বস্তি খুঁজে পেতো না। তারা প্রতিটি পেশা ও শিল্প-কৌশল শিক্ষা করে, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ডাক্তারিশাস্ত্র এবং অন্য সব বিদ্যাও শিক্ষা করে, কিন্তু তারা পূর্ণতা খুঁজে পায় না। কেননা, তারা তাদের আসল কামনার খোঁজ পায়নি। (মরমী) কবিবৃন্দ প্রেমাস্পদ (খোদাতা'লা)-কে আখ্যা দেন "অন্তরের শান্তি" বলে, কেননা তাঁর



মাঝেই অন্তর শান্তি খুঁজে পায়। প্রেমাস্পদ (খোদাতা'লা) ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে আমরা কীভাবে শান্তি ও স্বস্তি খুঁজে পেতে পারি?

এসব (দুনিয়াবী) আনন্দ-ফুর্তি ও সাধের অন্বেষণ হচ্ছে একটি সোপানের মতো। মইয়ের ধাপগুলো কারো বাড়ি-ঘর বানাবার স্থান নয়, বরঞ্চ সেগুলো হচ্ছে অতিক্রম করার ধাপ। সৌভাগ্যবান সেসব ব্যক্তি, যাঁরা এটি উপলব্ধি করেছেন। ফলে এই দীর্ঘ রাস্তা তাঁদের জন্যে সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়, আর তাঁরাও ধাপগুলোতে নিজেদের জীবনকে বরবাদ করেন না।

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) বলেন: "মংগল জাতি জোরপূর্বক জমি-সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে, আর সময়ে সময়ে তারা এই সম্পত্তি আমাদেরকে ফেরতও দিচ্ছে। এটি এক অদ্ভূত পরিস্থিতি। এই সম্পত্তি গ্রহণ করা কি বৈধ হবে? এ ব্যাপারে আপনার রায় কী?"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: মংগল জাতি যা কিছু জবরদখল করেছে এবং ফেরত দিচ্ছে, তার সবই খোদাতা'লার কব্জায় ও ভাণ্ডারে ফিরে আসছে। উদাহরণস্বরূপ, তোমরা নদী হতে কোনো পাত্রে বা কলসে জল ভরে নিয়ে এলে তা তোমাদেরই সম্পত্তিতে পরিণত হয়। যতোক্ষণ ওই জল পাত্রটি বা কলসটিতে থাকে, ততোক্ষণ কারোরই নাক গলাবার কোনো অধিকার থাকে না। বিনা অনুমতিতে যে কেউ ওই পাত্রটি নিলে সে চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়। কিন্তু একবার সে ওই পানি নদীতে ফেরত দিলে তার মালিকানা শেষ হয়ে যায় এবং যে কারো জন্যে তা আবার নেয়া বৈধ হয়। অতএব, আমাদের সম্পত্তি তাদের কেড়ে নেয়া অবৈধ, অপরদিকে তাদের (ফেরত দেয়া) সম্পত্তি আমাদের জন্যে বৈধ; কেননা তারা তা ফেরত দিয়ে আল্লাহতা'লার ধনভাণ্ডারেই ফেরত দিয়েছে।

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) বলেন: "মংগল সম্প্রদায় প্রথম যখন এতদঞ্চলে আসে, তখন তারা ছিল বিবস্ত্র ও কপর্দকশূন্য। তারা মোষের পিঠে চড়তো এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল কাঠের তৈরি। কিন্তু এখন তারা কেতাদুরস্ত এবং ভালো খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট, আর তাদের রয়েছে চমৎকার আরবীয় ঘোড়া ও মারণাস্ত্র।"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: মংগল জাতি যখন মরিয়া ও দুর্বল ছিল, শক্তি ছিল না, তখন আল্লাহতা'লা তাদেরকে সাহায্য করেন এবং তাদের প্রার্থনার জবাব দেন। এখন যখন তারা শক্তিশালী ও পরাক্রমের অধিকারী, তখন আল্লাহ পাক দুর্বলের আরাম-আয়েশ দ্বারা তাদের বিনাশ সাধন করছেন, যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে তাদের এই বিশ্বজয় একমাত্র খোদাতা'লার আশীর্বাদ ও সাহায্যেই সম্ভবপর হয়েছিল, আর তা তাদের আপন শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা অর্জিত হয়নি।

মংগল সম্প্রদায় মানব সভ্যতা থেকে দূরে জঙ্গলে বাস করতো, সহায়-সম্বলহীন, গরিব, বিবস্ত্র ও অভাবী অবস্থায়। দৈবক্রমে তাদের কেউ কেউ খাওয়ারিজম শাহের রাজ্যে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগমন করে। তারা কেনাবেচা আরম্ভ করে, আর নিজেদের শরীর আবৃত করার জন্যে মুসলিন কিনতে থাকে। খাওয়ারিজম শাহ এতে বাদ সাধেন, তাদেরকে হত্যার আদেশ দেন এবং বাকি সবার ওপর করারোপ করেন। মংগলরা বিনয়ের সাথে তাদের নিজেদের রাজার কাছে গিয়ে ফরিয়াদ করে এই বলে, "তারা আমাদের লোকদের হত্যা করেছে।" এমতাবস্থায় তাদের রাজা দশদিন সময় চেয়ে নেন, এবং এরপর তিনি এক গভীর গুহায় প্রবেশ করে উপবাস করেন, আর খোদার প্রতি সমর্পিত হন। দশম দিবসে খোদাতা'লার কাছ থেকে এ মর্মে একটি ফরমান জারি হয়, "আমি তোমার প্রার্থনা গ্রহণ করেছি। অগ্রসর হও! যেখানে যাবে, তুমি-ই বিজয়ী হবে!" আর (ঐশী ইচ্ছায়) তা-ই ঘটেছে। তারা যখন অগ্রসর হয়, আল্লাহর ইচ্ছায় তারাই বিজয়ী হতে থাকে এবং দুনিয়া তাদের কব্জায় চলে আসে।

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) বলেন: "মংগল সম্প্রদায়ও আখেরাতে (পুনরুত্থানে) বিশ্বাস করে এবং স্বীকার করে যে শেষ বিচার বলে কিছু একটা আছে।"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: তারা মিথ্যেবাদী; মুসলমান সমাজ যাতে তাদেরকে গ্রহণ করেন, এ কামনায় তারা এই মিথ্যে বলছে। তারা যদি সত্যি পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতো, তাহলে এর সপক্ষে প্রমাণ কোথায়? তাদের দ্বারা সংঘটিত পাপ, অন্যায় ও মন্দ হচ্ছে পর্বত-সমান উচ্চতাবিশিষ্ট বরফ ও তুষারের জমা হওয়া স্তূপ। পুনরুত্থানের চিন্তা



আমাদের মাথায় এলে তা সূর্যের মতোই পাপের ওই তুষারগুলোকে গলিয়ে ফেলে, যেমনটি আসমানের সূর্য সমস্ত শক্ত বস্তুকেই গলিয়ে ফেলে। অতএব, গ্রীষ্ম এলে তা কীভাবে শীত ও তুষারকে বহাল তবিয়তে ছেড়ে দিতে পারে? মংগলদের (পাপের) বরফস্তূপ-ই প্রমাণ বহন করে যে তাদের ওপর সূর্য এখনো কিরণ ছড়ায়নি।

খোদাতা'লা যদিও শেষ বিচার দিনে সকল উত্তম ও মন্দ কর্মের প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন, তবুও প্রতিটি মুহূর্তে ও প্রতিটি ক্ষণে এর একটি নমুনা প্রকাশ পাচ্ছে। কারো অন্তরে সুখ দেখা দিলে অন্য কাউকে সুখি করার পুরস্কারস্বরূপ-ই সে তা পেয়েছে। আর তারা দুঃখি হলে অন্য কাউকে দুঃখ দেয়ারই পরিণতি সেটি। এগুলো পরকালীন জগতের উপহার এবং ওই পুরস্কার-দিবসেরই একেক নিদর্শন, যাতে এসব ছোটখাটো জিনিস থেকে আমরা ওই সব বড় বিষয়গুলো উপলব্ধি করতে পারি, ঠিক যেমনটি গোটা শস্যের স্তূপ হতে দানকৃত এক মুঠো শস্য।

মহানবী (দ:) তাঁর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এক রাতে আপন (মোবারক) হাতে ব্যথা অনুভব করেন। তাঁর কাছে (ঐশী প্রত্যাদেশ মারফত) জানানো হয় যে এই ব্যথা (সাহাবী) হযরত আব্বাস (রা:)-এর হাতে ব্যথা দেয়ার ফলশ্রুতিতেই হয়েছে। কেননা, তিনি হযরত আব্বাস (রা:)'কে বন্দী করেছিলেন এবং তাঁর দুই হাত অন্যান্য সব বন্দীদের মতোই বেঁধেছিলেন। যদিও তাঁর দুই হাত বাঁধার কাজটি আল্লাহর আদেশেই করা হয়েছিল, তথাপিও রাসূলুল্লাহ (দ:)-কে এই কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। তোমাদের কাছে এসব দুঃখকষ্ট ও বিষাদ এসে থাকে অপর কাউকে কষ্ট ও ক্লেশ দেয়ার পরিণতিতেই। তোমাদের কী করেছিলে তা বিস্তারিত মনে রাখতে না পারলেও ফলাফল হতে কর্ম সম্পর্কে জানতে পারে। তোমাদের অবহেলা বা অজ্ঞতা থেকে তা ঘটেছিল কি না, বা অন্যরা তোমাদেরকে ভুল কাজ সংঘটনে পরিচালিত করেছিল কি না, তা হয়তো তোমরা মনে রাখতে না-ও পারে। কিন্ত ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করো: এতে তোমাদের কতোটুকু অধঃপতন হয়েছে, অথবা তোমাদের অন্তর কতোটা প্রশস্ত হয়েছে? অধঃপতন অবশ্যই আল্লাহতা'লার প্রতি অবাধ্যতার প্রতিদানস্বরূপ, আর অন্তরের প্রশস্ততা তাঁরই আনুগত্যের এক পুরস্কার। একবার মহানবী (দ:)'কে হাতের আঙ্গুলে আংটি পরার জন্যে

(মৃদু) অনুযোগ করে বলা হয়: "আমি আপনাকে অনর্থক ও খেলাধুলোর জন্যে সৃষ্টি করিনি।" এ থেকেই তোমরা নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিও তোমাদের দিনগুলো কি আনুগত্য না অবাধ্যতায় কাটছে। পয়গম্বর মূসা (আ:) মানুষের বিষয়গুলোতে মনোনিবিষ্ট ছিলেন (সমাধানকল্পে)। যদিও তিনি খোদাতা'লার আজ্ঞাবহ ছিলেন এবং তাঁরই খেদমতে ছিলেন পুরোপুরিভাবে নিবেদিত, তবুও তাঁর একটি দিক মানবতার সার্বিক কল্যাণে ছিল মগ্ন। হযরত খিযির (আ:)-ও আল্লাহতা'লার খেদমতে ছিলেন পুরোপুরি মগ্ন; তিনি অন্যান্যদের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। মহানবী (দ:) প্রথমে আল্লাহতা'লার ধ্যানে ছিলেন নিবিষ্ট; অতঃপর তাঁকে বলা হয়, "মানুষকে (দ্বীনের পথে) আহ্বান করুন। তাদেরকে উপদেশ দিন এবং পরিশুদ্ধ করুন।" রাসূলুল্লাহ (দ:) কান্নাকাটি করে ফরিয়াদ করেন, "হে প্রভু, আমি কী দোষ করেছি? আপনি কেন আপনার সান্নিধ্য (বা আপনার সামনে উপস্থিত অবস্থা) থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন? এই জগতের প্রতি আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা-ই নেই।" আল্লাহতা'লা তাঁকে বলেন, "হে রাসূল (দ:)! আপনি দুঃখ ভারাক্রান্ত হবেন না, আমি আপনাকে পরিত্যাগ করবো না। অন্যান্যদের মাঝেও আপনি আমার সান্নিধ্যেই থাকবেন। মানুষের (কল্যাণে) আপনি যখন মগ্ন থাকবেন, তখনো (নৈকট্যের) এই লগ্নের একটি মহূর্ত-ও আপনার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে না। আপনি যে কাজেই জড়িত হন না কেন, আমার সাথে একাত্ম থাকবেন।"

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) জিজ্ঞেস করেন: "খোদাতা'লা যে পূর্ব-নির্ধারিত চিরন্তন বিধান জারি করেছেন, তা কি কখনো পরিবর্তিত হয়?"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: আল্লাহ পাক কীভাবে আদেশ দিতে পারেন, "নেকি তথা পুণ্য খুঁজে পাওয়ার জন্যে পাপ সংঘটন করো?" কেউ গম চাষ করে কি যবের ফসল (ঘরে) তুলতে পারে? অথবা যবের চাষ করে কি গম? এটি একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। সকল আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া (রহ:)-ই বলেছেন যে সমস্ত ভালাই উত্তম কর্মেরই পুরস্কার, আর মন্দ পাপেরই পরিণতি। কেউ অণু পরিমাণ পুণ্য করলে তার সুফল পাবে, আবার অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে তার পরিণতিও সে ভোগ করবে।



কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) মাঝখানে যোগ করেন: "কিন্তু আমরা যে বদমাইশ লোকদেরকে পুণ্যবান হয়ে যেতে দেখি, আবার ভালো লোকদেরকেও বদমাইশে পরিণত হতে দেখি।"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: হ্যাঁ, ওই সব বদমাইশ নারী-পুরুষ কিছু নেক কর্ম করেছে বটে, বা উত্তম কাজের চিন্তা করেছে, যা কিছু ভালাই তাদেরকে এনে দিয়েছে। আর ওই সব পুণ্যবান ব্যক্তি কিছু মন্দ কাজ করেছে, বা মন্দ চিন্তা করেছে, যা তাদেরকে বদমাইশে পরিণত করেছে।

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) জিজ্ঞেস করেন: "মহানবী (দ:)-এর প্রতি আশীর্বাদ বর্ষিত হোক - এ কথার মানে কী?"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: এর অর্থ আমাদের মহব্বতপূর্ণ সমস্ত কর্ম, সেবা ও এবাদত-বন্দেগীর কোনো কিছুই আমাদের মালিকানাধীন নয়, বরং এগুলো আল্লাহতা'লা হতে আগত। ঠিক যেমনি বসন্তকাল বয়ে আনে বীজ বপন ও বন-জঙ্গলে প্রমোদবিহার। এগুলো বসন্তের উপহার ও দান। এই দুনিয়াবাসী অমুখ্য বা গৌণ কারণগুলো দেখে থাকে এবং মনে করে যে এগুলোই বুঝি সব কিছুর মূল। কিন্তু খোদাতা'লার আউলিয়া (রহ:)-বৃন্দ এগুলোর সৃষ্টি ও অস্তিত্বশীল হওয়ার বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করে থাকেন। অমুখ্য কারণগুলো হচ্ছে সাধারণ মানুষকে মনোনিবিষ্ট রাখার স্রেফ একটি পর্দা। আল্লাহতা'লা পয়গম্বর যাকারিয়্যা (আ:)-কে প্রতিশ্রুতি দেন এ কথা বলে, "আমি আপনাকে একজন পুত্র সন্তান দেবো।" হযরত যাকারিয়্যা (আ:) কেঁদে আরয করেন, "আমি তো এক বৃদ্ধ ব্যক্তি, আর আমার স্ত্রীও এখন বৃদ্ধা। আমার কামভাব বর্তমানে দুর্বল; উপরন্তু, আমার স্ত্রীও গর্ভধারণের অতীত। হে প্রভু, কীভাবে পুত্র সন্তানের জন্ম হবে?" খোদায়ী উত্তর এলো, "যাকারিয়্যা, শুনুন! আপনি যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছেন। আমি আপনাকে এক লক্ষবার দেখিয়েছি যে বাস্তবতার কোনো কারণ-ই নেই। এই মুহূর্তে আমি আপনার ঔরসে স্ত্রী ও গর্ভ ছাড়াই এক লক্ষ পুত্র সন্তান পয়দা করতে পারি। বস্তুত আমি নিদর্শন দেখালে এক গোটা জনগোষ্ঠীর পয়দা হবে, সম্পূর্ণভাবে গঠিত ও পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় তা হবে। আমি কি আপনাকে রূহের জগতে পিতা বা মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করিনি? আপনি কেন এ কথা ভুলে গিয়েছেন?"

আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া (রহ:)-বৃন্দের পদমর্যাদা ও (মৌলিক) বৈশিষ্ট্য এবং মানবের বহু হালত তথা অবস্থাকে একটি রূপক দ্বারা চিহ্নিত করা যায়: গোলামদেরকে অমুসলিম রাজ্যগুলো হতে মুসলমান রাজ্যে বের করে আনা হয়, যেখানে তাদেরকে বিক্রি করা হয়। কাউকে আনা হয় পাঁচ বছর বয়সে, কাউকে দশ, আবার কাউকে বা পনেরো বছর বয়সে। যাদেরকে শিশু বয়সে আনা হয়, তারা মুসলমান রাজ্যে লালিত-পালিত হয়ে স্বদেশের কথা পুরোপুরি ভুলে যায়। তাদের স্মৃতিপটে আর সেটির কোনো লেশচিহ্ন-ও থাকে না। একটু বড় যাদেরকে আনা হয়, তারা সামান্য কিছু মনে রাখতে পারে। আরো বড় যারা, তারা অনেক বেশি মনে রাখে। পরবর্তী জগতে সবাই আল্লাহতা'লার সামনে উপস্থিত থাকবেন। সেখানে খাদ্য ও রিযিক হবে খোদার বাণী, যা অক্ষরবিহীন ও শব্দহীন। এ জগতে যারা শিশু হিসেবে এসেছে, তারা যখন ওই (খোদায়ী) ভাষণ শোনে, তখন তারা নিজেদের পূর্ববর্তী অবস্থার কিছুই স্মরণ করতে পারে না, আর তারা নিজেদেরকে ওই (খোদায়ী) ভাষণের সাথে অপরিচিত মানুষ হিসেবেই দেখতে পায়। তারা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে আল্লাহতা'লার কাছ থেকে রয়েছে পর্দার আড়ালে। কেউ সামান্য স্মরণ করতে সক্ষম হন, আর তখন-ই অপর জগতের জন্যে তাঁদের আকুল আকাঙ্ক্ষা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাঁরা সত্যকে খুঁজে বের করেন। তাঁরাই হলেন ঈমানদার। কেউ কেউ ওই (ঐশী) ভাষণ যখন শোনেন, আল্লাহতা'লার উপস্থিতি তাঁদের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়, ঠিক যেমনটি বহু আগে (আলমে আরওয়ায়) হয়েছিল। এমতাবস্থায় পর্দা সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হয়, আর তাঁরা (আল্লাহর) দীদারপ্রাপ্ত হন। এঁরাই হলেন আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া (রহ:)।

এক্ষণে আমি তোমাদেরকে আন্তরিকভাবে বলছি, ঐশী সত্যের (সুন্দরী) বধূরা যখন তাদের চেহারা তোমাদের অভ্যন্তরে প্রদর্শন করবে এবং তাদের গোপন রহস্য প্রকাশ পাবে, তখন সাবধান, অপরিচিত কাউকে এ কথা বলবে না। তোমরা যা প্রত্যক্ষ করেছে, তা অন্য কাউকে জানাবে না; আর আমার এসব কথাও সবাইকে বলবে না। "যারা জ্ঞানের অযোগ্য তাদের তা শিক্ষা দেবেন না, পাছে জ্ঞানের প্রতি করা হয় অন্যায়। আর যোগ্যদের থেকে তা আটকে রাখবেন না, পাছে তাদের প্রতি করা হয় অন্যায়।"



কোনো সুন্দরী ও মনোমোহন প্রেমিকা (বধূ) তোমার বাড়িতে যদি নিজেকে একান্তে তোমার কাছে সমর্পণ করে এ কথা বলে, "আমাকে কারো সামনে প্রদর্শন করবেন না, কেননা আমি আপনারই", তাহলে তাকে বাজারে নিয়ে 'প্যারেড' করানো এবং 'এসো এই সুন্দরীকে দেখে যাও', এ ঘোষণা দেয়া তোমার মোটেও উচিত হবে না। আর তা কখনোই ওই ধরনের মনোমোহন নারীর কাছে প্রীতিকরও হবে না। সে তোমার প্রতি রাগান্বিত হবে। (তদনুরূপ) খোদাতা'লা-ও এসব (ভেদের) কথা (প্রকাশ করা) কারো কারো জন্যে অবৈধ করে দিয়েছেন। তবুও জাহান্নামের বাসিন্দাবর্গ জান্নাতের বাসিন্দাদের চিৎকার করে বলবে, "তোমাদের উদারতা ও মানবতা কোথায়? তোমাদের প্রতি আল্লাহতা'লা প্রদত্ত পুরস্কার ও আশীর্বাদ হতে, দানশীলতা ও সার্বিক দয়া-মায়া হতে তোমরা যদি অল্প কিছু পরিমাণ আমাদের প্রতি ছিটিয়ে দাও, তা কি এতোই কঠিন বা কষ্টসাধ্য হবে? আমরা তো (দোযখের) আগুনে পুড়ছি এবং তাতে গলে যাচ্ছি। ওই সব ফল বা নির্মল বেহেশতী জল হতে দু-এক ফোঁটা আমাদের আত্মার ওপর ছিটালে তাতে কী আসে যায় (তোমাদের)?" বেহেশতের বাসিন্দাবৃন্দ তখন উত্তরে বলবেন, "আল্লাহ পাক এগুলো তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছেন। এই আশীর্বাদের বীজ আমাদের (দুনিয়াতে) পূর্বেকার আমল হতেই আগত। যেহেতু তোমরা ঈমানদারী, আন্তরিকতা ও উত্তম কর্মসহ এই বীজ বপন ও চাষ করো নি, সেহেতু এখানে তোমরা কী ফসল-ই বা পাবে? উদারতার দরুন যদিও আমরা এটি (মানে ফসল) তোমাদের সাথে ভাগাভাগি করি, তথাপিও তোমাদের পুরস্কার না হওয়ার কারণে এটি তোমাদের গলা পুড়িয়ে ফেলবে এবং অন্ননালীতে আটকে যাবে।"

হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দরবারে একবার একদল মোনাফেক ও অপরিচিত লোক আগমন করে। তারা বিভিন্ন রহস্য নিয়ে আলোচনা করতে আরম্ভ করে এবং মহানবী (দ:)-এর প্রশংসা করতে থাকে। হুযূর পূর নূর (দ:) তাঁর সাহাবা (রা:)-বৃন্দের দিকে ফিরে বলেন, "তোমাদের পাত্রগুলো ঢাকো।" এ কথার দ্বারা তিনি বুঝিয়েছিলেন, "অপরিচিত লোকদের কাছ থেকে জ্ঞান-প্রজ্ঞা গোপন রাখো, আর তাদের উপস্থিতিতে তোমাদের মুখ বন্ধ করো এবং জিহ্বা টেনে ধরো; কেননা তারা ইঁদুর এবং এই (ঐশী) জ্ঞান ও করুণার যোগ্য

নয়।" আমাদের সাহচর্য থেকে এইমাত্র বিদায় নেয়া আমীর (রাজ্যের শাসক) যদিও আমরা কী বলছিলাম তা বিস্তারিত বুঝতে পারেননি, তবুও তিনি সাধারণভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে আমরা তাঁকে খোদার (রাস্তার) দিকে আহ্বান করছিলাম। আমি তাঁর মাথা নাড়ানো, মমত্বপূর্ণ স্মিতহাস্য ও জযবাতের (ধর্মীয় আবেগের) আকস্মিক প্রবাহকে তাঁরই উপলব্ধির আভাস বা চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করেছি। গ্রাম হতে মানুষেরা শহরে এসে নামাযের আযান শুনতে পেলে এর বিস্তারিত অর্থ না জানা সত্ত্বেও তারা এর উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

## উপদেশ বাণী - ১৬

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: প্রেমাস্পদ যে কেউই সুন্দর, কিন্তু এর মানে এই নয় যে সুন্দর যে কেউই প্রেমাস্পদ হতে সক্ষম। মজনূনকে লোকেরা বলতো, "লায়লার চেয়েও সুন্দরী নারী আছে; আপনার সামনে কয়েকজনকে পেশ করার সুযোগ আমাদের দিন।" মজনূন জবাব দিতেন, "আমি লায়লাকে তার দৈহিক আকৃতির জন্যে ভালোবাসি না। সে আমার হাতে একখানা কাপের (পানপাত্রের) মতো। আমি তা দ্বারা শরাব পান করি। তোমাদের দৃষ্টি পানপাত্রের ওপরেই নিবদ্ধ, কিন্তু তোমরা শরাব সম্পর্কে কিছুই জানো না। দামী পাথর-খচিত সোনার পাত্রে যদি অম্লস্বাদযুক্ত সিরকা থাকে, তা আমার কী উপকারে আসবে? পুরোনো ভাঙ্গা লাউয়ের খোসা যদি শরাবপূর্ণ হয়, তবে তা আমার চোখে একশটি সোনার পানপাত্র হতেও উত্তম।" কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই আকাঙ্ক্ষা ও আবেগতাড়িত হতে হবে যদি শরাবকে পানপাত্র হতে তার আলাদাভাবে চিনতে সক্ষম হতে হয়। এটি দশদিন যাবৎ অভুক্ত ব্যক্তি এবং প্রতিদিন পাঁচ বেলা আহারকারী ব্যক্তির মতোই একটি বিষয়। উভয়েরই এক টুকরো রুটির প্রতি দৃষ্টি। পেট পুরে খাওয়া ব্যক্তি তাতে আরো খাবার দেখতে পায়, কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষটি তাতে খোদ জীবনকে দেখতে পান। এই ক্ষুধার্তের কাছে এ রুটি একটি পানপাত্র, আর যে জীবন এটি বয়ে আনে তা শরাব। এ ধরনের শরাব সম্পর্কে কোনোক্রমেই জানা যাবে না, খিদে ও প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছাড়া। এই ক্ষুধা অর্জন করুন যাতে তোমরা



আকৃতির দৃশ্যমান হওয়াই শুধু দেখতে না পাও, বরং প্রেমাস্পদ (খোদাতা'লা)-কেও সর্বত্র খুঁজে পাও।

এই জগতের আকৃতিগুলো পানপাত্রের মতো। বিজ্ঞান, কলা ও জ্ঞান হচ্ছে তার ওপর খোদাইকৃত লিপি। পানপাত্র যখন ভেঙ্গে যায়, ওই সব অভিলিখন-ও অদৃশ্য হয়ে যায়। অতএব, যারা ওই শরাব পান করেন, তাঁরা দেখেন "চিরন্তন বাস্তবতা, পবিত্র তথা পুণ্যময় কর্ম"।

কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চাইলে তাকে প্রথমে উপলব্ধি করতে হবে যে তার নিজের জ্ঞান অসম্পূর্ণ, এবং দ্বিতীয়তঃ এমন জ্ঞান (জগতে) বিদ্যমান যেটি সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। তাই প্রবাদ আছে, "জিজ্ঞাসা করাটা জানার অর্ধেক।"

কিন্তু এ জগতে একজনকে অবশ্যই সর্বদা থাকতে হবে যিনি সব জানেন। সবাই কারো না কারো দিকে চেয়ে থাকে, কেননা চূড়ান্তভাবে আমরা খোদারই (সান্নিধ্য) অন্বেষণ করি। কিন্তু এমন একজনকে অবশ্যই সবসময় থাকতে হবে যিনি অভীষ্ট লক্ষ্যে আঘাতকারী ও অন্য কারো ধনুকের তীরে আঘাতপ্রাপ্তের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারেন।

কোনো দেয়ালের ভেতর দিয়ে আসা আওয়াজ শুনতে পেলে তোমরা জানো দেয়ালটি কথা বলছে না, বরঞ্চ ওই কণ্ঠস্বর অন্য কারোর হবে। আউলিয়া (সূফী-দরবেশ) এ ধরনের। তাঁরা মৃত্যুর আগে মৃত্যুবরণ করেছেন [মৃত্যুর আগে মৃত্যুবরণ করো (আল-হাদীস)], আর তাঁরা দরজা ও দেয়ালের মতো হয়ে গিয়েছেন। (খোদাতা'লা হতে) এমন কী এক চুল পরিমাণ পৃথক অস্তিত্ব-ও তাঁদের অবশিষ্ট নেই। বাস্তবতার (অর্থাৎ, খোদার) হাতে তাঁরা হলেন বর্ম - কিন্তু এই বর্ম নিজ ক্ষমতাবলে চলেন না। তাই সূফী/দরবেশবৃন্দ বলেন, "আনাল হক্ক", আমি-ই সত্য । এর মানে "আমি মোটেও কিছু নই, আল্লাহর ক্ষমতাবলেই পরিচালিত হই।" এই ধরনের বর্মকে খোদা (-এর প্রতিনিধি) হিসেবে দেখো বা বিবেচনা করো। এই খোদাগতদের বিরুদ্ধে সহিংস হয়ো না। কেননা, এই বর্মের (মানে আউলিয়ার) প্রতি আঘাত করা খোদ মহান আল্লাহতা'লার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই সামিল।

প্রত্যেক ওলী-দরবেশই আল্লাহ পাকের প্রামাণ্য দলিল। নারী ও পুরুষের মর্যাদা ও মকাম দরবেশের সাথে তারা কী রকম আচরণ করে, তা দ্বারাই নির্ধারিত হয়। তারা ওই সূফী বুযূর্গের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হলে স্বয়ং খোদাতা'লার সাথেই শত্রুতাভাব পোষণ করে। আর দরবেশের প্রতি মিত্রতা রাখলে আল্লাহতা'লার সাথেই বন্ধুত্ব স্থাপন করে।

"যে কেউ তাঁদের দেখা পেলে আমারই দর্শন পায়,
তাঁদের খোঁজ পেলে যেন আমাকেই খুঁজে পায়।"

আল্লাহতা'লার আউলিয়া (রহ:)-বৃন্দ তাঁর ভেদের রহস্য সম্পর্কে অবগত। এই ঐশী গোপন রহস্যের সাথে তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, যেটি "পরিশুদ্ধ (তাযকিয়্যা-প্রাপ্ত) জন ছাড়া কেউই স্পর্শ করতে সক্ষম নয়।" কোনো মহান ওলী/দরবেশের মাযারের দিকে যদি তাঁরা পিঠ দিয়ে দাঁড়ান, তবে তা অবাধ্যতা বা অবহেলার কারণে নয়, বরঞ্চ তাঁরা প্রকৃতপ্রস্তাবে ওই ওলীর যাত মোবারক তথা পবিত্র সত্তার দিকেই মুখ ফিরিয়েছেন; কেননা এখানে উচ্চারিত এসব কথা তাঁদেরই (আউলিয়াদেরই) পবিত্র সত্তা। দেহ হতে মুখ ঘুরিয়ে রূহ তথা আত্মার দিকে মুখ ফেরানোয় কোনো ক্ষতি নেই।

এটি আমার একটি রীতি (আচরিত প্রথা) যে আমার কারণে কোনো অন্তর দুঃখ-ভারাক্রান্ত হোক, তা আমি চাই না। আমাদের (দরবারী) মজলিশে কখনো কখনো বিশাল জনসংখ্যা আমার কাছে ভিড় করে, আর আমার খাদেমবর্গ তাঁদেরকে বাধা দেয়। এটি আমাকে বিব্রত করে। আমি এক শ বার বলেছি, "আমার পক্ষ থেকে কিছু বলো না, আমি তাতেই তুষ্ট।" আমি এব্যাপারে এতোই যত্নবান যে যখন ওই সকল বন্ধু আমার কাছে আসেন (মানে ভিড় করেন), তখন তাঁদেরকে একঘেঁয়েমি দ্বারা বিরক্ত করার দুশ্চিন্তায় আমি শঙ্কিত থাকি; তাই আমি তাঁদেরকে আনন্দ দেয়ার জন্যে কবিতা আবৃত্তি করি। নতুবা কবিতার প্রতি আমার কী-ই বা আগ্রহ? ওয়াল্লাহি (আল্লাহর কসম)! কাব্যের প্রতি আমার কোনো আগ্রহ-ই নেই। অধিকন্তু, আমার দৃষ্টিতে এর চেয়ে মন্দ আর কিছুই নেই। আমার মতে, এটি গরুর নাড়ি-ভুঁড়িতে হাত ঢোকানো সেই বাবুর্চির মতোই, যাকে কোনো মেহমানের ক্ষুন্নিবৃত্তির খাতিরে তা পরিষ্কার করতে হয়।



কোনো সওদাগর আপন নগরীতে কী কী পণ্য প্রয়োজন, তা যাচাই করে দেখেন, আর এ-ও দেখেন মানুষেরা কী কী সামগ্রী কিনতে চান। অতঃপর তাঁরা ওই সব পণ্যসামগ্রী ও সেবা কেনাবেচা করেন, এমন কী যদি তা তাঁদের দৃষ্টিতে সর্বনিম্ন (মানের) বিষয়-ও হয়ে থাকে (তা-ও তাঁরা তা করেন)। আমি অনেক জ্ঞানের শাখা অধ্যয়ন করেছি এবং আমার কাছে আগত জ্ঞান বিশারদ ও গবেষক, বুদ্ধিমান ও গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সামনে সূক্ষ্ম, বিরল ও মূল্যবান বিষয়াদি তুলে ধরতে কষ্ট স্বীকার-ও করেছি। এটি খোদাতা'লা এরাদা (ইচ্ছা) করেছেন (বলেই হয়েছে)। তিনি ওই সব বিদ্যা আমার কাছে জড়ো করেছেন এবং ওই সব কষ্ট-ও একত্রিত করে দিয়েছেন, যাতে আমি এই কাজে মনোনিবিষ্ট থাকি। আমি কী করতে পারি? আমার আপন দেশে এবং আমার স্বজাতির কাছে কাব্যের চেয়ে লজ্জাজনক আর কোনো কিছু নেই। আমি সেখানে থেকে গেলে তাঁদের ধাত বা মন-মানসিকতার সাথে খাপ খেয়ে আমাকে বাঁচতে হতো। তাঁরা যা পছন্দ করেন, তা-ই আমাকে অনুশীলন করতে হতো; যেমন - প্রভাষণ দেয়া, বইপত্র প্রণয়ন ও ধর্মপ্রচার।

আমীর (রাজ্যশাসক) বলেন: "মূল বিষয় হলো কর্ম।"

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: এ ধরনের কর্মী কোথায়, যাতে আমি তাদেরকে কর্ম শিক্ষা দিতে পারি? কিন্তু এক্ষণে দেখুন কীভাবে আপনি আপনার কান খাড়া করে শুনছেন; কর্মের পরিবর্তে কথার খোঁজ-ই আপনি করছেন। আমি যদি এ মুহূর্তে কথা বন্ধ করে দেই, তাহলে আপনি নারাজ হবেন। কর্মের অন্বেষণকারীতে পরিণত হোন, যাতে আমি আপনাকে কর্ম প্রদর্শন করতে পারি!

সারা বিশ্বে কর্মে (বিশ্বাসী) ছাত্রদের আমি খুঁজছি, যাতে (তাদেরকে) কর্মের শিক্ষা দিতে পারি। কর্ম সম্পর্কে জানে এমন যে কারো তালাশে আমি দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কর্মের কোনো ছাত্র খুঁজে পাচ্ছি না; বরঞ্চ স্রেফ কথারই (পণ্ডিত) পাওয়া যাচ্ছে। এ কারণে আমি কথাতেই মনোনিবিষ্ট। কর্ম সম্পর্কে আপনি কী জানেন? কর্মকে শুধু কর্ম দ্বারাই জানা যায়। এই পথের ওপর কোনো পরিভ্রমণকারী-ই নেই, এটি (রাস্তাটি) একেবারেই ফাঁকা। এমতাবস্থায় আমরা কর্মের সঠিক পথের ওপর চলেছি কি না, তা কীভাবে কেউ দেখতে পাবে?

বাস্তবে নামায ও রোযা কোনো কর্ম নয়, বরং সেগুলো হলো কর্মের আকার-আকৃতি। কর্ম হলো অভ্যন্তরীণ এক বাস্তবতা। পয়গম্বর হযরত আদম (আ:)-এর যুগ হতে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জমানা পর্যন্ত নামায ও রোযা তাদের আকৃতির পরিবর্তন করেছে, কিন্তু কর্ম একই আছে।

কর্ম তা নয়, মানুষেরা যা একে ভেবে থাকে। মানুষেরা বিশ্বাস করে কর্ম হচ্ছে এই বাহ্যিক প্রদর্শনী। কিন্তু কোনো মোনাফেক (কপট) লোক শুধু নামায-রোযার মতো (পুণ্যদায়ক) কর্মের (বাহ্যিক) আকৃতি পালন করলে তা তাদেরকে কোনো অর্জন এনে দেয় না। কেননা, তাতে প্রকৃত কর্ম পালনের আন্তরিক ইচ্ছা নিহিত ছিল না।

সকল বিষয় বা বস্তুর গোপন নীতি হচ্ছে ভাষণ ও কথা। আপনি এখনো জানেন না ভাষণ ও বচনের প্রকৃত জ্ঞান সম্পর্কে, যার দরুন আপনি সেগুলোকে গুরুত্বহীন বিবেচনা করছেন। তবে কর্ম-বৃক্ষ হতে উৎপন্ন ফল হচ্ছে ভাষণ, কেননা কর্ম হতেই জন্মলাভ করে বচন। আল্লাহতা'লা এ বিশ্বজগৎ একটি কথা ('কুন্' বা 'হও') দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন।

আপনার হয়তো অন্তরে ঈমান বিদ্যমান, কিন্তু যতোক্ষণ না আপনি তা কথা দ্বারা (অন্যদের সাথে) ভাগাভাগি করছেন, ততোক্ষণ তার কোনো মূল্যই নেই। আপনি যখন বলেন, "বর্তমান এই যুগে কথার কোনো মূল্য নেই", তখন আপনি সেটি কথা দ্বারাই প্রকাশ করেন, তাই নয় কি? কথার যদি কোনো মূল্যই না থাকতো, তাহলে আমরা কেন আপনাকে এ কথা বলতে বচন ব্যবহার করতে দেখি?

কেউ একজন জিজ্ঞেস করেন: "আমরা কোনো নেক আমল (পুণ্যদায়ক কর্ম) পালন করলে এবং খোদাতা'লা হতে উত্তম পুরস্কার পাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা (অন্তরে) পোষণ করলে তা কি আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে?"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: আল্লাহর শপথ! আমাদের সবসময়-ই আশা (অন্তরে) রাখতে হবে। আকীদা-বিশ্বাস স্বয়ং আশঙ্কা ও আশার সমষ্টি। কেউ একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আশা নিজে নিজেই উত্তম, কিন্তু শঙ্কা আবার কোনটি?' উত্তরে আমি বল্লাম, 'আমাকে এমন শঙ্কা দেখান যা'তে আশার অস্তিত্ব নেই; কিংবা এমন আশা যা'তে ভয়-



ভীতি নেই? এই দুটো অবিচ্ছেদ্য।' উদাহরণস্বরূপ, কোনো এক চাষী গমের চাষ করেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি আশা করেন যে ওই গম বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে তিনি উদ্ভিদের কোনো রোগ অথবা খরা দ্বারা সেটি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থেকেও মুক্ত নন। শঙ্কাহীন কোনো আশার অস্তিত্ব নেই, যেমন নেই আশাহীন শঙ্কার অস্তিত্ব-ও।

আমরা যখন কোনো পুরস্কার পাওয়ার প্রত্যাশা করি, তখন আমাদের চেষ্টা নিশ্চিতভাবে আরো বেড়ে যায়। প্রত্যাশা আমাদের পাখায় পরিণত হয়; আর আমাদের ডানা যতো শক্তিশালী হয়, ততোই দূরে উড়ে যাওয়া যায়। অপরদিকে, আমরা যদি আশাহত হই, তাহলে আমরা অলস হয়ে পড়ি এবং কারো কাছেই আমাদের কোনো মূল্য থাকে না। একজন অসুস্থ ব্যক্তি তেতো ওষুধ গ্রহণ এবং দশটি মিষ্টস্বাদের খাবার বর্জন করতে পারেন, কিন্তু যদি সুস্বাস্থ্যের কোনো আশা আর না থাকে তাহলে কেন অসুস্থ ব্যক্তিবর্গ এই কষ্ট স্বীকার করবেন?

আমরা হলাম পশু ও ভাষণের এক মিশ্রণ। আমরা বাহ্যিক (প্রকাশ্য)-ভাবে কথা না বল্লে অভ্যন্তরে (অন্তরের গভীরে) বলি; নিরন্তর কথা বলি আমরা। আমরা নদীর মতো, যা কর্দমিশ্রিত। নির্মল জল হলো আমাদের ভাষণ, আর কাদা হলো আমাদের পশুত্ব। কিন্তু আমাদের মধ্যে নিহিত এই কাদা দৈবাৎক্রমে এসেছে। আপনি কি দেখেন না ওই সব মাটির টুকরো কীভাবে ভেঙ্গে পচে গিয়েছে, অথচ মানবজাতির ভালো ও মন্দ ভাষণ, কাব্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অস্তিত্বশীল থেকে গিয়েছে?

'পুরুষ বা নারীর হৃদয় (অন্তর) হচ্ছে একেকটি বিশ্বজগৎ। আপনি তাদেরকে দেখলে সবকিছুই দেখে ফেলেছেন। কেননা, "সর্বপ্রকারের খেলা-ই জঙ্গলি গাধার পেটের ভেতরে বিরাজমান।" বস্তুতঃ হৃদয়সম্পন্ন নর ও নারীর অভ্যন্তরেই এ বিশ্বজগতের সমস্ত সৃষ্টি ধারণকৃত।

"আউলিয়া-দরবেশ হতে পারেন ভালো ও মন্দ,
কেউ সে রকম না হলে, দরবেশ নয়, ভণ্ড।"

একবার আপনি পূর্ণতাপ্রাপ্ত (কামেল ওয়াল মোকাম্মেল) ওই সত্তাকে দেখে ফেল্লে নিশ্চিতভাবে সমগ্র বিশ্বজগতকে দেখে ফেলেছেন। এরপর যে কাউকেই দেখেন না কেন, তা স্রেফ এক পুনরাবৃত্তি। ওই ব্যক্তির ভাষণ

পূর্ণতাপ্রাপ্ত জনের বাণীতে ধারণকৃত। একবার তাঁদের (সূফী-দরবেশদের) বাণী আপনি শুনে থাকলে আপনার শ্রুত তৎপরবর্তী প্রতিটি কথাই একেকটি প্রতিধ্বনি মাত্র।

যে ব্যক্তি যে কোনো জায়গায় ওই ধরনের কাউকে (মানে দরবেশকে) দেখে থাকলে সকল মানব-মানবী, স্থান-কাল-পাত্রকেই দেখে ফেলেছেন। কবি যেমনটি বলেন:

"আপনি প্রকৃতই খোদায়ী আদিরূপের প্রতিলিপি,
সূর্যের আপন সৌন্দর্যের প্রভা প্রতিফলিত হয় যে কাঁচে, আপনি সেটি,
ভেতরে বা বাইরে যেখানেই থাকুক ওই প্রভার উপস্থিতি,
সমস্ত আকাঙ্ক্ষা মঞ্জুর করে তা ঘোষণা করে, 'এ-ই আমি'।

## উপদেশ বাণী - ১৭

রোমের (কোনিয়া'র) আমীর (রাজ্য শাসক) বলেন: "(মক্কার) কাফের গোষ্ঠী তাদের মূর্তিদের পূজা করতো এবং সেগুলোকে সেজদা করতো। আর এখন আমরা একই কাজ করছি। আমরা মংগলদের কাছে ধরনা দিচ্ছি এবং তাদের সামনে নতজানু হচ্ছি, অথচ নিজেদেরকে আবার আমরা মুসলমান-ও বিবেচনা করছি!"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: কিন্তু এখানে পার্থক্য বিদ্যমান; আপনার দৃষ্টিতে এই আচরণটি মন্দ ও সম্পূর্ণভাবে ঘৃণিত। আপনার অন্তরের চোখে এমন অতুলনীয় মহত্তর কোনো কিছু ধরা পড়েছে যা এই আচরণকে গর্হিত ও কদাকার হিসেবে প্রতীয়মান করছে। ঈষৎ লোনা জল তার আপন লবণাক্ততা সেই ব্যক্তির কাছেই সুস্পষ্ট করে তোলে, যিনি মিষ্ট পানির স্বাদ গ্রহণ করেছেন; আর বিভিন্ন বিষয়ের বিপরীত বিষয়গুলো দ্বারাই সেগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অতএব, খোদাতা'লা রূহ তথা আত্মার মাঝে ঈমানদারির নূর (জ্যোতি) প্রোথিত করেছেন যার দরুন (ওপরোক্ত) ওই সব বিষয় গর্হিত হিসেবে (চোখে) ধরা পড়ে। সৌন্দর্যের মোকাবেলায় ওগুলো কুৎসিত বলেই দৃশ্যমান হয়। অথচ অন্যান্যরা (মানে অবিশ্বাসীরা) এভাবে প্রভাবিত হয়



না, বরং তারা তাদের বিরাজমান অবস্থায় সম্পূর্ণ খুশি থাকে এই বলে - "এ একেবারেই চমৎকার (অবস্থা)।"

আল্লাহতা'লা আপনার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন; আপনার অভিলাষ আপনারই ধরা-ছোঁয়ায় চলে আসবে। "পাখি উড়ে ডানায় ভর করে, ঈমানদারবৃন্দ উড়েন তাঁদের আকাঙ্ক্ষার পাখায় চড়ে।"

সৃষ্টি তিন ধরনের। প্রথমতঃ ফেরেশতাকুল, যাঁরা হলেন খাঁটি বিবেকসম্পন্ন আত্মা। আল্লাহ পাকের এবাদত-বন্দেগী, খেদমত ও যিকর-ই তাঁদের প্রকৃতি ও খোরাক। তাঁরা ওই মৌলিক স্বভাবের ওপর টিকে আছেন। মাছ যেমন পানিতে বাঁচে, তেমনি তাঁদেরও ফরাশ ও বালিশ হলো পানি। তাঁরা কামনা-বাসনা হতে মুক্ত ও নির্মল। এমতাবস্থায় তাঁরা এ ধরনের কামনা-বাসনার প্রতি সমর্পিত না হয়ে কোন্ নেয়ামত-বরকত লাভ করে থাকেন? যেহেতু তাঁরা এধরনের বিষয় থেকে মুক্ত, সেহেতু এগুলোর বিরুদ্ধে তাঁদেরকে সংগ্রাম করতে হয় না। তাঁরা যদি খোদার ইচ্ছাকে মান্য করেন, তাহলে এটিকে আনুগত্য হিসেবে গণ্য করা যায় না; কেননা এ তো তাঁদেরই প্রকৃতি, এর ব্যতিক্রম তাঁরা করতেই পারেন না।

দ্বিতীয় কিসিম হলো জন্তু-জানোয়ার, যারা স্রেফ ভোগবাদী, আর যাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নেই কোনো বিবেকসম্পন্ন আত্মা। ফলে তাদের ঘাড়েও কোনো দায়-দায়িত্বের বোঝা নেই।

সর্বশেষে রয়েছে বেচারা মনুষ্য জাতি, যারা বিবেকসম্পন্ন আত্মা ও ইন্দ্রিয়পরবশ সত্তার সমষ্টি। আমরা অর্ধ ফেরেশতা, অর্ধ পশু। অর্ধ সাপ, অর্ধ মৎস্য। মাছটি আমাদেরকে জলের কাছে টেনে নিয়ে যায়, আর সাপটি দুনিয়ার দিকে। আমরা তাই সর্বদা যুদ্ধরত। আমাদের বিবেকসম্পন্ন আত্মা আপন ভোগবিলাসী সত্তার ওপর বিজয়ী হলে আমরা ফেরেশতাকুলের চেয়েও উচ্চমর্যাদার আসনে আসীন হই। আর এর উল্টো হলে আমরা পশুর চেয়েও নিচে নেমে যাই।

"ফেরেশতাকুল জ্ঞান দ্বারা পান পরিত্রাণ,
পশু মূর্খতায় পায় প্রাণ,
আর এ দুইয়ের মাঝে সংগ্রামরত দুনিয়াবাসীর জান।"

অতঃপর অনেকে নিজেদের বিবেকসম্পন্ন আত্মাকে এমন বিশ্বস্ততার সাথে অনুসরণ করেছেন যে তাঁরা পরিপূর্ণ ফেরেশতা ও খাঁটি নূর তথা জ্যোতিতে পরিণত হয়েছেন। এঁরাই হলেন আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া-দরবেশ (রহ:)। তাঁরা শঙ্কা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা হতে একদম মুক্ত। অপরদিকে, কারো কারো মধ্যে ভোগবিলাস তাদের বিবেকসম্পন্ন আত্মাকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যে তারা পশুর পর্যায়ে নেমে গিয়েছে। এছাড়া রয়েছেন সে সমস্ত সত্তা যাঁরা সংগ্রামরত। এই শেষোক্ত শ্রেণির মানুষ নিজেদের মধ্যে অনুভব করেন এক ধরনের বেদনা ও হাহাকার এবং বিচ্ছেদ-ও। তাঁরা তাঁদের জীবন নিয়ে মোটেও সন্তুষ্ট নন। এঁরা হলেন ঈমানদারবৃন্দ। আউলিয়া-দরবেশমণ্ডলী যেমন তাঁদেরকে (ঈমানদারবৃন্দকে) তাঁদের মকামে (মর্যাদায়) প্রতিষ্ঠা করার, তাঁদেরকে নিজেদেরই (আউলিয়াবৃন্দেরই) মতো সত্তায় পরিণত করার জন্যে রয়েছেন অপেক্ষারত, তেমনি শয়তানের দল-ও তাঁদেরকে নিকৃষ্টদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট বানানোর ধান্ধায় রয়েছে অপেক্ষমান।

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, এবং আপনি (হে রাসূল) মানুষদেরকে দেখতে পাবেন আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করছে, তখন আপন রব্বের প্রশংসাকারী অবস্থায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চান (দ্বীনে দাখিল মানুষদের জন্যে), নিশ্চয় আল্লাহতা'লা তওবা কবূলকারী।" [সূরা নসর]

তাফসীরবিদ উলামাবৃন্দ আল-কুরআনের এই সূরাটির একটি বাহ্যিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা নিম্নরূপ: রাসূলুল্লাহ (দ:) স্বপ্ন দেখতেন এই মর্মে - "আমি সারা বিশ্বকে মুসলমান বানাবো এবং তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় নিয়ে আসবো।" কিন্তু তিনি যখন বেসালপ্রাপ্তি সন্নিকটে দেখতে পান, তখন দুঃখ করে বলেন, "আহা, আমি কি সমস্ত মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় ডাকার জন্যে এ জীবনে আবির্ভূত হইনি?" আল্লাহতা'লা উত্তর দেন, "(হে রাসূল) আফসোস করবেন না। আপনার বেসালপ্রাপ্তির সন্ধিক্ষণে শহর ও প্রদেশ যেগুলো আপনি সৈন্যবাহিনী ও তরবারি দিয়ে (হয়তো) জয় করতেন, সেগুলোর প্রতিটিকে আমি আনুগত্য ও ঈমানদারির অধীনে নিয়ে আসবো, আর তা কোনো সেনাবাহিনী ছাড়াই আনবো। এর চিহ্ন প্রকাশ পাবে শেষ সময়ে, যখন আপনি বেসাল পেতে থাকবেন; আপনি দেখতে



পাবেন মানুষেরা দলে দলে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। এই চিহ্ন প্রকাশ পাবার পর জেনে রাখবেন আপনার বেসালপ্রাপ্তির সময় উপস্থিত। এমতাবস্থায় আপন প্রভুর প্রশংসা করবেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবেন (মানে দলে দলে দ্বীনে দাখিল ওই সমস্ত উম্মতের জন্যে শাফায়াত করবেন)।"

তবে এই সূরার একটি অভ্যন্তরীণ অর্থও বিদ্যমান: মানুষেরা মনে করে থাকে তারা বড় ধরনের চেষ্টা ও সংগ্রামের দ্বারা মন্দকে বিতাড়ন করতে সক্ষম। তাদের সকল চেষ্টা ও সাধনাশেষে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ব্যর্থ হলে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাদেরকে বলেন, "তোমরা মনে করেছিলে এই লক্ষ্য তোমরা নিজেদের শক্তি, সাধনা ও কর্ম দ্বারা অর্জন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু আমি যে (ঐশী) বিধান জারি করেছি তা হলো: তোমাদের আয়ত্তাধীন যা কিছু আছে, তা আমার রাস্তায় ব্যয় করো। তাহলেই আমার করুণা অবতীর্ণ হবে।

"তোমাদের যে দুর্বল হাত ও পা আছে, তা-ই দিয়ে এই অন্তহীন রাস্তায় তোমরা সফর করতে বাধ্য থাকবে। আমি ভালো করেই জানি, তোমাদের দুর্বল পা নিয়ে তোমরা এই (দীর্ঘ) যাত্রা কোনোক্রমেই সম্পন্ন করতে পারবে না। বস্তুতঃ এই সফরের স্রেফ একটিমাত্র পর্যায়-ও তোমরা এক লক্ষ বছরে অর্জন করতে পারবে না। কিন্তু তোমরা যখন সামনে অগ্রসর হওয়ার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ভেঙ্গে পড়বে, তখন আমার স্নেহময় ফুৎকার তোমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। একটি দুধের বাচ্চাকে যেমনটি কোলে তুলে নেয়া হয় কিন্তু বড় হলে তাকে হাঁটার জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়, এক্ষণে তোমাদের ক্ষমতা ও সামর্থ্য যখন লোপ পেয়েছে, আর তোমাদের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে, তখন আমার দয়া ও অনুগ্রহ, দান ও ভালোবাসা তেমনি লক্ষ্য করো। এক লক্ষবার সাধনা করলেও তোমরা এই রকম (খোদায়ী) আশীর্বাদের এমন কী এক অণুকণা পরিমাণ-ও প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে না।

আমি (মওলানা রূমী) দুনিয়াবী তথা পার্থিব বিষয়াদির খাতিরে আমীরকে পছন্দ বা তোয়াজ করি না, তাঁর পদবী, জ্ঞান বা অর্জনের খাতিরেও নয়। অন্যান্যরা ওইসব কারণে তাঁকে পছন্দ করে থাকতে পারে, তবে তা তাঁর চেহারা দেখে নয়, বরং শুধু তাঁর পিঠ দর্শন করেই। আমীর হলেন আয়নাসদৃশ, যার পৃষ্ঠদেশে খোদাইকৃত রয়েছে দামী মুক্তো ও স্বর্ণখচিত

কারুকাজ বা নকশা। যারা সোনা ও মুক্তো পছন্দ করে, তারা আয়নার পৃষ্ঠদেশের দিকে তাকায়; কিন্তু যাঁরা খোদ জীবনকে ভালোবাসেন, তাঁরা দর্পণটির দিকে তাকান এবং ওর খাতিরেই ওকে ভালোবাসেন। তাঁরা যে অনিন্দ্য সৌন্দর্য দেখতে পান, তাতে তাঁরা হাঁপিয়ে ওঠেন না। কিন্তু যাদের চেহারা কলঙ্কপূর্ণ হওয়ায় বিকৃত, তারা আরশিতে কেবল কুৎসিত চেহারা-ই দেখতে পায়। তারা তাড়াতাড়ি আয়নাকে ঘুরিয়ে ওইসব মূল্যবান পাথরের খোঁজ করে। তবু দর্পণটির চেহারায় কী-ই বা ক্ষতি হতে পারে, যদি তার পিঠে এক হাজার ধরনের কারুকাজ ও মূল্যবান পাথরখচিত হয়?

"বিভিন্ন বিষয়ের বিপরীত বিষয়গুলো দ্বারাই সেগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।"

কোনো বস্তুকে তার বিপরীত বস্তু ছাড়া জানা একেবারেই অসম্ভব। তবু আল্লাহ পাকের কোনো বিপরীত নেই। তিনি এরশাদ করেন, "আমি ছিলাম রহস্যের গুপ্ত ধনভাণ্ডার, অতঃপর প্রকাশ হতে চাইলাম।" তাই তিনি এই অন্ধকার জগৎ সৃষ্টি করেন যাতে তাঁরই নূর তথা জ্যোতি দৃশ্যমান হয়। একইভাবে তিনি তাঁর আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া (রহ:)-বৃন্দকে প্রকাশ করেন এ কথা বলে, "আমার বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আমারই সৃষ্টিজগতে গমন করুন।" তাঁরা হলেন খোদায়ী নূরের প্রকাশস্থল, যেখানে মিত্রকে শত্রুর থেকে আলাদাভাবে চেনা যায়, আর ভাইকে অপরিচিতের কাছ থেকে পৃথক করা যায়। আউলিয়া-দরবেশদের সংগ্রাম-সাধনা খোদাতা'লার বিপরীতকে প্রকাশ করে দেয়, যদিও তাঁর কোনো বিপরীত নেই। হয়রানি ও বিরোধিতার মাধ্যমেই আউলিয়া কেরাম পরিচিতি লাভ করেন এবং শ্রদ্ধার পাত্র হন।

"আল্লাহর নূরকে অবিশ্বাসীরা কথায় নিভিয়ে দিতে সর্বদা চেষ্টারত,
কিন্তু বিরোধিতার মুখেই আল্লাহ আপন নূরের পূর্ণতা দেন সতত।"

আল্লাহতা'লা কিছু মানুষকে ধনসম্পদ, সোনাদানা ও শাসনকর্তৃত্বভারের শাস্তি দ্বারা পরিশুদ্ধ করেন, কেননা ওই অর্থবিত্ত হতে রূহ (আত্মা) দূরে সরে যায়। হযরত শামস-এ-তাবরিয (মওলানার পীর) একবার আরবদেশের এক রাজাকে দেখতে পান যাঁর ভ্রূর ওপর আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া (রহ:)-বৃন্দের নূর জ্বলজ্বল করছিল। হযরত শামস (রহ:) বলেন, "আল্লাহর কী মহিমা, তিনি বিত্তবৈভবের শাস্তি দ্বারা তাঁরই বান্দাদের পরিশুদ্ধ করেন!"



## উপদেশ বাণী - ১৮

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) বলেন: "ইবনে মুক্বরী শুদ্ধভাবে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করেন।"

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: হ্যাঁ, সে কুরআন মজীদের (বাহ্যিক) পঠন রীতি অনুযায়ী শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করে ঠিকই, তবে এর (অন্তর্নিহিত) অর্থ সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। এই বাস্তবতার প্রমাণ তখনই মেলে, যখন তাকে এর অর্থ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় আর সে জবাব দিতে পারে না। সে অন্ধের মতো তেলাওয়াত করে। সে এমন এক ব্যক্তির মতো, যে তার হাতে লোমশ জন্তুর একখানি পুরোনো ছেঁড়া চামড়া ধরে রেখেছে; তাকে আরো নতুন, মসৃন চামড়া দেয়ার কথা বলা হলেও সে তা ফিরিয়ে দিচ্ছে। অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি সে (ইবনে মুক্বরী) লোমশ জন্তুর চামড়া কী জিনিস তা-ই জানে না। কেউ তাকে এসে বল্লো এটি-ই লোমশ জন্তুর চামড়া, আর সে তৎক্ষণাৎ একে অন্ধভাবে তা-ই মনে করে বসে।

এ যেন শিশুদের আখরোট নিয়ে খেলা করার মতো কোনো ব্যাপার। তাদেরকে খোদ ওই আখরোট দিতে চান, কিংবা ওর তেল, (দেখবেন) অমনি তারা তা ফিরিয়ে দিয়ে বলবে, "আখরোট হচ্ছে যেটি আমরা টেবিলে ঘুরাই। এটি তো ঘুরে না।" আল্লাহ পাকের ধনভাণ্ডার অনেক, আর জ্ঞান-প্রজ্ঞাও অনেক। সে (ইবনে মুক্বরী) জ্ঞানের ভিত্তিতে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করে থাকলে কেন অপর (মানে অন্তর্নিহিত) চিরন্তন কুরআন (-এর বাণী) প্রত্যাখ্যান করে?

একবার আমি জনৈক কুরআন-শিক্ষকের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলাম এ কথা: (দেখুন) কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে, "আমার প্রভুর বাণী (লেখা)'র জন্যে যদি সাগরের পানি কলমের কালি হতো, তবে সাগর নিঃশেষ হয়ে যেতো কিন্তু প্রভুর বাণী ফুরাতো না" (ভাবানুবাদ)। এখন, কালি পরিমাপের পঞ্চাশটি একক দ্বারা যে কেউ গোটা কুরআন মজীদ নকল

করতে পারেন। অতএব, আল-কুরআন হলো খোদাতা'লার জ্ঞান ও তাঁরই মালিকানাধীন সকল জ্ঞানের কেবল-ই একটি চিহ্ন বা প্রতীক।

কোনো ওষুধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা একখানি কাগজে এক চিমটে ওষুধ রাখেন। আপনি এ কথা বলবেন না, "ওষুধ প্রস্তুতকারকের দোকানের সব কিছুই ওই কাগজে বিদ্যমান।" তা বলা বেকুবি হবে। বস্তুতঃ সর্ব-হযরত মূসা (আ:), ঈসা (আ:) ও অন্যান্য পয়গম্বর (আ:)-বৃন্দের সময়েও কুরআন মজীদের অস্তিত্ব ছিল। আল্লাহর কালাম তথা বাণীর অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তা আরবী ছিল না। কুরআন-শিক্ষকের কাছে আমি এভাবেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলাম, কিন্তু তাতে (তাঁর মনের মধ্যে) কোনো ছাপ না পড়ায় আমি তাঁকে যেতে দেই।

বর্ণিত আছে যে মহানবী (দ:)-এর যুগে কেউ একটি বা আধখানা সূরা মুখস্থ জানলেই বিজ্ঞ বলে আখ্যায়িত হতেন এবং তাঁকে দেখিয়ে বলা হতো, "ইনি একখানা সূরা মুখস্থ জানেন।" কেননা, ওই জমানায় তাঁরা কুরআন মজীদকে গোগ্রাসে গিলতেন। এক বা দুই টুকরো রুটি গোগ্রাসে গেলা অবশ্যই একটি বড় অর্জন। কিন্তু যে সব মানুষ না চিবিয়ে রুটি মুখে পুরে এবং আবার উগলে ফেলে, তারা ওইভাবে সহস্র সহস্র টন গোগ্রাসে গিলতে সক্ষম।

তবু এটি একটি ভালো বিষয়। আল্লাহতা'লা কিছু লোকের চোখগুলোতে মোহর মেরে দিয়েছেন যাতে তারা এই বর্তমান জগতকে আবাদ করতে পারে। যদি পরকালের ব্যাপারে কেউই অন্ধ না হতো, তাহলে এই জগতটি শূন্যতায় ভরে যেতো। এই অন্ধত্ব-ই সংস্কৃতি ও প্রগতি ত্বরান্বিত করে থাকে। শিশুদের কথাই ধরুন, তারা বেপরোয়াভাবে বেড়ে ওঠে এবং লম্বা হয়, কিন্তু যখন বিচার-বুদ্ধিতে তারা পরিণত হয়, তৎক্ষণাৎ তাদের বেড়ে ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। অতএব, সভ্যতার কারণ হচ্ছে অন্ধত্ব, আর ধ্বংসের কারণ দৃষ্টিশক্তি।

আমি যা বলছি তা দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি দ্বারা প্রণোদিত: হয় আমি ঈর্ষার দরুন এ কথা বলছি, নতুবা করুণাহেতু। ঈর্ষা হতে আল্লাহ মাফ করুন! যাঁরা ঈর্ষা পাওয়ার যোগ্য তাঁদেরকে তা করাও আহাম্মকি; এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি ঈর্ষা পাওয়ার যোগ্য নয়, তাকে কীভাবে তা করা



যায়? না, আমি মহা করুণার দরুন এ কথা বলছি, কেননা আমি আপনাদেরকে (ঐশী বাণীর) প্রকৃত অর্থের দিকে আকৃষ্ট করতে চাই।

এক হজ্জযাত্রীর কাহিনী হলো, তিনি পথ চলতে পানির তেষ্টায় মরুভূমিতে পড়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি কিছুটুকু দূরে একটি ছোট ও ছেঁড়া তাঁবু দেখতে পান। অনেক কষ্টে নিজেকে টেনে সেখানে পৌঁছে এক যুবতীকে দেখে তিনি চিৎকার করে বলেন, "আমি মেহমান! আমি আমার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছি!"

এ কথা বলে তিনি বসে পড়েন এবং পানি পান করতে চান। যুবতী পানি নিয়ে আসে, যা আগুনের চেয়েও গরম ছিল এবং লবণের চেয়েও বেশি লোনা। ঠোঁট হতে গলা পর্যন্ত শরীরের সমস্ত অংশ-ই এটি পুড়িয়ে দেয়। ওই হজ্জযাত্রী সীমাহীন অনুগ্রহের নিদর্শন হিসেবে যুবতীকে বলেন:

"মা, তুমি আমাকে যে স্বস্তি দিয়েছো, তার জন্যে আমি তোমার কাছে ঋণী। আমার মধ্যে অনুগ্রহ উথলে ওঠেছে। আমি যা বলি, তা মন দিয়ে শোনো। দেখো, বাগদাদ কাছে ধারেই আছে, আরো আছে কুফা, ওয়াসিত এবং বাকি সব নগরী। সেসব জায়গায় তুমি অনেক মিষ্ট স্বাদের শীতল জল পাবে; এছাড়াও পাবে বিভিন্ন ধরনের খাবার, গোসলখানা, আরাম-আয়েশের সমৃদ্ধ উপকরণ।" অতঃপর তিনি ওইসব শহরের আনন্দ-বিনোদনের বিস্তারিত বিবরণ দেন।

এক মুহূর্ত পরই ওই নারীর স্বামী বেদুঈন লোকটি দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়। সে বেশ কিছু মরু-ইঁদুর ধরে এনেছিল যেগুলো সে স্ত্রীকে রাঁধতে বলে। ওই মেহমানকে তারা এর মধ্যে কয়েকটি খাওয়ার জন্যে সাধে, যা মরিয়া অবস্থার কারণে তিনি খেতে বাধ্য হন। অতঃপর মধ্যরাতে মেহমান তাঁবুর বাইরে ঘুমিয়ে পড়লে যুবতী নারী তার স্বামীকে বলে:

"আমাদের মেহমান যেসব কাহিনী বলেছেন তা কি তুমি শুনেছো?" এরপর সে সমস্ত বৃত্তান্ত তার স্বামীকে খুলে বলে।

বেদুঈন লোকটি উত্তর দেয়, "এসব কাহিনীতে কর্ণপাত করো না। পৃথিবীতে অনেক ঈর্ষাপরায়ণ মানুষ আছে। তারা কাউকে আরামে ও প্রাচুর্যে জীবনযাপন করতে দেখলে ঈর্ষাবোধ করে এবং তাকে এই সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত করার অভিপ্রায়ে ভবঘুরে বানাতে চায়।"

বহু মানুষেরই এই একই অবস্থা। কেউ যখন স্রেফ অনুগ্রহবশতঃ তাদেরকে কোনো উপদেশ দেন, তারা এটিকে ঈর্ষা হিসেবে দেখে থাকে। কিন্তু যদি কারো মধ্যে (মূল) শেকড় প্রোথিত থাকে, তাহলে তারা শেষমেশ সত্যমুখি হবেই। যদি আদি প্রতিশ্রুতি দিবস (আল্লাহ যেদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? প্রিয় বান্দাবৃন্দ উত্তরে বলেছিলেন, জ্বি হ্যাঁ) হতে তাদের ওপরে এক বিন্দু-ও ছিটানো হয়ে থাকে, তাহলে চূড়ান্ত পর্যায়ে ওই এক বিন্দু-ই তাদেরকে বিভ্রান্তি ও দুঃখকষ্ট হতে মুক্তি দেবে। অতএব, এসো! কতো সময় আর তোমরা আমাদের থেকে দূরে অবস্থান করবে এবং আমাদের ব্যাপারে অপরিচিত অবস্থায় থাকবে? কতোদিন বিভ্রান্তি ও দুঃখে দিন কাটাবে? এরকম কাহিনী যেসব লোক ইতিপূর্বে শোনেনি, এমন কী তাদের শিক্ষকদের কাছেও নয়, তাদেরকে আমরা কী-ই বা বলবো? শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য যেহেতু তাদের পূর্বসূরীদের সত্তায় শোভা পায়নি, সেহেতু তারাও মহান ব্যক্তিত্বদের প্রশংসাকে সহ্য করতে পারে না।

প্রথম সাক্ষাতে সত্যের মুখোমুখি হওয়ার আকর্ষণ না থাকলেও কেউ তা যতো দীর্ঘক্ষণ অনুসরণ করে, ততোই তা মিষ্টস্বাদে পরিণত হতে থাকে। এটি সেই বাহ্যিক আকৃতির ঠিক উল্টো, যেটি প্রথম প্রথম মুগ্ধ করলেও যতো দীর্ঘক্ষণ আপনি তার সান্নিধ্যে বসে এ কথা ভাববেন যে এ-ই তো সব কিছু, ততোই আপনি হিমশীতল পরশ অনুভব করবেন। আল-কুরআনের আকারটি তারই অর্থের তুলনায় কেমন? কোনো পুরুষ অথবা নারীকে পরীক্ষা করুন: তাদের আকৃতি তাদের অর্থের তুলনায় কেমন? ওই নারী বা পুরুষের বোধশক্তি যদি বিলুপ্ত হয়, তবে আমরা তাকে আমাদের বাড়িতে এক মুহূর্তের জন্যেও মুক্তভাবে চলতে-ফিরতে দেবো না।

আমাদের শায়খ (পীর ও মোরশেদ) হযরত শামস-এ-তাবরিযী (রহ:) একবার একটি কাহিনী বর্ণনা করেন যা নিম্নরূপ: কোনো দূরবর্তী শহরের উদ্দেশ্যে একটি বিশাল কাফেলা রওয়ানা হয়েছিল। পথে তারা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছুলো, যেখানে ছিল না কোনো বসতির চিহ্ন, অথবা জল। হঠাৎ তারা একটি কুয়োর সামনে উপস্থিত হয় যা'তে কোনো বালতি-ই ছিল না। এমতাবস্থায় তারা একটি কেটলি ও কিছু দড়ি জোগাড় করে কেটলিখানি কুয়োর ভেতরে নামিয়ে দেয়। দড়িতে টেনে তোলার সময় কেটলির দড়ি ছিঁড়ে যায়। তারা এরপর আরেকটি কেটলি পাঠায়, কিন্তু তা-ও ছিঁড়ে পড়ে যায়। অতঃপর তারা কাফেলার লোকদেরকে দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে এক এক করে কুয়োর মধ্যে নামিয়ে দেয়, অথচ তারাও অদৃশ্য হয়ে যায়।



ওই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এক মহা অন্তরের মানুষ। তিনি (সবাইকে) বলেন, "আমি নিচে যাবো।" তারা তাঁকেও নিচে নামিয়ে দেয়। তিনি যখন ঠিক কুয়োর তলদেশে পৌঁছেন, তখন হঠাৎ ভয়ঙ্কর একটি কালো জন্তুর আবির্ভাব ঘটে।

ওই ব্যক্তি মনে মনে ভাবেন, "বাঁচতে তো আমি পারবো না, তবে অন্ততঃ নিজের বুদ্ধি ঠিক রেখে হুঁশ-আক্কল না হারিয়ে মোকাবেলা করি, এর ফলে কী হতে যাচ্ছে তা আমি দেখতে পাবো।"

ঠিক সে সময় কালো জন্তুটি তাকে বলে, "লম্বা কাহিনী ফেঁদে বসো না, এক্ষণে তুমি আমার বন্দী। আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দেয়া পর্যন্ত তুমি ছাড়া পাবে না। কেউই তোমাকে এখন আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।"

ওই ব্যক্তি বলেন, "প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন।"

জন্তুটি প্রশ্ন করে, "(পৃথিবীতে) সেরা স্থান কোনটি?"

বন্দী ওই ব্যক্তি ভাবেন, "আমি তো বন্দী এবং অসহায়। যদি বাগদাদ বা অন্য কোনো জায়গার নাম বলি, তাহলে হয়তো তার নিজস্ব শহরকে অপমান করতে পারি।" অতঃপর ওই ব্যক্তি উচ্চস্বরে বলেন, "সেরা জায়গা হলো সেটি, যেখানে আমরা বসবাস করতে স্বস্তি অনুভব করি। তা মাটির অভ্যন্তরে হলেও সেরা স্থান, আর ইঁদুরের গর্তে হলেও তা-ই।"

উত্তর শুনে জন্তুটি চিৎকার করে বলে, "ভালো বলেছো, খুবই ভালো বলেছো! তুমি বেঁচে গেলে। দশ লাখে একজন তুমি। এক্ষণে আমি তোমায় মুক্ত করে দিচ্ছি, আর তোমারই কল্যাণে অন্যদেরও মুক্তি দিচ্ছি। এর পর থেকে আমি আর কখনো রক্তপাত করবো না। তোমার প্রতি মহব্বতের কারণেই পৃথিবীবাসীর প্রতি আমার এই উপহার।"

অতঃপর জন্তুটি কাফেলার লোকদেরকে তাদের চাহিদা পূরণের জন্যে জলপান করতে দেয়।

এই কাহিনীর উদ্দেশ্য লুকোনো রয়েছে এর অন্তর্নিহিত অর্থে। আমরা একই অর্থ আরেকটি আকৃতিতে বর্ণনা করতে পারি, কিন্তু ঐতিহ্যবাহী আকার-আকৃতির ভক্তবৃন্দ এই সংস্করণটি-ই পছন্দ করবেন। তাদের সাথে কথা বলা (মানে বোঝানো) বেশ দুরূহ ব্যাপার। আমরা এই একই কথা আরেকটি রূপকের সাহায্যে বর্ণনা করলে তারা শুনতে রাজি হবেন না।

## উপদেশ বাণী - ১৯

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: কেউ একজন তাজউদ্দীন কুবাঈকে বলেছিলেন, "এসব ধর্মযাজক আমাদের মাঝেই বসতি করে এবং এরা মানুষকে তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস হতে বঞ্চিত করে।" তাজউদ্দীন কুবাঈ উত্তর দেন, "তারা আমাদের মাঝে বসতি করে না এবং আমাদের ধর্মবিশ্বাস কেড়েও নেয় না। আল্লাহ নিষেধ করেছেন যে তারা কখনোই আমাদের কেউ হতে পারবে না। আপনি যদি কোনো কুকুরের গলায় ফিতা বাঁধেন, তবে কি আপনি ওই ফিতার কারণে সেটিকে শিকারি কুকুর বলবেন? শিকারি কুকুর হওয়ার জন্যে সেই জানোয়ারের সুনির্দিষ্ট কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান; সোনার ফিতা পরলো, না সুতোর ফিতা, তাতে কিছু এসে যায় না।"

জুব্বা বা পাগড়ি পরার সুবাদে কেউই আলেম তথা ইসলামী পণ্ডিত হয় না। পাণ্ডিত্য আপনাআপনি-ই একটি গুণ, আর ওই গুণকে জুব্বা পরানো হোক বা না-ই হোক, তাতে কোনো পার্থক্য-ই হবে না।

বস্তুতঃ মহানবী (দ:)'র যুগে মুসলমানদেরকে ঈমানহারা করার উদ্দেশ্যে মোনাফেক চক্র নামাযের জুব্বা পরিধান করতো। তারা নিজেরাই মুসলমানদের মতো জামাকাপড় না পরলে কীভাবে মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হবে? কোনো ইহুদী বা খৃষ্টান ইসলামের সমালোচনা করলে তাদের কথা কে-ই বা শুনবে?



"দুঃখ তাদেরই জন্যে যারা সদা নামাযরত অথচ যাদের কাছে আপন প্রার্থনা-ই অশ্রুত। দুঃখ তাদেরও যারা বড় বড় প্রদর্শনী দিতে ব্যস্ত কিন্তু অপরাপরের ব্যাপারে যত্নবান হতে একেবারেই ব্যর্থ।" [ভাবানুবাদ]

কিন্তু এগুলো তো স্রেফ কথা-ই। তোমরা নূর (জ্যোতি)-এর দেখা পেয়েছো, অথচ এখনো মানবতাকেই খুঁজে পাওনি। মানবতার খোঁজ করো! সেটি-ই তোমাদের মূল উদ্দেশ্য। বাকিটুকু স্রেফ দীর্ঘসূত্রিতা। যখন কথামালা বিশদভাবে অলঙ্কৃত হয়, তখন তার উদ্দেশ্য হারিয়ে যায়।

কোনো এক তরকারি বিক্রেতা জনৈকা নারীর প্রেমে পড়েছিল; আর সে ওই মহিলার চাকরানী মারফত বার্তাও পাঠিয়েছিল। এসব বার্তায় সে উল্লেখ করে, "আমি এরকম, আমি ওরকম। আমি ভালোবাসি, আমি আগুনে জ্বলছি। আমি কোনো শান্তি পাচ্ছি না। আমার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা হচ্ছে। গতকাল আমি ছিলাম এরকম। গত রাতে আমার এই এই ঘটেছে।" আর সে লম্বা লম্বা কাহিনীও বর্ণনা করতে থাকে।

চাকরানী তার মালিকার উপস্থিতিতে এসে তাকে সম্বোধন করে এভাবে:

"তরকারি বিক্রেতা আপনাকে সালাম জানিয়েছে এবং বলেছে, 'আসুন, যাতে আমি আপনার প্রতি এই এই (আচরণ) করতে পারি'।"

মহিলা জিজ্ঞেস করে, "এতো শীতলভাবে (বল্লো)?"

চাকরানী উত্তর দিলো, "সে বিস্তারিত অনেক কিছু বলেছিল, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল এইটি-ই।"

উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো বিষয়ের মূল বা শেকড়; বাকি যা আছে, তার সব-ই স্রেফ এক মাথাব্যথা।

## উপদেশ বাণী - ২০

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: রাত-দিন নারীর চরিত্র সংশোধন প্রয়াসে তুমি সংগ্রামরত, তাদের অশুচিতা পরিশুদ্ধ করার এবং দোষত্রুটি শুধরানোর জন্যে চেষ্টারত। তবে তোমার মাধ্যমে তাদেরকে সংশোধনের চেষ্টার চেয়ে তাদের মাধ্যমে তোমার নিজের সত্তাকে পরিশুদ্ধ করার প্রয়াস

শ্রেয়তর হবে। তাদের দ্বারা তুমি নিজেকে সংশোধন করো। তাদের কাছে যাও এবং তারা যা-ই কিছু বলে, তা গ্রহণ করো; এমন কী তাদের কথা তোমার দৃষ্টিকোণ হতে উদ্ভট ও অন্যায্য মনে হলেও তা গ্রহণ করো।

এই সত্যের আলোকেই মহানবী (দ:) এরশাদ করেন, "লা রাহবানিইয়্যাতা ফীল ইসলাম", মানে দ্বীন ইসলামে বৈরাগ্য নেই। বৈরাগী পুরোহিতদের পন্থা হচ্ছে একাকিত্ব, পাহাড়ে নারী-সঙ্গ ছাড়াই বসবাস, আর এই দুনিয়াকে বর্জন। কিন্তু আল্লাহতা'লা রাসূলুল্লাহ (দ:)'কে একটি সোজা ও গোপন পথ প্রদর্শন করেছেন। ওই পথটি কী? তা হলো বিয়ে, যাতে আমরা নারীকুলের সাথে বসবাসের পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করে টিকতে পারি, আর তাদের দাবিগুলো মেটাতেও পারি; অধিকন্তু, আমাদের ওপর দিয়ে তাদের জুতোপরা ঘোড়া ছুটোনোকেও সহ্য করতে পারি এবং এ উপায়ে আমাদের নিজেদের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হই।

তোমার স্ত্রীর জুলূম-অত্যাচার সহ্য করার মধ্য দিয়ে যেন তুমি নিজেরই অশুচিতা তাদের গায়ে ঘষে অপসারণ করে থাকো। তোমার চরিত্র ধৈর্যশীলতার মাধ্যমে উত্তমরূপ পরিগ্রহ করে; আর তাদের চরিত্র উদ্ধত আচরণ ও আগ্রাসী ভূমিকার দ্বারা মন্দ আকার ধারণ করে। তুমি একবার যখন এটি উপলব্ধি করতে পারবে, তৎক্ষণাৎ তোমার সত্তাকে পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হবে। জেনে রেখো, তারা বস্ত্রের মতো; তাদের আবরণের মধ্যে তুমি তোমারই অপবিত্রতা হতে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে এবং পরিশুদ্ধ হবে।

অহঙ্কার, ঈর্ষা ও হিংসা-বিদ্বেষকে তোমার নিজের সত্তা হতে দূর করো, যতোক্ষণ না তুমি সংগ্রাম ও ধৈর্যশীলতার মাঝে আনন্দের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করো। তাদের চাহিদার মাধ্যমে আপন আধ্যাত্মিক আনন্দ খুঁজে পাও! এরপর হতে তুমি এ জাতীয় সর্বপ্রকারের সংগ্রাম সহ্য করতে সক্ষম হবে, আর নির্যাতন-নিপীড়ন হতেও পলায়মান হবে না। কেননা, তাতে নিহিত কল্যাণ ও সুবিধাগুলো তুমি তখন দেখতে পাবে।

বর্ণিত আছে যে এক রাতে মহানবী (দ:) তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-বৃন্দকে সাথে নিয়ে কোনো এক জ্বেহাদ হতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তিনি তাঁদেরকে দফ (এক প্রকার ঢোল) বাজিয়ে এ কথা ঘোষণা করতে বল্লেন, "আজ রাতে আমরা এ শহরের দ্বারে (তাঁবু ফেলে) ঘুমোবো এবং



আগামীকাল শহরে প্রবেশ করবো।" সাহাবা (রা:)-মণ্ডলী জিজ্ঞেস করলেন, "এয়া রাসূলুল্লাহ (দ:), আমরা কেন অবিলম্বে বাড়ি ফিরতে পারবো না?" তিনি উত্তর দিলেন, "তোমরা (কেউ কেউ) হয়তো (বাড়ি ফিরে) তোমাদের স্ত্রীদেরকে অপরিচিত পুরুষের সাথে বিছানায় শায়িত দেখতে পাবে। এমতাবস্থায় তোমরা আঘাত পাবে, আর একটি (পারিবারিক) অশান্তিরও জন্ম হবে।" এই ঘোষণা জনৈক সাহাবী (রা:) শুনতে পাননি; তিনি ফিরে গিয়ে ঘরে প্রবেশ করে তাঁর স্ত্রীকে অপরিচিত এক লোকের সাথে দেখতে পান।

অতএব, রাসূলে খোদা (দ:)'র পথ (তরীকা) অনুযায়ী, আমাদের স্বার্থপরতা, হিংসা-বিদ্বেষ ও অহঙ্কার দূরীকরণের খাতিরে দুঃখকষ্ট সহ্য করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের স্ত্রীদের অসংযত কামনা-বাসনা আমাদেরই ওপর চাপিয়ে দেয়ার দুঃখ সহ্য করা, অন্যায্য বোঝা বহনের কষ্ট স্বীকার করা এবং আরো এক লাখ সীমাছাড়া দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার দ্বারা আধ্যাত্মিক পথটি যাতে পরিষ্কার ও কণ্টকমুক্ত হয়, সে চেষ্টা করা জরুরি। পয়গম্বর ঈসা (আ:)-এর তরীকা ছিল একাকিত্বের সাথে সংগ্রাম এবং কামভাব চরিতার্থ না করা। অপরদিকে, মহানবী (দ:)-এর তরীকা হচ্ছে নারী ও পুরুষ কর্তৃক একে অপরের প্রতি চাপানো নির্যাতন-নিপীড়ন ও দুঃখকষ্ট সহ্য করা। তুমি যদি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর পদ্ধতিটি অনুশীলন করতে না পারো, তাহলে অন্তত পয়গম্বর ঈসা (আ:) যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন (অর্থাৎ, বৈরাগ্য), তা গ্রহণ করো। এতে তুমি আধ্যাত্মিক পথটি হতে পুরোপুরিভাবে ছিটকে পড়ে থাকবে না।

এক শটি আঘাতে নিহিত সুফল দর্শন করে তা সহ্য করার মতো প্রশান্তি যদি তোমার থাকে, অথবা তোমার অন্তরের গভীরে যদি এ কথা বিশ্বাস করো যে "এসব দুঃখ-কষ্টে এক্ষণে কোনো সুফল না দেখলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে আমি রত্নভাণ্ডারে পৌঁছুবোই", তাহলে তুমি রত্নভাণ্ডারে ঠিকই পৌঁছুবে; আর হ্যাঁ, তুমি যা কামনা ও আশা করেছিলে, তার চেয়েও বেশি পাবে।

এসব কথা (উপদেশ বাণী) বর্তমানে তোমার ওপর প্রভাব না ফেল্লেও তুমি যখন আরো পরিণত হবে, তখন এগুলো বড় ধরনের প্রভাব

ফেলবে। এটি-ই হলো তোমার দ্বারা আপন স্ত্রীর সাথে আলাপ ও তোমার বন্ধুর সাথে আলাপের মধ্যকার পার্থক্য। তোমার বন্ধুর সাথে আলাপকালে তারা একই রকম থাকে এবং তুমি যা-ই বলো না কেন, তারা তাদের অভ্যেস বা আচরণ পরিবর্তন করে না। তোমার কথা তাদের ওপর প্রভাব ফেলে না, বরঞ্চ তারা আরো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ, এক টুকরো রুটি নিয়ে তোমার বাহুর আড়ালে লুকিয়ে রাখো এবং কাউকে দিতে অস্বীকৃতি জানাও এ কথা বলে, "আমি এটি কাউকেই দেবো না। দেয়া তো দূরে, কাউকে দেখাবোও না।" ওই রুটির টুকরো যদি ফেলে দেয়াও হয়ে থাকে এবং কুকুরের দল তা না খায়, যেহেতু রুটির পরিমাণ প্রচুর ও সস্তা, তথাপিও তুমি তা যে মুহূর্তে দিতে অস্বীকৃতি জানাবে তৎক্ষণাৎ সবাই এর পিছু নেবে এবং নিজ নিজ অন্তরকে এরই প্রতি নিবদ্ধ করবে এই অনুনয়বিনয় ও প্রতিবাদ সহকারে, "তুমি যে রুটি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছো এবং লুকোচ্ছো, তা আমরা দেখতে চাই।" বিশেষ করে তুমি ওই রুটির টুকরো বণ্টন করবে না বা দেখাবেও না, জোরালোভাবে এ কথা বলে তা এক বছর লুকিয়ে রাখলে ওই রুটির জন্যে তাদের আগ্রহ সকল সীমা ছাড়িয়ে যাবে। কেননা, মানুষকে যা দেয়া না হয়, তার জন্যে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বেশি রয়।"

অপরদিকে, তোমার স্ত্রীকে তুমি যতোবার বলো, "নিজেকে তুমি লুকিয়ে রাখো", ততোই তাদের নিজেকে প্রদর্শনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অথচ তাদের লুকোনোর দরুন পুরুষেরা নারীদের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। অতঃপর তুমি রয়েছো মাঝখানে উপবিষ্ট, উভয় জাতির মধ্যে (পারস্পরিক) আগ্রহ করে চলেছো বৃদ্ধি, আর তুমি কি না নিজেকে ভাবছো একজন সংস্কারক হিসেবে! এটি যে দুর্নীতিরই নির্যাস! তাদের মধ্যে যদি মন্দ কাজ বা পাপ না করার প্রকৃতিগত গুণ বিদ্যমান থাকে, তবে তুমি তাদের বাধা দাও বা না-ই দাও, তারা নিজেদের উত্তম মন-মানসিকতা ও নিখুঁত গঠন অনুযায়ী অগ্রসর হবেই। অতএব, নিশ্চিত হও এবং উদ্বিগ্ন হয়ো না! পক্ষান্তরে, তারা যদি এর বিপরীত হয়, তাহলেও তারা তাদের আপন রাস্তায় যাবে; তাদের থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা বাস্তবিকপক্ষে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছু করে না।



কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) বলেন: "আমরা কিছু মানুষকে বলতে শুনেছি, 'আমরা শামস-এ-তাবরিয (রহ:)-কে দেখেছি, সত্যি তাঁকে দেখেছি'।"

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: নির্বোধের দল, তারা তাঁকে কোথায় দেখেছে? তোমরা কি সেসব ব্যক্তির কথা মেনে নেবে যারা নিজেদের বাড়ির ছাদে কোনো উট-ই দেখতে পায় না, অথচ এসে (তোমাদের) বলে, "আমি মাঠে একটি সুচ পেয়ে (তাতে) সুতো ঢুকিয়েছি।" সেটি একটি সুন্দর গল্প (ফাঁদা হবে), যেমনটি এক ব্যক্তি বলেছিল, "দুটি বিষয় আমাকে বেশ হাসায় - কোনো কৃষ্ণকায় লোকের দ্বারা নিজের নখে কালো রং দেয়া, এবং কোনো অন্ধ লোকের দ্বারা নিজের মাথা জানালার বাইরে বের করা।" (পূর্বোক্ত) ওই সব ব্যক্তি ঠিক এদের মতোই। তারা আত্মাতে অন্ধ লোক যারা দেহের জানালা দিয়ে নিজেদের মাথা বের করে রেখেছে। তারা কী-ই বা দেখতে পাবে? তাদের অনুমোদন বা অননুমোদনের মূল্য-ই বা কতোটুকু?

প্রথমে অর্জন করা প্রয়োজন অন্তর্চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি। এরপরই কেউ দেখতে সক্ষম হবে। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি সত্ত্বেও কীভাবে কেউ গোপন বা লুকোনো বস্তু দেখতে পাবে? এ জগতে এমন অনেক সূফী-দরবেশ আছেন যাঁরা খোদার সাথে মিলনপ্রাপ্ত; এছাড়া আরো বুযূর্গানে দ্বীন আছেন যাঁরা এরও ঊর্ধ্বে অবস্থান করছেন, যাঁদেরকে খোদাতা'লার চাদরের নিচে বা পর্দার অন্তরালে অবস্থানকারী বলা হয়। প্রথমোক্ত দরবেশবৃন্দ বিনীতভাবে আরয করছেন, "হে প্রভু, আপনার চাদরের নিচে/পর্দার অন্তরালে অবস্থানকারী কাউকে আমাদের সামনে প্রদর্শন করুন।" কিন্তু লোকালয় চষে বেড়ানো নিজের বড়াইকারী ওপরোক্ত ওইসব লোক নিজেদের বড়াইকৃত লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না, সেটি দেখতেও পায় না। কেউ খোদাতা'লার চাদরের নিচে/পর্দার অন্তরালে অবস্থানকারী আউলিয়া-দরবেশদের কীভাবে দেখতে বা জানতে সক্ষম হবে, যদি তাঁরা স্বেচ্ছায় না দেখা দেন?

এটি কোনো সহজ বিষয় নয়। এমন কী ফেরেশতামণ্ডলী যাঁরা অর্থ কিংবা পদবীর প্রলোভনে পড়েন না, যাঁদের পৃথক করার জন্যে কোনো পর্দা নেই, যাঁদের খাদ্য হচ্ছে খোদাতা'লার খাঁটি নূর ও জামাল (সৌন্দর্য), যাঁদের সুতীক্ষ্ণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আঁখি শুধু প্রত্যক্ষ করে মাশুক (প্রেমাস্পদ

তথা খোদা)-কে, তাঁরাও এই জগতের মানুষের প্রতি অনুরাগ ও বিরাগের মাঝে দোলায়মান থাকেন। এটি এ কারণে যে আমাদের বে-ইজ্জতীর মুহূর্তগুলোতে আমরা হয়তো কম্পমান হয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি, "আমি কিসে পরিণত হয়েছি? আমি কী-ই বা জানি এগুলোর?" আর যদি কোনোক্রমে কোনো জ্যোতি আমাদের ওপর আপন কিরণ ছড়ায় এবং আমরা সুনির্দিষ্ট কোনো আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠি, তবে আমরা হয়তো আল্লাহতা'লার দরবারে হাজারো বার শুকরিয়া জানাতে পারি এ বলে, "আমি কীভাবে এর যোগ্য হলাম?"

তোমরা এভাবে নিজেদের সমর্পণ করে (হযরত) শামস তাবরিযী (রহ:)'র কেবল একটি কথা থেকে বা তাঁর এক পলক দর্শন হতেও মহা (আত্মিক) আনন্দ-উচ্ছ্বাসের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারো। কেননা, আমাদের সত্তারূপী জাহাজের পাল (মানে মোর্শেদ) হচ্ছে আমাদের আদর্শ। (জাহাজে) পাল থাকলে বাতাস আমাদেরকে বড় বড় মকামে (মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে) বহন করে নিয়ে যেতে পারে। আর পাল না থাকলে সমস্ত কথা-ই স্রেফ (ফাঁকা) বায়ু।

আশেক-মাশুকের (প্রেমিক-প্রেমাস্পদের) সম্পর্ক অত্যন্ত সুখকর; দুইয়ের মধ্যকার সব কিছুই পুরাদস্তুর অনানুষ্ঠানিক। সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা-ই অন্যদের খাতিরে। আমি (মওলানা রূমী) এসব কথার একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারি, কিন্তু রাত গভীর হয়েছে এবং (এটি করতে হলে) প্রচুর শ্রমব্যয় দ্বারা নদী খনন করে হৃদ-জলাধারে পৌঁছুতে হবে। এই বিষয়ে প্রামাণিক দলিল কর্মক্ষম নয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেককে প্রেমান্বেষী হতে হবে, পর্যবেক্ষক নয়।

মনে হতে পারে যে আমি আশেকের সম্পর্ক নিয়ে অতিরঞ্জন করছি, কিন্তু এটি সত্য নয়। বাস্তবিকভাবে আমি অনুধাবন করি মুরীদানবর্গের নিজেদের উদ্দেশ্য/অভিলাষ তাদের মোর্শেদের অবয়বের খাতিরে ত্যাগ করা উচিত।

"হাজারো উদ্দেশ্যের চেয়েও শ্রেয় সৌষ্ঠব,
হে মোর্শেদ, তব অবয়ব।" [ভাবানুবাদ]



মোর্শেদের (দিকনির্দেশনা) প্রয়োজন এমন প্রত্যেক মুরীদ তার পীরের সামনে উপস্থিত হওয়ার আগে প্রথমে নিজের উদ্দেশ্য বা অভিলাষ ত্যাগ করতে হবে।

বাহাউদ্দীন (রূমী-তনয়) প্রশ্ন করেন: "এটি নিশ্চয় শায়খের অবয়বের ওয়াস্তে তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য/অভিলাষ ত্যাগ নয়, বরঞ্চ তা মোর্শেদেরই উদ্দেশ্যের খাতিরে নয় কি?"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: সেটি সম্ভব নয়। তা যদি হতো, তবে তারা উভয়-ই মোর্শেদ হতো। এক্ষণে তোমাকে অন্তরের আলো অন্বেষণে সংগ্রাম করতে হবে, যাতে এই বিভ্রান্তির অনল হতে বাঁচতে পারো এবং নিরাপদ থাকো। ওই ধরনের আধ্যাত্মিকতার জ্যোতি যখন তুমি অর্জন করবে, তখন পদবী, সম্মান ও খেতাবের মতো পার্থিব কামনা-বাসনা সবই তোমার অন্তর হতে বিজলি চমকের মতো পার হয়ে যাবে। কিন্তু ঘোর দুনিয়াদার লোকদের বেলায় আল্লাহর সামনে উপস্থিতি, আউলিয়া-দরবেশবৃন্দের ভুবনে বিচরণের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি অদৃশ্য জগতের পুরস্কারগুলো তাদের অন্তরে এক মুহূর্তের তরে আলো ছড়ালেও তা বিদ্যুৎ চমকের মতোই অতিক্রান্ত হয়। তারা আসলে পদবী, মর্যাদা ও খেতাবের অন্বেষী। পক্ষান্তরে, আল্লাহওয়ালা (বুযূর্গানে দ্বীন)-বৃন্দ পুরোপুরিভাবেই আল্লাহ'র হয়ে যান, তাঁদের মুখ মহান প্রভুর দিকেই ফেরানো থাকে। তাঁরা আল্লাহতা'লাকে নিয়েই নিবিষ্ট থাকেন, মাস্ত্ হয়ে যান। দুনিয়াবী আশা-আকাঙ্ক্ষা নপুংসক পুরুষের কামভাবের মতো ক্ষণিকের তরে দেখা দিলেও শেকড় গেড়ে বসে না এবং দ্রুত অতিক্রম করে যায়।

## উপদেশ বাণী - ২১

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: কবি শরীফ পায়সুখতা (তার কবিতায়) লিখেছে-

"খোদা আপন করুণা করেন বণ্টন,
স্থান-কালের প্রতি উদাসীনতাকে করে ধারণ,
সমগ্র জগতের তিনি-ই একক সত্তা, মহান,
মোদের আত্মা হতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন,

যে পরিসরেরই হোক না কেন আমাদের ধ্যান,
এরই আওতায় করা যায় অর্জন,
প্রভুর প্রতি মোদের অর্চন,
কিন্তু তাঁর নেই কো কোনো ভক্তির প্রয়োজন।" [ভাবানুবাদ]

এসব কথা লজ্জাজনক; এগুলো না প্রদর্শন করে খোদার প্রতি সম্মান, না মানবজাতির প্রতি শ্রদ্ধা। ওহে কবি, তুমি এতে কী আনন্দ পাচ্ছো যে খোদাতা'লাকে তোমা হতে চরমভাবে স্বতন্ত্র, স্বাধীন হতে হবে? এটি তো বন্ধুদের ভাষা হতে পারে না, বরঞ্চ এটি শত্রুদেরই ভাষা। সত্য বটে, শত্রু (সর্বদা) বলে থাকে, "আমি তোমার ব্যাপারে উদাসীন এবং মোটেও যত্নশীল নই।"

এবার বিবেচনা করুন, খোদার প্রেমে একনিষ্ঠ ও বিভোর কোনো আশেক (প্রেমিক) প্রেমানন্দে তাঁর মাশুক তথা প্রেমাস্পদকে সম্বোধন করে বলছেন এ কথা, "আপনি আমা হতে স্বতন্ত্র, স্বাধীন!" এ কথাটি হাম্মাম (উষ্ণ তাপবিশিষ্ট গোসল)-খানার চুল্লিতে কাঠ বা কয়লা যোগানদাতা লোকটির কথার মতোই শোনায়, যে বলে, "রাজা আমার মতো অতি সাধারণ কাঠ-কয়লা যোগানদাতা হতে স্বতন্ত্র, স্বাধীন। বস্তুতঃ তিনি সমস্ত কাঠ-কয়লা যোগানদাতার ব্যাপারেই উদাসীন।" রাজা তাদের প্রতি উদাসীন, এ চিন্তাখানি ওই ধরনের অতি নগণ্য একজন কাঠ-কয়লা যোগানদাতার অন্তরে কী আনন্দানুভূতির উদ্রেক করবে? না, ওই ব্যক্তির প্রকৃত অভিব্যক্তি হওয়া উচিত ছিল এরকম: "আমি ছিলাম হাম্মামখানার ছাদে। সুলতান (রাজা) স্থানটি অতিক্রম করছিলেন। আমি তাঁকে সম্ভাষণ জানাই। তিনি আমাকে ভালোভাবে দেখেন এবং দেখতে দেখতেই আমাকে অতিক্রম করেন।" এধরনের কথা হাম্মামখানার চুল্লিতে কাঠ-কয়লা যোগানদাতার মনে খুশি বহন করে আনতে পারে। উপরন্তু, "কাঠ-কয়লা যোগানদাতাদের প্রতি বাদশাহ উদাসীন" মর্মে কথাটি বাদশাহ'র জন্যে কী ধরনের প্রশংসা হতে পারে, আর তা ওই যোগানদাতার জন্যে কী আনন্দ-ই বা বয়ে আনতে পারে?

"যে পরিসরেরই হোক না কেন আমাদের ধ্যান,
এরই আওতায় করা যায় অর্জন।"



ওহে কবি, তুমি যখন দেখবে মানুষ তোমার থেকে স্বতন্ত্র, তোমার চিন্তা ও ধ্যান সম্পর্কে বিরক্ত এবং তা হতে তারা দূরত্ব রাখছে, তখন তোমার চিন্তার পরিসরে কী অর্জিত হবে? খোদাতা'লার স্বাতন্ত্র সুনিশ্চিত, হে কবি, কিন্তু তোমার যদি কোনো মূল্যের আধ্যাত্মিক অবস্থা থাকে, তাহলে তিনি তোমা হতে স্বতন্ত্র, স্বাধীন নন। তোমার সাথে আল্লাহতা'লার নৈকট্য তোমারই মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা করবে।

শায়খ মহল্লা বলতেন, "প্রথমে করো দর্শন, অতঃপর কথপোকথন। সবাই সুলতানকে দেখে থাকে, কিন্তু তাঁর সাথে কথা বলে যে ব্যক্তি আনন্দ পান, তাঁর কাছে সেটি-ই প্রিয়।" এ কথাটিও পশ্চাৎমুখি। পয়গম্বর মূসা (আ:) আল্লাহর সাথে কথা বলতে পেরে উৎফুল্ল হতেন। তাঁর বাণী পেয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতেন। পরবর্তী সময়েই কেবল তিনি খোদার দর্শন পেতে চান। মূসা (আ:)-এর মাক্বাম তথা মর্যাদা হচ্ছে কালাম তথা কথপোকথনের; আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাক্বাম খোদাকে দেখার। তাহলে শায়খ মহল্লা'র কথা কীভাবে সঠিক হতে পারে?

কেউ একজন হযরত শামস-এ-তাবরিয (রহ:)-কে বলেছিলেন, "আমি খোদাতা'লার অস্তিত্বের বিষয়টি একটি স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছি।" পরের দিন সকালে আমাদের শায়খ শামস (রহ:) বলেন, "গত রাতে ফেরেশতাকুল আসমান থেকে নেমে আসেন এবং ওই ব্যক্তিকে আশীর্বাদ করে বলেন, 'আল্লাহরই প্রশংসা, এই ব্যক্তি আমাদের আল্লাহতা'লার অস্তিত্বের ব্যাপারটি প্রতিষ্ঠা করেছেন! আল্লাহ পাক তাঁকে দীর্ঘ জীবন দান করুন! তিনি নারী ও পুরুষের মান-মর্যাদার প্রতি কোনো ক্ষতি করেননি!'"

ওহে কবি! আল্লাহতা'লা অস্তিত্বশীল। এর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। তুমি যদি কোনো কিছুই করতে চাও, তাহলে তাঁর সামনে কোনো মাক্বাম বা মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো। নতুবা তাঁর করুণার ভাগিদার তুমি কীভাবে হবে?

এমন কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই যা আল্লাহতা'লার প্রশংসা না করে।

আইনবিদবর্গ হচ্ছেন চালাক, তাদের নিজস্ব কাজে শতভাগ যোগ্য। কিন্তু তাদের ও আধ্যাত্মিক জগতের মাঝখানে একটি দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে তাদের যুক্তি-প্রমাণের সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখা যায়। ওই দেয়াল যদি তাদের জন্যে পর্দা হিসেবে অস্তিত্বশীল না থাকতো, তাহলে কেউই আর তাদের সাথে পরামর্শ করতো না এবং তাদের কাজও অদৃশ্য হয়ে যেতো।

এটি ঠিক তেমনি একটি কথা যেমনটি শায়খ শামস (রহ:) বলেছিলেন, "পরবর্তী জগৎ হচ্ছে সাগরের মতো, আর এ দুনিয়া ওই সাগরেরই ফেনারাশি। আল্লাহতা'লা এই ফেনাকে নিয়মবদ্ধ রাখার ইচ্ছা পোষণ করেন। তাই তিনি কিছু নির্দিষ্ট লোককে সাগরের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড় করান, যাতে এই ফেনা নষ্টের মুখে না পড়ে।"

কোনো এক রাজার জন্যে একটি তাঁবু গাড়া আরম্ভ হয়, আর তিনিও কিছু নির্দিষ্ট লোককে তা তৈরিতে ব্যস্ত রাখেন। তাদের একজন বলে, "আমি তাঁবুর দড়ি তৈরি না করলে সেটি কীভাবে দাঁড়াবে?" অপরজন বলে, "আমি পেরেক না তৈরি করলে তারা কোথায় দড়ি বাঁধবে?" তবু সবাই জানেন এসব লোক রাজারই সেবক। তাঁতীবর্গ যদি তাঁত বোনা ছেড়ে উজির হতে চাইতো, তাহলে সারা বিশ্বের মানুষ বিবস্ত্র থাকতো। অতএব, তাদেরকে তাদের শিল্প-কৌশলের জন্যে এক রকম আনন্দ মঞ্জুর করা হয়েছে। তারা তাঁত বোনা নিয়ে তৃপ্ত। কাজেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ফেনারাশির জগতকে নিয়মবদ্ধ রাখতে, আর এই জগতকে সৃষ্টি করা হয়েছে সূফী-দরবেশবৃন্দের জন্যে।

খোদাতা'লা প্রত্যেককে তাদের নিজ নিজ কাজে তৃপ্তি ও আনন্দ মঞ্জুর করেছেন, যাতে তাদের জীবনে যদি তারা এক লক্ষ বছরও টেকে, তবু তারা তাদের কাজের প্রতি আগ্রহ খুঁজে পাবে। প্রতিদিন-ই তাদের শিল্প-কৌশলের প্রতি এই টান বাড়তে থাকে, আর সূক্ষ্ম নতুন নতুন দক্ষতাও রপ্ত হতে থাকে তাদের, যা বয়ে আনে অফুরন্ত সুখ ও আনন্দ।

এমন কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই যা আল্লাহতা'লার প্রশংসা না করে।

দড়ি প্রস্তুতকারকের জন্যে রয়েছে একটি প্রশংসা, তাঁবুর খুঁটি নির্মাতা সূত্রধরের জন্যে রয়েছে আরেকটি প্রশংসা, তাঁবুর বস্ত্র বুননকারী তাঁতীর



জন্যে রয়েছে আরেকটি প্রশংসা, আর তাঁবু যে সূফী-দরবেশমণ্ডলীর জন্যে বানানো হয়েছে তাঁদের জন্যে রয়েছে আরেকটি প্রশংসা।

আজকাল যেসব অন্বেষণকারী আমাদের কাছে আসে, আমাদের সান্নিধ্য চায়, আমরা কোনো কথা না বল্লে তারা বিরক্ত ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়। অথচ যদি আমরা কিছু বলি, তাহলে তা তাদের অর্জনের পর্যায়ে উপকারী হবে নিশ্চয়। তাই আমরা সতর্ক হয়ে অগ্রসর হই, আর তারা দূর হয়ে যায় আমাদের এই বলে সমালোচনা করে, "এঁরা যা জানেন তা (নিজেদের কাছেই) আটকে রাখতে চান; আমাদের কাছ থেকে এঁরা লুকিয়ে থাকছেন এবং পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।"

আগুন কীভাবে রান্নার পাত্র থেকে পালিয়ে যেতে পারে? তা পারে না। সত্য হলো, আমরা যখন দেখি পাত্র (আধার) দুর্বল, তখন সেটিকে রক্ষার্থে কিছুটুকু দূরত্ব বজায় রাখি। অতএব, বাস্তবে পাত্র-ই পালিয়ে যায়। আমাদের দূরে সরে থাকা তাদেরই দূরে সরে থাকা হতে নিঃসৃত। আমরা হলাম আয়না। তারা যদি পালানোর জন্যে নড়াচড়া করে, তবে তাদের কাছে মনে হয় আমরাই বুঝি পালাচ্ছি। আর আমরা দূরে সরে থাকি তাদেরই খাতিরে। দর্পণে মানুষেরা নিজেদের চেহারা দেখে থাকে। তারা আমাদেরকে ক্লান্ত-শ্রান্ত দেখতে পেলে ওই ক্লান্তি তাদের নিজেদেরই; আর সেটি তাদেরই দুর্বলতার প্রতিচ্ছায়া যা তারা (আয়নায়) দেখতে পাচ্ছে। এখানে (মানে সূফী/দরবেশ-মণ্ডলীর মজলিশে) ক্লান্তি-শ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই; আমাদের কাছে এর কী-ই বা ফায়দা বা উপকারিতা?

হাম্মামখানায় একবার আমি শায়খ সালাহউদ্দীনের প্রতি চূড়ান্ত বিনয় প্রদর্শন করি, আর তিনিও আমার প্রতি চূড়ান্ত বিনয় প্রদর্শন করেন। তাঁর বিনয়ের মুখোমুখি হয়ে আমি প্রতিবাদ করি। মনে মনে নিজেকে বলি, "তুমি বিনম্রতাকে টেনে অনেক দূর নিয়ে যাচ্ছো। তা ধাপে ধাপে হওয়া উত্তম: প্রথমে তুমি হস্তচুম্বন করো, অতঃপর পদচুম্বন। অল্প অল্প করে তুমি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছুবে, যেখানে তা আর প্রদর্শনী হবে না; আর প্রতিদানে তোমার আন্তরিকতা দ্বারা তাঁরাও আন্দোলিত হবেন। তাঁদের আর তখন তাড়িয়ে দেয়া হবে না, বা সৌজন্যের বদলে সৌজন্য দেখাতে বাধ্য-ও করা হবে না - যখনই তুমি ক্রমান্বয়ে তোমার ভক্তি ও ভালোবাসা প্রদর্শন করবে।"

আমাদেরকে এই একই পন্থায় মিত্র ও শত্রুদের সাথে আচরণ করতে হবে, কাজগুলো ক্রমান্বয়ে সাধন করে করে। উদাহরণস্বরূপ, শত্রুর বেলায় প্রথমে আমরা অল্প অল্প করে তাদেরকে উপদেশ দেই। তা না শুনলে কিছুটুকু বল প্রদর্শন করি। তা-ও যদি না মানে, তবে দূরে তাড়িয়ে দেই।

এই হলো দুনিয়ার রীতি। তোমরা কি বসন্তকালের শান্তি ও বন্ধুত্ব প্রত্যক্ষ করো না? সূচনালগ্নে তা অল্প অল্প করে নিজের উষ্ণতা আমাদের প্রদর্শন করে। এরপর আরো বেশি বেশি করে তার সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে থাকে। গাছ-গাছালির দিকে তাকাও, তারা কতো অল্প অল্প করেই না অগ্রসর হচ্ছে। প্রথমে একখানি হাসি, এরপর পল্লব ও ফলের বাহার প্রদর্শন, ঠিক যেমনটি সূফী ও দরবেশবৃন্দের অন্তরখানির উৎসর্গ - তাঁদের মালিকানাধীন সব কিছুই উজাড় করে দেয়া।

নারী ও পুরুষ জাতি, পার্থিব হোক বা আধ্যাত্মিক-ই হোক, প্রতিটি লক্ষ্য হতেই পালিয়ে বেড়ায়; কেননা তারা প্রাথমিক কাজটিকে অতি বড় মনে করে। সঠিক পদ্ধতি হলো, এক-একবারে অল্প অল্প পরিমাণ হওয়া চাই। একই অবস্থা হবে যদি কেউ বেশি পরিমাণে খায়; তাদের উচিত ক্রমান্বয়ে প্রতিদিন অল্প পরিমাণে খাওয়া কমিয়ে আনা। সেভাবে এক বা দুই বছরে তাদের খাবার অর্ধেক কমিয়ে আনতে পারবে, আর এই অতিভোজন এমনভাবে হ্রাস করা হবে যে শরীর-ও তা অনুভব করবে না। এবাদত-বন্দেগীর বেলায়ও একই অবস্থা; নির্জনবাস, আল্লাহর খেদমতে হাজিরা এবং প্রার্থনারত হওয়া। আল্লাহর রাস্তায় যখন কেউ প্রবেশ করেন, কিছুকালের জন্যে তাঁদের প্রার্থনা হয় সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এরপর তাঁরা সমস্ত অন্তর দিয়ে প্রার্থনা করলে তাঁদের নামায-দোয়া অন্তহীনভাবে জারি থাকবে।

## উপদেশ বাণী - ২২

মওলানা রূমী (রহ:) ইবনে চাভিশকে বলেন: মূল ব্যাপার হলো, শায়খ সালাহউদ্দীন সম্পর্কে তুমি যখন কথা বলো, তখন এই গীবত তথা অসাক্ষাতে কুৎসা রটনা করা হতে নিজেকে সামলে চলবে। এ কাজটি



হয়তো তোমার চারপাশকে ঘিরে থাকা অন্ধকার ছায়া ও (ঘন কালো) মেঘকে অপসারণ করবে।

তুমি কীভাবে নিজেকে বাঁচাবে? মানুষ তাদের দেশ, বাবা ও মা, পরিবার-পরিজন ও ঘর ছেড়ে হিন্দ্ হতে সিন্ধ্ পর্যন্ত ছুটছে পরবর্তী জগতের সুগন্ধিওয়ালা কারো খোঁজে। কতো নারী ও পুরুষ এরকম সিদ্ধপুরুষের তালাশে ব্যর্থ হয়ে শোকে এখন পরলোকে! আর তুমি, তোমার নিজ গৃহে ওই রকম একজন সিদ্ধপুরুষকে জেনেও তাঁকে অবহেলা করছো। এটি-ই হচ্ছে হঠকারিতার দুঃখজনক পরিণতি।

তুমি আমাকে (প্রায়ই) বলতে যে শায়খ সালাহউদ্দীন হচ্ছেন শায়খুশ্ শুয়ূখ (পীরদের পীর) এবং মহান ব্যক্তিত্ব। আরো বলেছিলে, "আমি তাঁর খেদমতে নিয়োজিত হওয়ার দিনটি হতে কখনোই আপনার (মওলানা রূমীর) নাম ধরে ডাকতে শুনিনি, শুধু 'রূমী, আমাদের গুরু, আমাদের মালিক, আমাদের রূপকার (আধ্যাত্মিকতায় প্রশিক্ষণদাতা)' - কথাগুলো ছাড়া। একদিনের জন্যেও আমি কখনো তাঁকে এই বিনম্র অভিব্যক্তি পরিবর্তন করতে দেখিনি।" অতএব, তোমার উচ্চাভিলাষ নিশ্চয় তোমাকে অন্ধ করেছে এক্ষণে। তাই আজ তুমি বলছো সালাহউদ্দীন কেউই না।

শায়খ সালাহউদ্দীন তোমার সাথে কী অন্যায় করেছেন? তিনি তো শুধু তোমাকে আত্মবিনাশের গর্তে পড়তে দেখে বলেছেন, "গর্ত হতে সাবধান হও।" তিনি এ কথা সর্বোপরি তোমার প্রতি অনুভূত করুণা হতেই বলেছেন, অথচ তুমি ওই করুণা প্রত্যাখ্যান করছো। এক্ষণে তুমি তাঁর (আধ্যাত্মিক ক্ষমতাপূর্ণ) ভয়ানক রোষের মাঝে পড়েছো, আর এই ঘূর্ণিপাকে ঝাঁপ দিয়ে তুমি কীভাবে রক্ষা পাবে? এ কারণেই তিনি বলেন, "আমার রোষের ঘরে বসতি কোরো না, বরঞ্চ আমার করুণা ও দয়ার আবাসস্থলে চলে এসো। আমার প্রশংসায় কিছু একটি কোরো এবং আমারই প্রেম-গৃহে প্রবেশ কোরো।" তিনি এ কথা বলেন যাতে তোমার অন্তর এই অন্ধকার দূর করে জ্যোতির্ময় হতে পারে।

শায়খ সালাহউদ্দীন তোমাকে এ কথা বলেছেন তোমারই খাতিরে, তোমারই ভালাইয়ের উদ্দেশ্যে, অথচ তুমি তাঁর এই অনুগ্রহের প্রতি দুরভিসন্ধির অভিযোগ উত্থাপন করছো। ওই রকম এক ব্যক্তিত্বের তোমার প্রতি কী দুরভিসন্ধি থাকতে পারে? এ কথা কি সত্য নয় যখন-ই (ঐশী

সুরা) পান অথবা (আধ্যাত্মিক) সঙ্গীতে তোমরা পূর্ণ তৃপ্তি বোধ করো, তখন সকল শত্রুর প্রতিও তোমরা রাজি তথা সন্তুষ্ট হও এবং তাদের সবাইকেই ক্ষমা করে দাও? ওই সময় ঈমানদার ও বে-ঈমান তোমাদের (রহমের) দৃষ্টিতে একই হয়ে যায়। এই আধ্যাত্মিক আনন্দের মহাসাগরটি-ই হলেন শায়খ সালাহউদ্দীন। সন্তুষ্টির সমস্ত সাগর-ই তাঁর মাঝে অবস্থিত। তিনি কীভাবে কাউকে ঘৃণা করতে পারেন, কিংবা কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারেন? অধিকন্তু, কীট-পতঙ্গ ও ব্যাঙের মতো প্রাণির বিরুদ্ধে তিনি কী-ই বা চক্রান্ত করবেন? তাঁর মতো বিশাল (আধ্যাত্মিক) সাম্রাজ্য ও মহিমার অধিকারী ব্যক্তিত্বকে কীভাবে ওই ধরনের অতি নগণ্য প্রাণির সাথে তুলনা করা যায়?

এ কথা কি বলা হয় না যে 'জীবনের (উৎস) পানি' অন্ধকারেই পাওয়া চাই? এই অন্ধকার সূফী-দরবেশবৃন্দকে ঘিরে রেখেছে, যাঁদের সত্তায় আমরা ওই 'চিরন্তন ঝর্না'কে খুঁজে পাই। 'জীবনের (উৎস) জল' তাঁদের অন্ধকারের মাঝে রয়েছে লুকোনো। তুমি অন্ধকার থেকে মুখ ফিরিয়ে পালালে 'জীবনের (উৎস) জল' তোমার কাছে কীভাবে কখনো পৌঁছুবে?

তুমি কি মনে করো না যে তুমি সমকামিদের কাছ থেকে সমকামিতা সম্পর্কে কিংবা পতিতাদের কাছ থেকে পতিতাবৃত্তি সম্পর্কে জানতে চাইলে তা তুমি কখনোই জানতে পারবে না - যতোক্ষণ না তুমি এক হাজারটি ভিন্নমতসম্পন্ন বিষয়ের, মারধরের এবং তোমারই আশা-আকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলি দানের মুখোমুখি হবে? এটি-ই তোমার লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র উপায়। তাহলে ভিন্নমতসম্পন্ন কোনো বিষয় বা কোনো ত্যাগ স্বীকার ছাড়া তুমি কীভাবে জীবনের চিরন্তন ও চিরস্থায়ী উৎস, যেটি আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া (রহ:)-এর মাক্বাম (মর্যাদা), সেটি অর্জনের আশা করতে পারো? এটি কীভাবে কখনো হতে পারে?

শায়খ (পীর/মোর্শেদ) তোমার প্রতি যে নির্দেশ দেন, তা ইতিপূর্বেকার সমস্ত যুগের মাশায়েখবৃন্দের দেয়া নির্দেশেরই অনুরূপ। আর তা হলো, তোমার সম্পদ ও পদমর্যাদা ত্যাগ করো। বস্তুতঃ তাঁরা শিষ্যদের বলতেন, "তোমাদের স্ত্রীদের ছাড়ো, যাতে আমরা তাদের গ্রহণ করতে পারি" [এর মানে কৃচ্ছব্রত পালন করো, যা রূপকার্থে বলা হয়েছে। কথাটি সত্যিকার অর্থে বলা হয়নি - বঙ্গানুবাদক]। আর শিষ্যবৃন্দ-ও ত্যাগ স্বীকার করে এই



হুকুম মান্য করতেন। আর তোমার ক্ষেত্রে তিনি সামান্য একটি উপদেশ দিলেই তুমি কীভাবে পালিয়ে বেড়াতে পারো?

মানুষ প্রেমে পড়লে তারা কী রকম অন্ধত্ব ও মূর্খতার বশবর্তী হয় তা কি তুমি দেখো না? এ-ও কি দেখো না কীভাবে তারা আত্মমর্যাদা এবং নিজেদের সমস্ত সম্পদ বিসর্জন দিয়ে তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদকে যে কোনোভাবে পাওয়ার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকে? দিন-রাত তারা অন্য কিছু ভাবে না, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে কখনোই ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয় না; অথচ বাদবাকি সবকিছুর ব্যাপারে থাকে ক্লান্ত। তাহলে শায়খ (পীর/মোর্শেদ) ও খোদাতা'লার প্রতি মহব্বত কি এর চেয়ে কম (গুরুত্বের)?

অথচ উপদেশ ও নিয়ম-শৃঙ্খলার সামান্যতম কথায় তুমি আপত্তি উত্থাপন করেছো এবং শায়খকে পরিত্যাগ-ও করেছো। এমতাবস্থায় জ্ঞাত হয়েছে যে তুমি কোনো আশেক্ব বা (খোদার) অন্বেষণকারী নও। তুমি যদি প্রকৃত প্রেমিক হতে, তাহলে আমরা যা বর্ণনা করেছি সেই ত্যাগ তুমি বহুবার স্বীকার করতে। তোমার অন্তরে গোবর মধু ও চিনিতে রূপান্তরিত হতো।

## উপদেশ বাণী - ২৩

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: আমি তুক্বাত যেতে ইচ্ছুক, কেননা ওই অঞ্চলটি বেশ উষ্ণ। যদিও আনাতোলিয়া এলাকাও গরম, তবুও সেখানকার খুব কম মানুষ-ই আমাদের ভাষা বোঝেন। তবে একদিন আমি সেখানে বক্তব্য রাখার সময় অবিশ্বাসীদের একটি দল উপস্থিত ছিলেন। আমার ভাষণের মাঝখানে তাঁরা আবেগাপ্লুত ও জযবাত তথা আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাসের চিহ্নস্বরূপ কান্নাকাটি আরম্ভ করেন।

কেউ একজন দরিবারি মজলিশে প্রশ্ন করেন: "তাঁরা কী-ই বা বুঝতে পারেন এসবের? কী-ই বা জানেন তাঁরা? এক হাজার মুসলমানের মধ্যে মাত্র একজন-ই এসব কথা বোঝেন। তাহলে একজন অবিশ্বাসী কী বুঝবেন যে এসব কথা শুনে কাঁদবেন?

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: আমরা যা বলি তার অন্তর্নিহিত অর্থ তাঁদের বোঝা প্রয়োজনীয় নয়। এই (উদ্দেশ্যকৃত) অর্থের পাত্র হচ্ছে খোদ কথাগুলো, যা তাঁরা চেনেন ও জানেন। প্রকৃতপক্ষে খোদাতা'লা যে এক, তিনি যে স্রষ্টা ও রিযিকদাতা, সমস্ত জীবনের উৎসমূল এবং তাঁরই কাছে যে সব কিছুকে ফিরতে হবে, এ বিষয়টি সবাই জানেন। (আমাদের) এসব কথা যখন কেউ শোনেন, যা খোদাতা'লারই একটি বিবরণ ও (তাঁরই অস্তিত্বের) অভিব্যক্তি, তখন তাঁদের মধ্যে একটি সর্বজনীন আবেগ ও অভ্যন্তরীণ অনুভূতি নাড়া দেয়। কেননা এসব কথা তাঁদেরই প্রেমাস্পদের এবং তাঁদেরই অন্বেষণের এক সুগন্ধ ছড়াচ্ছে।

পথ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য একই। তোমরা কি দেখো না কা'বা শরীফের রাস্তা অনেকগুলো? কারো জন্যে তা রোম হতে, কারো জন্যে সিরিয়া হতে, অন্যরা আসে পারস্য বা চীন হতে, কিংবা সমুদ্রপথে ভারত ও ইয়েমেন হতে। অতএব, তোমরা পথগুলোর কথা বিবেচনায় নিলে সেগুলো গণনারও অতীত, আর সেগুলোতে রয়েছে অন্তহীন পার্থক্য। কিন্তু সেগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি তোমরা বিবেচনা করো, তাহলে দেখবে একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষা-ই সেগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করছে।

সবার অন্তর কা'বা শরীফের প্রতি মগ্ন। কা'বার প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে অন্তরগুলো এক এবং এতে বিচ্ছেদের কোনো অবকাশ-ই নেই। ওই মহব্বত বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস নয়, কেননা এর সাথে বিভিন্ন রাস্তার কোনো সম্পর্ক নেই। একবার আমরা সেখানে পৌঁছুলে, এই যুক্তিতর্ক ও যুদ্ধ এবং রাস্তাগুলোর ওসব বিভিন্নতা - এই মহিলার ওই পুরুষটিকে "তুমি মিথ্যে, তুমি অবিশ্বাসী" কথাটি বলা, আর ওই পুরুষটিরও এই মহিলাটিকে একই কথা বলা - একবার কা'বা শরীফে পৌঁছুলে আমরা উপলব্ধি করি যে এধরনের লড়াই কেবল রাস্তাগুলো নিয়েই সংঘটিত হয়েছে, অথচ সবার লক্ষ্য একই।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো পাত্র (বাটি) তার প্রস্তুতকারকের সাথে সংশ্লিষ্ট; তাকে যে হাতযুগল কারুকার্যখচিত করেছে, সেগুলোর গোলাম সে। তথাপি এই পাত্রকে কেউ কেউ দেখে বলে যে এটি যেমন আছে ঠিক তেমনি টেবিলে স্থাপন করা উচিত। কেউ কেউ বলে এর ভেতরটুকু আগে ধুয়ে নিতে হবে, আর কেউ কেউ বলে এর বাইরের দিক ধুয়ে নেয়া



সমীচীন। কেউ কেউ বলে পুরো পাত্র-ই ধোয়া উচিত, আবার কেউ কেউ বলে একেবারেই ধোয়া উচিত নয়। মতামতের এই বিভিন্নতা পাত্রটির বিবিধ ব্যবহারের দরুন হয়েছে, কিন্তু পাত্রটির যে সুনিশ্চিতভাবে একজন স্রষ্টা আছেন যিনি এটিকে সাজিয়েছেন এবং এটি যে আপনাআপনি অস্তিত্বশীল হয়নি, সে ব্যাপারে সবাই একমত।

সমস্ত নারী ও পুরুষ অন্তরের অন্তস্তল থেকে আল্লাহকে ভালোবাসেন, তালাশ করেন, প্রার্থনা করেন এবং সবকিছুতে তাঁর প্রতি ভরসা করেন এই বিশ্বাস বদ্ধমূল রেখে যে তাঁদের সকল বিষয়াদি নিয়মতান্ত্রিক করার ব্যাপারে তিনি-ই হলেন প্রধান বাস্তবতা। এটি বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস নয়। অন্তরের গভীরে এর কোনো নাম নেই। কিন্তু যখন সহজাত সত্যের জলরাশি অন্তর হতে প্রবাহিত হতে থাকে জিহ্বার জলকপাটের দিকে এবং আকার পরিগ্রহ করে, তখন-ই সেটি আকৃতি ও অভিব্যক্তি লাভ করে। ওখানেই সেটির নামকরণ হয় বিশ্বাস বা অবিশ্বাস, ভালো বা মন্দ। মাটি হতে চারা গাছের গজিয়ে ওঠাও একই ব্যাপার। প্রথমদিকে তাদের কোনো আকার-আকৃতিই থাকে না। এই পৃথিবীতে তারা দৃশ্যমান হওয়ার সময় তাদের সব অঙ্কুর সরু, হালকা ও সাদা দেখায়। কিন্তু বড় হতে হতে সেগুলো বিভিন্ন আকার ও রং ধারণ করে। এর পরই শুধু আমরা সেগুলোকে নাম ধরে ডাকতে পারি।

ঈমানদার (বিশ্বাসী) মুসলমানবৃন্দ ও অবিশ্বাসী গোষ্ঠী যখন একত্রে (কোথাও) বসে এবং কিছু না বলে, তখন তারা এক ও অভিন্ন। (এ সময়) বিশ্বাসগত কোনো দ্বন্দ্ব নেই; অন্তর (এমতাবস্থায়) এক মুক্ত বিশ্ব। বস্তুতঃ বিশ্বাস হচ্ছে সূক্ষ্ম বিষয় এবং তা বিচার করা যায় না। মানুষ কেবল বাহ্যিক অভিব্যক্তি-ই বিচার করতে পারে, কিন্তু খোদাতা'লা-ই হলেন আমাদের গোপন অন্তরের কারিগর। তিনি যখন তোমার নিজস্ব বিশ্বাস তোমারই কাছে উন্মোচন করেন, তখন এক লক্ষবার চেষ্টা করলেও তা আবারো আড়াল করা সম্ভব হয় না। খোদার কোনো হাতিয়ারের প্রয়োজন নেই মর্মে প্রবচনের ক্ষেত্রে তুমি কি দেখো না তিনি কীভাবে ওইসব ধারণা ও বিশ্বাস বিনা হাতিয়ারে, কোনো কলম বা রঞ্জক ব্যতিরেকে, তোমার মাঝে প্রকাশ করেন?

ওইসব বিশ্বাস হচ্ছে আকাশে উড়ে বেড়ানো পাখির মতো, কিংবা বন্য হরিণের মতো। তুমি সেগুলোকে না ধরা পর্যন্ত আইনতঃ সেগুলো বিক্রি করার কোনো অনুমতি নেই। উড়ে বেড়ানো কোনো পাখিকে বিক্রি করার ক্ষমতা তোমার নেই; কেননা তাকে তুমি কীভাবে (ক্রেতার কাছে) চালান বা ডেলিভারী দেবে? যেহেতু এটি তোমার ক্ষমতার আওতায় নেই, সেহেতু এটিকে বিক্রি করার কোনো অধিকারও তোমার নেই।

অতএব, বিশ্বাস যতোক্ষণ অন্তরে থাকে, নাম ও চিহ্নবিহীন অবস্থায় থাকে, ততোক্ষণ সেগুলোকে বিচার করা যায় না। কোনো বিচারক কি এ কথা বলেন, "তোমার অন্তরে তুমি এই শপথ করেছিলে, এই ধারণা পোষণ করেছিলে," কিংবা "এসো, শপথ করে বলো, তোমার অন্তরে এটি তুমি চিন্তা করো নি?" কোনো বিচারক-ই এ কথা বলেন না, কেননা কেউই অন্তরকে বিচার করতে পারে না। বিশ্বাস হচ্ছে আকাশে উড়ন্ত পাখির মতো। তথাপি একবার তা প্রকাশিত হলে তৎক্ষণাৎ বিচার করা সম্ভব হয় তা সত্য না মিথ্যে, ভালো না মন্দ।

এখানে আছে শরীরসমূহের এক বিশ্বজগৎ, ধারণার এক জগৎ, অলীক কল্পনার এক জগৎ, সম্ভাবনার এক জগৎ। আল্লাহতা'লা সকল জগতেরই অতীত; তিনি এগুলোর মধ্যে নেই, আবার এগুলো ছাড়াও নেই। তাহলে এখন বিবেচনা করো কীভাবে তিনি আমাদের বিশ্বাসগুলোকে সৃষ্টি করেন, কোনো বস্তুগত মাধ্যম ব্যতিরেকে, কোনো কলম বা হাতিয়ার ছাড়াই। এই অলীক কল্পনা বা ওই ধারণাটির ব্যাপারে তুমি যদি (কারো) বক্ষ বিদারণ করে তার একটি একটি করে কণাও খুঁজতে থাকো, তবুও তুমি সেই চিন্তাটি খুঁজে পাবে না; রক্তে নয়, শিরায়ও নয়, ওপরেও নয়, নিচেও নয়। অপার্থিব হয়ে এবং স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে উঠে তুমি তা বক্ষের বাইরেও খুঁজে পাবে না।

যেহেতু আল্লাহতা'লার চিহ্ন এতো সূক্ষ্ম যে এর কোনো হদিস-ই পাওয়া যায় না, সুতরাং এক্ষণে বিবেচনা করো আল্লাহ পাক যিনি সবার (সৃষ্টির) কারিগর, তিনি খোদ কতো না সূক্ষ্ম ও চিহ্নবিহীন! মানুষের শরীর তার অন্তর্নিহিত সত্তার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেমন দৃশ্যমান বস্তু, তেমনি আল্লাহতা'লার সূক্ষ্মতার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য অর্থ হচ্ছে একটি দৃশ্যমান দেহ ও আকার।



সকল মুসলমান-ই বলে থাকেন, "আমরা পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করবো।" কিছু কিছু মুসলমান (আবার) বলেন, "যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবেই আমরা প্রবেশ করবো।" "আল্লাহ ইচ্ছা করলে (মওলার মর্জিতে)", এ কথাটি যাঁরা ব্যবহার করেন, তাঁরা খোদাতা'লার প্রকৃত আশেক্ব (প্রেমিক)। কেননা, আশেক্ববৃন্দ মনে করেন না যে তাঁরা সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী এবং যেমন ইচ্ছা তেমন করতে তাঁরা সক্ষম। তাঁরা এটি বোঝেন যে মাশুক্ব তথা প্রেমাস্পদ-ই সবকিছুর নিয়ন্তা। তাই তাঁরা বলেন, "মাশুক্ব ইচ্ছা করলে আমি (মসজিদে) প্রবেশ করবো।"

এখন আক্ষরিক অর্থগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ 'পবিত্র মসজিদ' বলতে মক্কা মোয়াযযমায় অবস্থিত কা'বা শরীফকে বুঝে থাকেন। কিন্তু আশেক্ববৃন্দ ও আল্লাহর মনোনীত জন 'পবিত্র মসজিদ' বলতে আল্লাহর সাথে মিলনপ্রাপ্তিকে বোঝেন। তাই তাঁরা বলেন, "আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা তাঁকে পাবো এবং তাঁরই দর্শন দ্বারা সম্মানিত/ধন্য হবো।" কেননা, খোদাতা'লার পক্ষে "আল্লাহর ইচ্ছা হলে", এ কথাটি বলা একেবারেই বিরল। এটি অপরিচিত কোনো ব্যক্তির কাহিনী, আর একজন অপরিচিত ব্যক্তি-ই কেবল এধরনের কাহিনী বুঝতে পারেন। তথাপি আল্লাহতা'লার কিছু খাস বান্দা আছেন যাঁদেরকে এতো ভালোবাসা হয় যে তিনি নিজেই তাঁদেরকে খুঁজে নেন, আর তাঁদের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ করেন এবং একজন আশেক্বের মতো সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেন। আশেক্ব যেমনটি বলেন - "আল্লাহর মর্জি হলে আমি প্রবেশ করবো", ঠিক তেমনি আল্লাহতা'লাও ওই সূফী/দরবেশের পক্ষ হয়ে বলেন, "যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন।"

আমি যদি এই সূক্ষ্মতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি, তাহলে এমন কী সূফী/দরবেশ যাঁরা খোদাতা'লাকে পেয়েছেন, তাঁরাও এই আলোচনার সূত্র হারিয়ে ফেলবেন। এমতাবস্থায় এধরনের ভেদের রহস্য ও আধ্যাত্মিক অবস্থা কীভাবে মরণশীল নারী ও পুরুষের কাছে বলা সম্ভব? "কলম এ পর্যন্ত লিখেই ক্ষান্ত, অতঃপর টুটেছে এর দু প্রান্ত।" কেউ তার নিজের ঘরের ছাদে উট দেখতে না পেলে কীভাবে ওই উটের মুখে অবস্থিত একটি লোম দেখতে পাবে?

প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক: যেসব আশেক্ব "খোদার মর্জি হলে" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করেন, তাঁরা আল্লাহর মাঝে বিলীন। অন্য কোনো কিছুর স্থান এখানে নেই, কোনো অস্তিত্ব-ই নেই। যে পর্যন্ত কেউ নিজের পৃথক অস্তিত্বের প্রতিকৃতি সমর্পণ না করবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত 'পবিত্র মসজিদের' খোঁজ সে পাবে না। "(আত্মার) ঘরে বসত করেন শুধু একজনা।"

"আল্লাহতা'লা যে দর্শনক্ষমতা মঞ্জুর করেছেন তাঁরই নবী (দ:)-এর প্রতি"
[সরাসরি অনুবাদ]

এই দর্শনক্ষমতা হচ্ছে আশেক্ব ও প্রকৃত আল্লাহ-ওয়ালা'দের স্বপ্ন, কিন্তু এর আসল অর্থ প্রকাশ পায় কেবল অপর জগতে। তুমি যখন স্বপ্নে নিজেকে ঘোড়ায় চড়তে দেখো, তখন এর মানে হলো তুমি লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে; তথাপি লক্ষ্য অর্জনের সাথে ঘোড়ার কী সম্পর্ক বা যোগসূত্র থাকতে পারে? তুমি যদি স্বপ্নে দেখো তোমাকে চকচকে (স্বর্ণ) মুদ্রা দেয়া হয়েছে, তবে এর মানে হচ্ছে তুমি কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে সৎ উপদেশ শুনতে পাবে; কিন্তু মুদ্রা কীভাবে উপদেশের সদৃশ হতে পারে? স্বপ্নে তুমি জনতার সামনে নিজেকে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখলে বুঝবে কোনো জাতির সরদার বা নেতা হতে যাচ্ছো; কিন্তু ফাঁসিকাষ্ঠ কীভাবে নেতৃত্বের সদৃশ হতে পারে? একই ভাবে এই জগতের বিষয়াদিও স্বপ্নসদৃশ। "এ জগৎ হচ্ছে নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তির স্বপ্ন।" অধিকন্তু, এর অর্থ অপর জগতে একদম আলাদাভাবে দেখা হয়। সেখানে এটি ঐশী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকারী তথা খোদাতা'লার দ্বারা প্রকৃতপ্রস্তাবেই বিচার্য হয়, কেননা তাঁর কাছেই সব বস্তু/বিষয় প্রকাশিত রয়েছে।

কোনো উদ্যানপালক যেমন ফলের বাগানে ঢুকে প্রতিটি গাছের দিকে নজর করে সেগুলোর শাখায় অবস্থিত ফলের দিকে না তাকিয়েই বলতে পারেন কোনটি খেজুর, কোনটি ডুমুর, কোনটি ডালিম, কোনটি নাশপাতি বা আপেলের গাছ, ঠিক তেমনি আল্লাহওয়ালাবৃন্দ-ও (মনুষ্যরূপী) গাছের বিদ্যায় পারদর্শী, আর তাই তাঁদেরও (মনুষ্য) জীবনের পরিণতি দেখতে পুনরুত্থান পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন পড়ে না। এধরনের বুযর্গ-ব্যক্তি আগেভাগেই পরিণতি দেখতে পান, ঠিক যেমনটি উদ্যানপালক জানেন কোন্ বৃক্ষের ডাল কী সুনিশ্চিত ফল উৎপন্ন করবে।



এই জগতের সব কিছু - সম্পদ, সঙ্গী ও পরিধেয় বস্ত্র - নিজ খাতিরে নয়, বরং অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকে। তুমি কি দেখো না, এমন কী লাখ খানেক স্বর্ণমুদ্রা নিয়েও তুমি যদি ক্ষুধার্ত হও এবং কোনো খাবার খুঁজে না পাও, তাহলে ওই সোনা দ্বারা তুমি খেতে পারবে না? কোনো সঙ্গী হচ্ছে সন্তান-সন্ততি, সঙ্গ ও কামভাব মেটানোর খাতিরে। বস্ত্রের প্রয়োজন শীতকালে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে। এভাবে সব জিনিস-ই অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকে; আর প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা-ই পরবর্তী আকাঙ্ক্ষার দিকে ধাবিত হয়, অতঃপর সবগুলোর পরিসমাপ্তি ঘটে খোদাতা'লার প্রতি আকাঙ্ক্ষার মাঝে। খোদার প্রতি আকাঙ্ক্ষা তাঁরই আপন খাতিরে হয়, অন্য কোনো উদ্দেশ্য তাতে নিহিত থাকে না। সবকিছুর অতীত ও সর্বশ্রেষ্ঠ, মহানতম ও সূক্ষ্মতম (পবিত্র) সত্তা হয়ে আল্লাহতা'লাকে কি তাঁর চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো কিছুর খাতিরে কামনা করা যায়? "অতএব, তিনি-ই হলেন চূড়ান্ত লক্ষ্য।" খোদার মাঝেই সকল বস্তু পূর্ণতা পায়, তাঁর চেয়ে উর্ধ্বে আর কোনো অভিষ্ট লক্ষ্য নেই।

মানব মস্তিষ্ক সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলাচলে রয়েছে পড়ে। মস্তিষ্ক কখনোই এগুলো দূর করতে পারে না, যতোক্ষণ না সেটি প্রকৃত প্রেমে পড়ে। এরপরই কেবল সেটির সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে যায়। "তোমার প্রেম তোমায় করেছে অন্ধ ও বধিরে পরিণত।"

উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহতা'লার আদেশ অমান্য করে হযরত আদম (আ:)-কে সেজদা না করে ইবলিস বলেছিল, "আমার সত্তা আগুন হতে তৈরি, আর তাঁর সত্তা মাটি হতে। তাহলে শ্রেষ্ঠজন কেন নিকৃষ্টের সামনে মাথা নত করবে?" এই খোদায়ী আদেশের প্রতি অবাধ্যতার কারণেই আল্লাহতা'লা শয়তানকে অভিশপ্ত করেন। এমতাবস্থায় ইবলিস নিজের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে এই বলে, "হায় খোদা! আপনি-ই তো সবকিছুর স্রষ্টা। এটি ছিল আপনারই প্রলোভন। অথচ এখন আপনি আমাকেই অভিসম্পাত দিচ্ছেন এবং নির্বাসিত করছেন।"

পক্ষান্তরে, হযরত আদম (আ:) যখন গন্দুম (ফল) ভক্ষণ করেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁকে বেহেশত থেকে বের করে দেন; কিন্তু তিনি পাল্টা কোনো যুক্তি প্রদর্শন করেননি। এমতাবস্থায় মহান প্রভু তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "ওহে আদম! আমি তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করেছি এবং তোমার

কৃত কর্মটির জন্যে তোমাকে শাস্তি দিয়েছি, অথচ তুমি কেন আমার সাথে তর্ক করোনি? তোমার পক্ষে জোরালো যুক্তি ছিল। তুমি তো বলতে পারতে, 'সবকিছুই আপনার তরফ থেকে আসে এবং আপনারই সৃষ্ট। আপনি যা চান তা-ই ঘটে, যা চান না তা ঘটে না।' তোমার বিষয়টি ছিল স্পষ্ট ও বৈধ। তাহলে তুমি কেন যুক্তির অবতারণা করোনি?" হযরত আদম (আ:) আরয করেন, "আমি তা ভালোই জানতাম, হে প্রভু, কিন্তু আমি আপনার দরবারের সৌজন্য ভুলে যাইনি। আপনার প্রতি আমার এশক্ব (মহব্বত)-এর খাতিরেই আমি কিছু বলতে পারিনি।" এর ফলে হযরত আদম (আ:)-এর ভালোবাসা সুদৃঢ় থেকে যায় এবং মোটেও টলেনি।

পবিত্র প্রেমের এই রীতি একটি জলাশয়, একটি ঝর্ণার উৎস বটে। এটি কোনো রাজার দরবারের মতো, যেখানে অনেকে রাজার আইন-কানুন, তাঁর আদেশ-নিষেধ, তাঁর প্রশাসন তথা সবার জন্যে ন্যায়বিচার ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করেন। রাজার আজ্ঞার কোনো শেষ নেই, আর ওরই ওপর রাজ্যের স্থিতিশীলতাও নির্ভর করে। কিন্তু সূফী-দরবেশবৃন্দের মাক্বাম (পর্যায়) হচ্ছে বাদশাহর সাথে ভালোবাসার এক সম্পর্কের। তাঁদের প্রেম থেকেই নিঃসৃত হয় রাজার সাথে কথপোকথন এবং তাঁরই চিন্তাভাবনা ও মনকে জানা। সুলতানের আইন-কানুনকে জানা, খোদ তাঁকে এবং তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও তাঁরই মনকে জানার তুলনায় কতোখানি হতে পারে? এ দুইয়ের মাঝে বিস্তর পার্থক্য বিরাজমান।

সূফীমণ্ডলী ও তাঁদের বিভিন্ন ত্বরীকত-শিক্ষা হলো একটি বিদ্যালয়ের মতো, যেখানে বহু বিদ্বান (শিক্ষক) রয়েছেন। প্রধান শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষককে তাঁদের নিজ নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে বেতন দেন; কাউকে দেন দশ, কাউকে বা বিশ, আবার কাউকে ত্রিশ। আমরাও (মানে মওলানা রূমী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে ও অনুরূপ মাশায়েখবৃন্দ-ও) প্রত্যেকের মর্যাদা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আমাদের (উপদেশ) বাণী বিতরণ করি। "প্রত্যেককে ততোটুকুই করো জ্ঞানদান, যতোটুকু সে বোঝার সামর্থ্যবান ।" [এটি একটি হাদীসের সারমর্ম - বঙ্গানুবাদক]



## উপদেশ বাণী - ২৪

মানুষ এসব পবিত্র সৌধ (মসজিদ/মাযার/দরগাহ) নির্মাণ করে কোনো বিশেষ কারণে: হয় খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে নিজেদের উদারতার প্রদর্শনী দেয়ার জন্যে, না হয় বেহেশতে পুরস্কার লাভের উদ্দেশ্যে। আউলিয়া-দরবেশ ও তাঁদের মাযার-দরগাহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সময় খোদাতা'লা-ই হওয়া উচিত আসল উদ্দেশ্য তথা উদ্দিষ্ট সত্তা। দরবেশবৃন্দ সম্মানের মুখাপেক্ষী নন; তাঁরা নিজেরাই নিজেদের জন্যে মহা এক সম্মান।

কোনো প্রদীপ যদি উচ্চস্থানে স্থাপিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তবে সেটি অন্যদের খাতিরে তা চায়, নিজের খাতিরে নয়। তা উচ্চ না নিচু স্থান, একটি প্রদীপের তাতে কী এসে যায়? সেটি তবু আলো বিকীরণকারী প্রদীপ-ই। কিন্তু প্রদীপটি চায় তার আলো অন্যদের কাছে পৌঁছুক। সূর্য যদি আসমানে অবস্থিত না হতো, তথাপিও সেটি ওই একই সূর্য হতো; পৃথিবী-ই শুধু অন্ধকারে ডুবে যেতো। অতএব, সূর্য আপন খাতিরে উচ্চতা পায় না, বরঞ্চ অন্যদের প্রেমের কারণে পায়। সূফী-দরবেশবৃন্দও উচুঁ বা নিচু এবং মানুষের এবাদত-বন্দেগীর মতো জিনিসগুলোর ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছেন।

পরবর্তী জগতের (আধ্যাত্মিক) উচ্ছ্বাসের এক নগণ্য অংশ এবং (ঐশী) করুণার এক ঝলক যদি তোমাকে দান করা হয়, তবে তোমার নিজের দিকেই লক্ষ্য করো। ওই মুহূর্তে তুমি কোনো উঁচু বা নিচু, গুরুগিরি বা শিষ্যত্ব দেখতে পাও না, এমন কী সবকিছুর চেয়ে তোমার কাছের যে জিনিস, তোমার নিজ সত্তাকেও দেখতে পাও না। এসব জিনিস তখন তোমার মস্তিষ্কেই প্রবেশ করে না। এমতাবস্থায় আউলিয়া-দরবেশবৃন্দ, যাঁরা ওই (ঐশী) জ্যোতি ও অনুপ্রেরণার বাতায়ন ও দ্বার, তাঁরা কীভাবে উঁচু বা নিচু (মর্যাদা) নিয়ে মগ্ন হতে পারেন? তাঁদের অন্তর খোদাতা'লার সাথে রয়েছে, আর খোদাতা'লা উচু ও নিচু হতে মুক্ত। এই উঁচু ও নিচু বিষয়টি আমাদের মতো মাথা ও পা বিশিষ্ট সত্তাদের বেলাতেই কেবল প্রযোজ্য।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা আমায় পয়গম্বর ইউনূস বিন মাত্তা (আ:)-এর চেয়ে উঁচু মনে করবে না স্রেফ এই

কারণে যে তাঁর দীদার হয়েছে তিমি মাছের পেটে, আর আমার দীদার হয়েছে সাত আসমানের ওপর (খোদার) আরশে।" আসলে তিনি এ কথার দ্বারা বুঝিয়েছিলেন, "আল্লাহতা'লা উঁচু বা নিচুতে নন। তাঁর উপস্থিতি সর্বত্র একই, চাই তা তিমির পেটে হোক, বা সাত আসমানে।"

এমন অনেকে আছে যাদের নিজ নিজ উদ্দেশ্য বিদ্যমান, অথচ আল্লাহর ইচ্ছা আরেক। আল্লাহতা'লা এরাদা (ঐশী ইচ্ছা) করেছিলেন যে মহানবী (দ:)-এর দ্বীন/ধর্ম মহাসম্মানিত হবে, ব্যাপক প্রসার লাভ করবে এবং তা যুগ যুগ ধরে মানা হবে। কুরআন মজীদের কতোগুলো যে তাফসীরগ্রন্থ লেখা হয়েছে তা-ই বিবেচনা করো। অথচ ওই লেখকদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের কলাসিদ্ধি তথা শাস্ত্রীয় দক্ষতা প্রদর্শন করা।

যামাখশারী তার 'কাশশাফ' তাফসীরগ্রন্থকে নিজের বিদ্যা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে (আরবী) ব্যাকরণ, অভিধান সংকলন-বিদ্যা ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা দ্বারা পরিপূর্ণ করেছে। কিন্তু এতে আল্লাহতা'লার উদ্দেশ্য-ও পূরণ হয়েছে, আর তা হলো রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর দ্বীনের মহিমা প্রকাশ। সুতরাং সকলেই আল্লাহর কাজ করে, হোক তাদের গোচরে, কিংবা অগোচরে। কোনো পুরুষ ও নারীযুগল নিজেদের আনন্দের খাতিরেই পরস্পর পরস্পর হতে কামভাব তৃপ্ত করে থাকে, অথচ এর ফলাফল হচ্ছে নবজাতকের জন্ম। একই উপায়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ আনন্দ-ফুর্তির জন্যে কাজ করে থাকে, আর এটি-ই পৃথিবীকে নিয়মবদ্ধ রাখার একটি মাধ্যমবিশেষ। বাস্তবে তারা খোদারই সেবা করছে, যদিও তাদের উদ্দেশ্য তা নয়।

একইভাবে মানুষেরা নিজেদের ঘরের দরজা ও দেয়ালের সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থব্যয়ে তাতে (মক্কার) মসজিদের আদলে ক্ষুদ্র মসজিদের আকৃতি খোদাই করে থাকে। মক্কা হচ্ছে (এই) সম্মানের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আর এর সম্মান আরো বৃদ্ধি পায় যেহেতু সেটি তাদের (দরজায় বায়তুল্লাহ শরীফের আকৃতি খোদাইকারী মুসলমানদের) প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না।

সূফী-দরবেশমণ্ডলীর মাহাত্ম্যের কোনো পার্থিব উপমা হয় না। আল্লাহর কসম, হ্যাঁ, তাঁদের মাকাম উচ্চ এবং মহান, কিন্তু তা স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে। উদাহরণস্বরূপ, ধরো তুমি একখানি রুপার দিরহাম ছাদের ওপর



স্থাপন করলে, আর তার নিচে রাখলে একখানি সোনার মুদ্রা। তবুও সবদিক দিয়ে সোনাটি শ্রেষ্ঠ নয় কি? অনুরূপভাবে, তুষ চালনির ওপরে অবস্থিত এবং শস্যকণা ওর নিচে পতিত হয়; কিন্তু তুষ কীভাবে শস্যকণার চেয়ে 'উঁচু' হতে পারে? শস্যকণার এই শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীতে এর অবস্থান থেকে আগত নয়, বরং ওই বাস্তবতার জগৎ হতেই আগত।

## উপদেশ বাণী - ২৫

মওলানা রূমী (রহ:)-এর আস্তানায় বা দরবারে কেউ একজন প্রবেশ করেন। এমতাবস্থায় মওলানা বলেন: তিনি পছন্দনীয় ও বিনয়ী, ঠিক যেমনটি ফলে বোঝাই কোনো গাছের ডাল; যেটি ফলের ভারে একেবারে ঝুলে পড়েছে। ফলবিহীন গাছের ডাল মাথা উঁচু করে থাকে, যেমনটি সাদা উঁচু ও সরু গাছবিশেষ দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু যখন ওই ফল সকল সীমা অতিক্রম করে, তখন মানুষেরা ডালের নিচে খুঁটি দেয়, যাতে তা একদম পড়ে না যায়।

হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয়ী। এই জগৎ ও পরবর্তী জগতের সমস্ত ফল-ই তাঁর ডালে রয়েছে সুশোভিত, তাই তিনি নিঃসন্দেহে অন্য সবার চেয়ে অধিকতর বিনয়ী। তিনি (খোদা) বলেন, "কেউই রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর আগে সালাম দিতে পারেননি।" রাসূলে পাক (দ:)-এর আগে কেউ সালাম দিতে পারেননি, কেননা তিনি বিনয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং (কারো সাথে সাক্ষাতের সময়) সর্বপ্রথম সালাম দিতেন। অন্যরা যদিও বা কখনো কখনো প্রথমে সালাম দিতে পেরেছেন, তথাপিও তাঁরা কথা বলার আগে তাঁর বিনয় সর্বগ্রাসী ছিল; এটি এই কারণে যে সবাই বিনয়ের এ সালাম তাঁর কাছ থেকেই শিখেছিলেন এবং তাঁরা কোনো কথা বলার আগেই তাঁর সালাম নিজেদের অন্তরের গভীরে শুনতে পেতেন।

প্রাচীন যুগের মানুষ এবং বর্তমান যুগের মানুষ যা কিছুর ওপর মালিকানা রাখেন, তার সবই রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর এক ছায়াবিশেষ। যদিও কোনো ব্যক্তির ছায়া তাঁর আগে প্রবেশদ্বার পেরিয়ে যেতে পারে, তবুও তিনি-ই

প্রথম। সত্য হলো, তাঁর ছায়া আগে আগে যায় বলে দৃশ্যমান হলেও ওই ছায়া তো তাঁর থেকেই আগত। তাই সেটি সর্বদা (তাঁর) পিছু পিছু অনুসরণ করে থাকে।

আমাদের প্রশংসনীয় গুণ ও বিনয় বর্তমান সময়ে সৃষ্ট হয়নি; এসব অণুকণা সেই আদ্যকাল হতেই অস্তিত্বশীল ছিল, যা আল্লাহতা'লার সর্বপ্রথম সৃষ্ট পয়গম্বর (হুযূর পাক)-এর অংশ ও কণা হতে এসেছিল। এ জমানায় এসে এগুলো দৃশ্যমান হলেও এগুলোর ঔজ্জ্বল্য ও মহিমা কিন্তু প্রাচীন। এর মূল জ্যোতি অবশ্য একেবারেই অধিকতর খাঁটি ও উজ্জ্বলতর এবং আরো বিনম্র ছিল।

কিছু মানুষ বিষয়সমূহের শুরুটুকু দেখেন, আর কিছু মানুষ দেখেন পরিণতি। যাঁরা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেখেন, তাঁরা মহান ও ক্ষমতাবান; কেননা যদিও তাঁদের দৃষ্টি ওই মুহূর্তের প্রতি নিবদ্ধ থাকে, তবুও তাঁরা এর পরবর্তী জগতের প্রতি চোখ রাখেন। কিন্তু যাঁরা সূচনাটুকু দেখেন, তাঁরা আরো শ্রেয়। কেননা, তাঁরা বলেন, "কেন শেষ অবধি দেখা চাই? প্রারম্ভে গম বপন করলে তো যবের ফলন হবে না। আর যব রোপণ করলে তো গম ফলবে না।" তাই তাঁদের দৃষ্টি সূচনার দিকেই নিবদ্ধ থাকে।

ওপরে উল্লেখিত মহান ব্যক্তিবৃন্দ হতে শ্রেয়তর অন্য আরো ব্যক্তিবৃন্দ আছেন, যাঁরা সূচনা বা সমাপ্তি কোনোটির দিকেই তাকান না, তাঁদের মস্তিষ্কে প্রারম্ভ বা সমাপ্তির চিন্তা প্রবেশ করে না; কেননা তাঁরা খোদার মাঝে মাস্ত্ তথা নিবিষ্ট। তবে যারা দুনিয়াবী বা পার্থিব বস্তু নিয়ে নিমগ্ন, তারা শুরু বা শেষ কোনোটি-ই দেখতে পায় না; তাদের ক্ষেত্রে এটি মারাত্মক অবহেলা হতে সৃষ্ট, আর তারা নির্বোধ লোকদের জাবনা বটে।

অতএব, আল্লাহওয়ালা পুরুষ ও নারী (সম্ভবতঃ আদম ও হাওয়া) হচ্ছেন ভিত্তিস্তম্ভ। এরশাদ হয়েছে:

"আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করতাম না।"

[হাদীসে কুদসী]

(পৃথিবীতে) যা কিছু অস্তিত্বশীল - সম্মান ও বিনয়, কর্তৃত্ব ও উচ্চ স্তর - এগুলোর সবই তাঁদের কাছ থেকে প্রাপ্ত আমাদের উত্তরাধিকার। সকল



বৈশিষ্ট্য-ই হলো তাঁদের ছায়া, কেননা সব কিছুই তাঁদের কাছ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

এই হাত যা-ই করুক না কেন, তা রূহ তথা আত্মার ছায়া হিসেবে সেগুলো করে থাকে। কেননা, আত্মার ছায়া হাতকে নির্দেশনা দেয় বা পরিচালনা করে। কিন্তু সত্য হলো, রূহের কোনো ছায়া নেই। তবুও এর ছায়াহীন একখানি ছায়া আছে, ঠিক যেমনটি 'মানে' (অর্থ)-এর আকারহীন একটি আকার আছে। রূহের ছায়া যদি আমাদের ওপরে না বিস্তৃত হতো, তাহলে আমাদের গোটা শরীরই অকেজো হয়ে যেতো। আমাদের হাত কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরতে পারতো না, আমাদের পা কীভাবে হাঁটতে হয় তা-ও জানতো না, আমাদের চোখ ও কান-ও বিভ্রান্ত হতো। অতএব, বাস্তবে এসব ক্রিয়া আত্মা হতেই আগত, আর তাই শরীর হচ্ছে রূহের জিহ্বারই একটি হাতিয়ার।

অনুরূপভাবে, এমন একজন পুণ্যাত্মা আছেন, যিনি তাঁর যুগের খলীফা (অর্থাৎ, খোদার প্রতিনিধি)। এরা হলেন সর্বজনীন রূহ, আর মানবজাতির রূহগুলো তাঁদেরই শরীরের মতো। এ জগতের মানুষ যা কিছু করে, সবই তাঁদের ছায়াতলে। কারো কারো কর্ম ত্রুটিপূর্ণ হলে তা এ কারণে যে, সর্বজনীন আত্মা নিজ ছায়া ওইসব মানুষের মাথার ওপর থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। কেউ পাগল হয়ে পাগলামো করলে সবাই বোঝেন যে যুক্তি তথা বিচার-বিবেচনা তার কাছ থেকে তিরোহিত হয়েছে এবং নিজ ছায়া আর তার ওপর ফেলছে না। এমতাবস্থায় ওইসব লোক রূহের ছায়া ও আশ্রয় হতে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করে।

রূহ হচ্ছে ফেরেশতার আত্মীয়। যদিও ফেরেশতাদের নিশ্চিত আকৃতি বিদ্যমান, আর রূহের তা নেই, তথাপিও উভয় একই প্রকৃতি ধারণ করে এবং একই রকম আচরণ করে। এ দুইটি সত্তা সকল দিক থেকেই যেখানে অনুরূপ বা সাদৃশ্যপূর্ণ, সেখানে আকৃতির বিষয়টি দ্বারা যেন আমরা ধোকায় না পড়ি। কোনো ফেরেশতার আকৃতিকে লুপ্ত করা হলে আত্মা ছাড়া কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। অতএব, ফেরেশতাকুল হলেন রূহের মূর্ত প্রকাশ।

মোম দিয়ে একটি পাখি তৈরি করা যায়, যা পালক ও ডানা দ্বারা পূর্ণ, কিন্তু সেটি তো মোম-ই। তোমরা সেটিকে গলিয়ে ফেল্লে তার মাথা ও

পা, পালক ও ডানা যে আবার মোমে পরিণত হবে, তা কি তোমরা দেখো না? তাতে অন্য কোনো কিছু-ও অবশিষ্ট থাকবে না। এ থেকে আমরা জানি, কোনো নির্দিষ্ট আকৃতিতে এটি মোমেরই মূর্ত প্রকাশ, কিন্তু মোম ছাড়া কিছুই নয়।

অনুরূপভাবে, বরফ-ও পানি ছাড়া কিছু নয়। তোমরা যখন তাকে গলিয়ে ফেলো, তখন কেবল তার আকৃতি-ই গলে যায়।

মানবকুলকেও এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছিল: তাঁরা (সম্ভবতঃ ফেরেশতাকুল) কোনো ফেরেশতার পালককে নিয়ে একটি গাধার লেজে বেঁধে দিয়েছিলেন এই আশায় যে, হয়তো ফেরেশতার দীপ্তি ও সঙ্গ দ্বারা গাধাটি ফেরেশতায় পরিণত হতে পারে। এমতাবস্থায় এই গাধা যদি মানুষে রূপ নেয়, তাতে কী চমৎকারিত্ব নিহিত? খোদাতা'লা তো সবই করতে পারেন।

কোনো শিশু জন্ম নিলে সে একটি গাধার চেয়েও খারাপ অবস্থায় থাকে, কেননা সে তার হাত দিয়ে ময়লা ধরে মুখে চাটে। তার এ কাজ বন্ধ করতে তার মা তাকে পিট্টুনি দিতে বাধ্য হন। তবে এক্ষেত্রে গাধাটি কিছুটুকু পার্থক্য করতে জানে; সে মূত্রত্যাগ করার সময় তার পা ফাঁক করে দাঁড়ায়, যাতে মূত্র পা বেয়ে না পড়ে। কিন্তু গাধার চেয়ে খারাপ অবস্থায় পতিত শিশুটি এক সময় আল্লাহতা'লার (ক্ষমতাবলে) নারী বা পুরুষে পরিণত হয়। তাহলে আল্লাহ পাক গাধাকে মানুষে পরিণত করলে তাতে বিস্ময়ের কী আছে? আল্লাহতা'লার দ্বারা সংঘটিত কোনো কিছুতেই আশ্চর্য হওয়ার কারণ নেই।

পুনরুত্থানের সময় প্রত্যেকেরই দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কথা বলবে। দার্শনিকবর্গ এটিকে রূপকভাবে বর্ণনা করে থাকেন। তারা বলেন: হাত যখন কথা বলবে, হয়তো তখন কোনো চিহ্ন, যেমন দাগ বা ফোড়া, তার চামড়ার ওপর দৃশ্যমান হবে। এমতাবস্থায় আপনি এক অর্থে বলতে পারবেন যে হাতটি কথা বলেছে, কেননা এটি তথ্য দিয়েছে এই মর্মে, "আমি জ্বালাপোড়া সৃষ্টিকারক কোনো কিছু খেয়েছিলাম, যার দরুন এরকম হয়ে গিয়েছি।" কিংবা হাতে আঘাত লেগে কালো হয়ে গিয়েছে। এসব চিহ্ন কোনো ঘটনা বিবৃত করে, যেমন "একটি ছুরির আঘাত



লেগেছে", বা "কোনো কালো পাত্রের সাথে আমার ঘষা লেগেছে।" এই দার্শনিকবর্গের জন্যে আফসোস!

সুন্নী উলামাবৃন্দ বলেন: আল্লাহ মাফ করুন! না, তা নিশ্চয়-ই নয়! হাত-পা জিহ্বার মতোই কথা বলবে। পুনরুত্থান দিবসে মানুষ নিজের অতীত কর্মকে অস্বীকার করে বলবে, "আমি চুরি করিনি।" কিন্তু তার হাত সাক্ষ্য দেবে, "হ্যাঁ, তুমি চুরি করেছো, কেননা আমি-ই তা নিয়েছিলাম।" তারা তখন নিজেদের হাতের দিকে তাকিয়ে বলবে, "তুমি তো আগে কখনো কথা বলোনি, এখন কীভাবে কথা বলতে পারছো?" এমতাবস্থায় হাত জবাব দেবে, "আল্লাহতা'লা আমাদের বাকশক্তি মঞ্জুর করেছেন, ঠিক যেমনটি তিনি সব কিছুকেই কথা বলার সামর্থ্য দিয়েছেন। তিনি দরজা ও দেয়ালকে, পাথর ও মাটিকে তা মঞ্জুর করেছেন। এতে আশ্চর্যের কী আছে?"

তোমরা জিহ্বা দ্বারা কথা বলো, সেটি স্রেফ একটি গোস্তের টুকরো। তোমাদের হাত-ও তাই। তোমাদের জিহ্বা কি যুক্তি-বিবেচনাসমৃদ্ধ ছিল? তবু খোদাতা'লা যখন সেটিকে কথা বলতে আদেশ করেন, তখন সেটি বাকশক্তি পায়।

কথা বলা হয় শ্রোতার গ্রহণ (-ক্ষমতা/সামর্থ্য) অনুসারে। ভাষণ হচ্ছে জলাধার হতে প্রবাহিত পানির মতো। পানি কীভাবে জানবে তারা তাকে কোথায় পাঠাবে - শশাক্ষেতে, না পেঁয়াজ কিংবা গোলাপ বাগানে? কিন্তু আমি এটি জানি, পানি যেখানে মুষলধারায় নেমে আসে, সেখানকার জমি তৃষ্ণার্ত (উর্বর) ও বিশাল (বিস্তীর্ণ)। কিন্তু যদি শুধু এক ফোঁটা প্রবাহিত হয়, তবে সেই জমি ক্ষুদ্র - যেন স্রেফ একটি ছোট ফলের বাগান, কিংবা একটি ক্ষুদ্র উঠোন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান, "আল্লাহতা'লা শিক্ষার্থীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী শিক্ষকের জিহ্বায় জ্ঞান-প্রজ্ঞার প্রেরণা যোগান।" আমি একজন চর্মকার; চামড়া প্রচুর, কিন্তু আমি পায়ের মাপ অনুযায়ী চামড়া কাটি এবং সেলাই করি।

আমি তোমার দর্পণ,
জানি তোমারই মাপের বর্ণন,
যতোখানি তোমার (আত্মিক) গঠন,
ততোটুকু-ই আমার ভাণ্ডারের ধন। [ভাবানুবাদ]

একটি কেঁচো মাটির নিচে অন্ধকারে বাস করে। এর কোনো চোখ বা কান নেই, কেননা এটি যেখানে বাস করে সেখানে ওগুলোর কোনো প্রয়োজনই নেই। যেহেতু প্রয়োজন নেই, সেহেতু কেঁচোকে চোখ-কান কেন দেয়া? আল্লাহতা'লার চোখ ও কানের অপ্রতুলতা নেই এবং তিনি কৃপণ-ও নন, কিন্তু তিনি প্রয়োজন বা চাহিদা মোতাবেক দিয়ে থাকেন। এছাড়া অন্য সবই বোঝায় পরিণত হয়। খোদার জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও করুণা বোঝা অপসারণ করে; তিনি এর পরিপন্থী কোনো কিছু কীভাবে করতে পারেন? উদাহরণস্বরূপ, তুমি কাঠমিস্ত্রির যন্ত্রপাতি কুড়াল, করাত ইত্যাদি দর্জিকে দিলে তার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে দেবে। কেননা, তারা সেগুলো দিয়ে কাপড় সেলাই করতে পারবে না। অতএব, আল্লাহ পাক চাহিদা/প্রয়োজন মোতাবেক দান করেন, এর বেশি নয়।

কেঁচো যেমন মাটির নিচে অন্ধকারে বাস করে, তেমনি মানুষ-ও এই পৃথিবীর অন্ধকারে বাস করে তৃপ্ত; আর তাদের স্বর্গীয় জগতের কোনো প্রয়োজন-ই নেই এবং (খোদাপ্রদত্ত) দিব্যদৃষ্টির প্রতিও নেই কোনো আকাঙ্ক্ষা। চোখের অন্তর্দৃষ্টি বা কানের উপলব্ধি তাদের কী ব্যবহারে আসবে? দুনিয়াতে তাদের কাজকর্মের জন্যে প্রয়োজন তাদের যে চোখগুলো, শুধু সেগুলোই। যেহেতু অপর জগতের প্রতি তাদের কোনো আকাঙ্ক্ষা-ই নেই, সেহেতু তাদেরকে কেন অন্তর্দৃষ্টি দেয়া, যেটি তাদের জন্যে অর্থহীন হবে?

ভেবো না দরবেশবৃন্দ এ পথে আর করেন না ভ্রমণ,
জীবনের সকল বিষয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত জন,
খোদার অচিন আশেক্ব-ভক্তগণ,
তোমার চোখে তাঁদের রহস্য করতে না পেরে দর্শন,
বৃথা আত্মগর্বে অলীক ধারণা করছো পোষণ,
কেউ বুঝি ওই পুরস্কার আর করতে পারবে না অর্জন। [ভাবানুবাদ]

এই জগৎ চলেছে অনবধনতার মধ্য দিয়ে। অনবধানতা না হলে পার্থিব জগৎ অবশিষ্ট থাকতো না। আল্লাহকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, পরবর্তী জগতের ধ্যান, মাস্তি তথা মত্ততা, এবং (আত্মিক) উচ্ছ্বাস - এসবই ওই আধ্যাত্মিক রাজ্যের রূপকার। যদি এই প্রকৃত আকাঙ্ক্ষাগুলো মানুষের সামনে নিজেদের প্রকাশ করতো, তাহলে বিশ্বব্যাপী একটি (সর্বগ্রাসী)



বহির্গমন দেখা দিতো। কেউই আর অবশিষ্ট থাকতো না। কিন্তু আল্লাহতা'লা দুটো জগতকেই অস্তিত্বশীল রাখতে চান; আর তাই তিনি দুজন সহকারী নিয়োগ করেছেন - একজন অনবধানতা, অপরজন অবধানতা, যাতে উভয়লোক-ই সমৃদ্ধ হতে পারে।

## উপদেশ বাণী - ২৬

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: তোমরা যে আমার প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দয়া প্রদর্শন ও সমর্থন জ্ঞাপন করো তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও মূল্যায়নে আমার যদি ঘাটতি দেখা যায়, তবে তা দম্ভ বা অনীহা থেকে নিঃসৃত নয়; এমনটিও নয় যে আমি তোমাদের মহব্বত ও অনুগ্রহের প্রতিদানের গুরুত্ব সম্পর্কে না জানার দরুন এটি হয়েছে। বরঞ্চ আমি তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টার নির্মলতা হতে এ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আছি যে এসব তোমরা আন্তরিকভাবে করে থাকো আল্লাহরই খাতিরে, আর তাই তোমাদেরকে ধন্যবাদ দেয়ার ব্যাপারটি আমি আল্লাহর কাছেই ছেড়ে দিয়েছি। আমি তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানানোতে ব্যাপৃত হলে, মৌখিক সম্মান প্রদর্শন ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলে, তাতে এমনটি মনে হবে যেন আল্লাহতা'লা তোমাদের জন্যে যে রত্নভাণ্ডার বরাদ্দ রেখেছেন তা হতে কিছু অংশ ইতোমধ্যেই দান করা হয়েছে, পুরস্কারের কিছু অংশ ইতোমধ্যেই পরিশোধ করা হয়েছে।

বিনয়ী মনোভাব, ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও অভিনন্দন, এসব পার্থিব আনন্দ-ফুর্তি। কিন্তু যখন তোমরা সম্পদ ও পদ-পদবী ত্যাগ স্বীকারের মতো দুনিয়ার দুঃখকষ্ট ভোগ করেছো, তখন পার্থিব আনন্দ-ফুর্তি কীভাবে সন্তোষজনক প্রতিদান হতে পারে? তাই আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি না, কেননা ওই পুরস্কার পুরোপুরিভাবে আল্লাহতা'লার তরফ থেকেই আসা উচিত।

কেউই ধনসম্পদ ও সম্পত্তি খেতে পারে না। ধনসম্পদ তালাশ করা হয় কেবল এটি যা কিছু বহন করে আনে, তারই খাতিরে; এটি নিজে যা, তার খাতিরে কিন্তু নয়। ধনসম্পদ দ্বারা মানুষ ঘোড়া কেনে, আরো কেনে যুবতী দাসী-বাঁদি ও গোলাম। অতঃপর তারা এসব সম্পদ ও সম্পত্তি

প্রদর্শন করে থাকে, যাতে অন্যরা প্রশংসা করে ও অভিনন্দন জানায়। অতএব, এ বিষয়টি খোদ পৃথিবী-ই, যাকে অতো উঁচুতে তুলে ধরা হয়েছে; আর এটি পৃথিবী-ই যার প্রশংসা করা হচ্ছে এবং যার প্রতি অভিনন্দন জানানো হচ্ছে।

বুখারা অঞ্চলের শায়খ নাসসাজ একজন সম্মানিত আধ্যাত্মিক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। জ্ঞানী-গুণী ও মহান ব্যক্তিবর্গ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেন এবং তাঁরই পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে থাকতেন। শায়খ ছিলেন অক্ষরজ্ঞানহীন। কিন্তু মানুষ তাঁর কুরআনের তাফসীর ও মহানবী (দ:)-এর হাদীসের শরাহ (ব্যাখ্যা) শুনতে পছন্দ করতো। তিনি বলতেন, "আমি আরবী জানি না। তোমরা কুরআন মজীদের কোনো আয়াত অনুবাদ করো যাতে আমি ওর অর্থ বলতে পারি।" তারা আয়াত অনুবাদ করলে তিনি ব্যাখ্যা আরম্ভ করতেন এবং সেটির মধ্যে নিহিত সত্য প্রকাশ করে দিতেন। তিনি বলতেন, "রাসূলুল্লাহ (দ:) অমুক অবস্থায় ছিলেন যখন তিনি এই আয়াতখানি তেলাওয়াত করেছিলেন। এর শানে নুযূল তথা অবতীর্ণ হওয়ার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এরকম ছিল।" অতঃপর তিনি ওই হাল তথা অবস্থার আধ্যাত্মিক স্তর বা পর্যায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেন - ওর উৎপত্তি যেসব কারণে হয়েছিল এবং মহানবী (দ;) কীভাবে সেই হালত অর্জন করেছিলেন, তারও বিবরণ দিতেন।

একদিন হযরত আলী (ক:)-এর কোনো এক বংশধর নির্দিষ্ট কোনো বিচারকের পাশে দাঁড়িয়ে তার ভূয়সী প্রশংসা করছিলেন এই কথা বলে, "দুনিয়াতে কোথাও আর এরকম বিচারক দ্বিতীয়টি নেই। তিনি ঘুষ নেন না। স্রেফ খোদাতা'লার ওয়াস্তেই কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা সুদৃষ্টি ব্যতিরেকে তিনি ন্যায়বিচার করেন।" শায়খ নাসসাজ যখন একথা শোনেন, তিনি উত্তর দেন, "ওই বিচারক ঘুষ নেন না বলা নিশ্চিতভাবে মিথ্যে কথা। আপনি হযরত আলী (ক:)-এর একজন সম্মানিত বংশধর হয়ে তার মুখের ওপর (মানে সামনে) তারই প্রশংসা করেন এবং অভিনন্দন জানান এই কথা বলে যে তিনি ঘুষ নেন না। এটি ঘুষ নয় কি? এর চেয়ে উত্তম ঘুষ আর কী-ই বা হতে পারে?"

শায়খ তিরমিযী একবার বলেন, "সাইয়্যেদ বুরহানউদ্দীন সত্যকে কতো সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে ফুটিয়ে তোলেন! এর কারণ হলো তিনি



মাশায়েখ আল-কেরামের অনেক বইপত্র, (ভেদের) রহস্যপূর্ণ রচনাবলী ও লেখনী অধ্যয়ন করেছেন।" জনৈক সূফী (দরবেশ) উত্তর দেন, "কিন্তু আপনিও তো সেগুলো নিয়ে গবেষণা করে থাকেন। আপনি কেন তাঁরই মতো আলোচনা করেন না?" শায়খ তিরমিযী এর জবাবে বলেন, "আসলে বুরহানউদ্দীন মহা আধ্যাত্ম-সাধনা ও (এই তরীকায় পূর্ণতা) অর্জন করেছেন।" এমতাবস্থায় ওই সূফী বলেন, "এ কথা আপনি প্রথমাবস্থায়ই বলেননি কেন? আপনি যা পড়েছেন শুধু তা-ই বারবার বলতে জানেন; সেটি-ই (মূল) পার্থক্য। কিন্তু আমরা এখন এমন বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করছি যেটি বইপত্রের চেয়েও শ্রেয়তর। আপনিও তো সে সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন!"

খুব কম মানুষ-ই অপর জগৎ সম্পর্কে যত্নবান। মনুষ্যকুল অন্তরে এই দুনিয়ার প্রতি সামগ্রিকভাবে আসক্ত। কেউ কেউ এসব (ধর্মতত্ত্ব) শিক্ষা অন্বেষণ করে খোদাতা'লার (সৃষ্ট) রুটি খাওয়ার জন্যে, আর কেউ কেউ ওই রুটিকে সতর্ক পরীক্ষা করার জন্যে। তারা এসব বাণী শিখতে চায় স্রেফ সেগুলোকে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে। বস্তুতঃ এসব বাণী এক সুন্দরী বধূর মতো; যদি কোনো সুন্দরী যুবতীকে আবারো বিক্রি করার লক্ষ্যে ক্রয় করা হয়, তাহলে সে কীভাবে তার ক্রয়কারীকে ভালোবাসতে পারে, অথবা তাকে আপন মনপ্রাণ সপে দিতে পারে? যেহেতু ওই সওদাগরের আনন্দ স্রেফ (এধরনের) বেচাকেনা হতেই প্রাপ্ত, সেহেতু সে কার্যতঃ নপুংসকের মতোই। সে নারীটিকে কিনেছে বিক্রি করার জন্যে, কিন্তু তাকে নিজের জন্যে পাবার মতো পুরুষত্ব সে ধারণ করে না।

কোনো চমৎকার ভারতীয় তরবারি যদি এক কাপুরুষের হাতে পড়ে, তাহলে সে সেটি বিক্রি করতে নেবে। কোনো শক্তিশালী পাহলভী ধনুক যদি তার হাতে পড়ে, তাহলে সে সেটিও বিক্রি করে দেবে; কেননা তার হাতে এতো জোর নেই যে সে ধনুকটিতে তীর বসিয়ে টানবে। সে ওই ধনুকটি কামনা করে স্রেফ ওর রশির মূল্যের কারণে, কিন্তু খোদ ওই রশিটির সামর্থ্য সে রাখে না। এটি বিক্রি করে যে মূল্য আসবে, সে শুধু তাতেই আসক্ত। এধরনের ব্যক্তি যখন ধনুকটি বিক্রি করে দেয়, সে গাল রাঙানোর মিহি লালচে পাউডার ও নীল কেনার জন্যেই তা করে থাকে।

এছাড়া আর কী-ই বা তার করা উচিত? চমৎকার! এর চেয়ে উত্তম আর কী-ই বা সে কিনতে পারে?

এসব বাণীর কোনো মানে নেই, (তরীকতপন্থী) মুরীদের কাছে ছাড়া! অতএব, সাবধান! একথা বলো না, "আমি বুঝতে পেরেছি।" এসব কথা তুমি যতো বেশি বুঝবে, ততোই এগুলো বোঝা থেকে দূরে অবস্থান করবে। এগুলোর মানে-মতলব উপলব্ধি না করার মধ্যেই নিহিত। তোমার সকল সমস্যা, দুর্ভাগ্য ও হতাশা এধরনের উপলব্ধি থেকেই উদ্ভূত। এই উপলব্ধি তোমার জন্যে এক শেকলস্বরূপ। কোনো কিছু যদি অর্জন করতেই চাও, তাহলে এটি থেকে তোমাকে (পালিয়ে) বাঁচতে হবে।

তুমি বলছো, "আমি সাগরে আমার ভেড়ার চামড়ানির্মিত পানি ধারণের পাত্র পূর্ণ করেছি, কিন্তু সাগরটি এতো বিশাল যে ওই পাত্রে ধারণ করা অসম্ভব ছিল।" এটি একদম উদ্ভট কথা। তুমি যদি বলতে "আমার ভেড়ার চামড়ানির্মিত পানির পাত্র সাগরে হারিয়ে গিয়েছে", তাহলে তা চমৎকার হতো! সেটি-ই বিষয়টির মূল বটে। যুক্তি হচ্ছে ভালো এবং উপকারী, যতোক্ষণ সেটি তোমাকে রাজাধিরাজের (মানে খোদার) দরবারে উপস্থিত না করে। একবার তাঁর দরজায় পৌঁছুলে যুক্তিকে ছুঁড়ে ফেলো, কেননা ওই মুহূর্তে যুক্তি তোমার জন্যে স্রেফ ক্ষতি, মহাসড়কের দস্যু ছাড়া কিছু নয়। শাহেনশাহ'র দরবারে উপস্থিত হলে তাঁর প্রতি তুমি নিজেকে সমর্পণ করো; ওই সময় কীভাবে এবং কেন প্রশ্নগুলোর কোনো প্রয়োজন-ই তোমার নেই।

উদাহরণস্বরূপ, তোমার আছে একখানি অ-সেলাইকৃত বস্ত্র, যেটি তুমি আলখাল্লা বানাতে চাও। যুক্তি তোমাকে দর্জির কাছে নিয়ে আসে। ওই মুহূর্ত পর্যন্ত যুক্তি চমৎকার। কেননা, তা বস্ত্রটিকে দর্জির কাছে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ঠিক সে সময়-ই যুক্তিকে ভুলে যেতে হবে এবং তোমাকে পুরোপুরিভাবে দর্জির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। একইভাবে, তুমি যখন অসুস্থ তখন যুক্তি খুব ভালো, কেননা তা তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসে। এরপর কিন্তু যুক্তি তোমার কোনো কাজে আসবে না, কেননা ডাক্তারের পরামর্শের কাছে তোমাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।



তোমার সাথীবৃন্দ খোদার জন্যে তোমারই এশক্-মহব্বতের গোপন আর্তি শুনতে পায়। তারা যখন তোমার কাছে আসবে, তুমি তখন জানতে পারবে তাদের মধ্যে কে প্রকৃত গুণের অধিকারী - যে গুণ হচ্ছে রূহ তথা আত্মার সংবেদনশীলতা। উটের পালে কামভাবে উত্তেজিত (মদ্দা) উটকে তার চোখ, হাঁটার ভঙ্গি ও নিঃশ্বাস দেখে সহজেই চেনা যায়।

"তাদের চিহ্ন রয়েছে তাদের চেহারাতেই - সেজদার চিহ্ন।" [সরাসরি অনুবাদ]

যদিও বৃক্ষের শেকড়-ই পানি পান করে, তথাপিও ওই পানি পানের ফলাফল তুমি তার ডালপালা, পাতা ও ফলের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করে থাকো। যে গাছ জলপান করে না, সেটি মরে যায়। এটি কীভাবে গোপন থাকতে পারে?

তুমি তাদের উচ্চ গলার আওয়াজ শুনতে পাবে, কেননা তুমি যে একটিমাত্র বাক্য উচ্চারণ করো, তা থেকে তারা অনেক প্যারাগ্রাফ উপলব্ধি করতে পারে; আর একটিমাত্র অক্ষর থেকে তারা সমস্ত মর্মবাণী বুঝতে সক্ষম। তারা কুরআন অধ্যয়নকারী ব্যক্তির মতোই। কোনো কুরআন তাফসীরগ্রন্থের প্রথম শব্দটি যেই মাত্র তারা শোনে, অমনি তারা এর সমস্ত মৌলিক বিষয় ও প্রশ্ন বুঝতে পারে। কেননা, তারা এর উৎস সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। তারা ওই একটি শব্দের ওপরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক সিদ্ধান্ত যেন দেয় একথা বলে, "এই বিষয়ের অন্তর্নিহিত অনেক কিছু আমি জানি এবং বহু কিছু আমি দেখতে পাই, যেহেতু আমি রাত-দিন কাজ করেছি এবং অধ্যয়ন করেছি, আর রত্নভাণ্ডারও খুঁজে পেয়েছি।"

"আমি কি আপনার বক্ষ সম্প্রসারণ করিনি?" [সরাসরি অনুবাদ]

এই বক্ষ সম্প্রসারণ অনন্ত, অসীম। একবার যখন ওই সম্প্রসারিত সত্যের স্বাদ আস্বাদিত হয়েছে, তখন একটিমাত্র ইশারা থেকে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারি। কিন্তু কোনো শব্দ হতে নবিশ ও অনভিজ্ঞরা কেবল ওই একটি শব্দেরই অর্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। তারা কী-ই বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও (আত্মিক) উচ্ছ্বাসের অধিকারী হতে পারে?

শ্রোতাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কথা বলা হয়। নবিশ ও অনভিজ্ঞরা যদি জ্ঞান-প্রজ্ঞাই (গবেষণা করে) বের করতে না জানে, তাহলে তা বের হয়ে

আসবে কীভাবে? একবার তারা তা আত্মস্থ করতে পারলে জ্ঞান-প্রজ্ঞা তাদের অন্তরকে পরিপূর্ণ করবে। কিন্তু তারা বলে, "আল্লাহরই দোহাই, কথা কেন বলা হয় না?" এর জবাব হলো, "আল্লাহরই দোহাই, এই জ্ঞান-প্রজ্ঞা কেন তোমরা আত্মস্থ করো না?" যে ব্যক্তি শোনার সামর্থ্যকে দমিয়ে রাখে, সে বক্তার মাঝে বক্তব্য রাখার প্রেরণাকেও দমিয়ে ফেলে।

মহানবী (দ:)-এর জমানায় কোনো এক অবিশ্বাসী লোকের একজন মুসলমান গোলাম ছিলেন, যিনি প্রকৃতই একজন পুণ্যাত্মা ছিলেন। একদিন সকালে ওই অবিশ্বাসী লোকটি তার গোলামকে নির্দেশ দেয়, "(গোসলের জন্যে) গামলা আনো, আমি স্নান করতে হাম্মামখানায় যাচ্ছি।" পথের মধ্যে তারা মহানবী (দ:)'কে অতিক্রম করে, যিনি তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)'কে সাথে নিয়ে মসজিদে নামায পড়ছিলেন। ওই গোলাম তার মালিককে বলেন, "মনিব, আল্লাহর ওয়াস্তে এই গামলাটি কিছুক্ষণের জন্যে ধরুন যাতে আমি কিছু সেজদা দিতে পারি। এরপর আমি আপনার খেদমত করবো।"

মসজিদে প্রবেশ করে তিনি নামায পড়েন। এমতাবস্থায় মহানবী (দ:) ও তাঁর সাহাবা (রা:)-বৃন্দ মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু ওই গোলাম সেখানে একাকী অবস্থান করতে থাকেন। তাঁর মালিক মধ্য-সকাল পর্যন্ত তাঁর জন্যে অপেক্ষা করার পর চিৎকার করে বলে, "এই গোলাম, বেরিয়ে এসো!" ওই গোলাম উত্তর দেন, "তাঁরা আমাকে ছাড়ছেন না, যেহেতু কর্ম সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করেছে।" ওই অবিশ্বাসী মালিক মসজিদের ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দেখতে চেষ্টা করে কে তার গোলামকে ছাড়ছে না। সে একটি জুতো ও (মনুষ্য) ছায়া ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখতে পায় না। কারোর নড়াচড়াও দেখতে পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় মালিকটি বলে, "তাহলে তোমাকে বেরিয়ে আসতে দিচ্ছে না লোকটি কে?" ওই গোলাম উত্তর দেন, "তিনি-ই, যিনি (মানে খোদাতা'লা) আপনাকে ভেতরে আসার অনুমতি দেননি, আর সেই একই সত্তা যাঁকে আপনি দেখতে পাবেন না।"

মানুষ সবসময় নিত্যনতুন জিনিস দেখতে চায়, যা তারা এখনো দেখেনি। রাত-দিন তারা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চায়। তারা এমন যে কোনো বস্তুর দাস, যেটি এখনো তারা উপভোগ করেনি; কিন্তু তারা



ইতোমধ্যে যেগুলো শুনেছে বা বুঝেছে, সেগুলোর ব্যাপারে বিরক্ত এবং সেগুলো হতে পলায়মান-ও। এ কারণেই দার্শনিকবর্গ খোদাতা'লার (রূহানী) দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এ কথা বলে, "আপনারা যে বস্তু দেখে বিরক্ত হন, তা সত্য (হক্ব) হতে পারে না।" সুন্নী উলামা-এ-কেরাম (এর জবাবে) বলেন, "এটি ঘটতে পারতো যদি খোদাতা'লা স্রেফ এক-রংওয়ালা হতেন। কিন্তু সত্য হলো, তিনি শত রংয়ে আবির্ভূত হন, প্রতিটি মুহূর্তেই।"

"প্রতিদিন-ই তিনি (খোদা) কোনো কাজে ব্যস্ত হন।" [সরাসরি অনুবাদ]

আল্লাহ পাক যদি লক্ষবার নিজেকে প্রকাশ করতেন, কোনোবারই অপর কোনোবারের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হতো না। প্রতিটি মুহূর্তে তুমি তাঁর প্রকাশ প্রত্যক্ষ করো, কিন্তু (তাঁর) কোনো কাজ-ই অন্য কোনো কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। সুখ ও আনন্দের সময় তুমি দেখতে পাও এর এক রকম প্রকাশ, আর কান্নার সময় আরেক ধরনের প্রকাশ। ভয়-ভীতির সময় তুমি দেখো এক চেহারা, আর আশা-ভরসার সময় দেখো আরেক। যেহেতু আল্লাহতা'লার সৃষ্টি ও কর্ম অন্তহীন বিভিন্নতা ধারণ করে, যা একে অপরের মতো নয়, সেহেতু তুমি নিশ্চিত হতে পারো যে তাঁর পবিত্র সত্তার প্রকাশ-ও অন্তহীন বিভিন্নতা ধারণ করে। তুমিও খোদার বহ্নিশিখার এক স্ফূলিঙ্গ হয়ে প্রতিটি মুহূর্তে সহস্রবার পরিবর্তিত হও এবং কখনোই এক রকম থাকো না।

খোদার কিছু নির্দিষ্ট অন্বেষণকারী আছেন যাঁরা কুরআন মজীদ হতে তাঁর (খোদার) দিকে ধাবিত হন। (তাঁরই) মনোনীত আরো ঘনিষ্ঠ কিছু আছেন যাঁরা আল্লাহর কাছ থেকেই আগত, আর এখানে (এ মর্ত্যে) কুরআন মজীদকে পেয়ে জানেন যে এটি খোদাতা'লা-ই অবতীর্ণ করেছেন।

"নিশ্চয় আমি অবতীর্ণ করেছি এই যিকর, এবং আমি নিজেই সেটির সংরক্ষক।" [সরাসরি অনুবাদ]

ব্যাখ্যাকারীবৃন্দ বলেন যে এই উদ্ধৃতি কুরআনের, কিন্তু এটি এ-ও বোঝায়, "আমি তোমার মাঝে এক বৈভব দেখতে পেয়েছি - এক অন্বেষণ, এক আকাঙ্ক্ষা। আমি তা সংরক্ষণ করবো, বিনষ্ট হতে দেবো না; বরঞ্চ তার ন্যায়সঙ্গত পরিণতিতে পৌঁছে দেবো।"

একবার তুমি 'আল্লাহ' বল্লে তোমার ওপর নেমে আসা সমস্ত দুর্যোগে অটল, অবিচল থেকো। কোনো এক ব্যক্তি মহানবী (দ:)-এর দরবারে এসে তাঁকে বলেন, "সত্যি আমি আপনার প্রতি মহব্বত রাখি।" হুযূর করীম (দ:) বলেন, "যা বলো সে সম্পর্কে সতর্ক হও।" ওই ব্যক্তি আবার বলেন, "আমি আপনাকে ভালোবাসি সত্য।" রাসূলুল্লাহ (দ:) বলেন, "সতর্ক হও তুমি যা বলো তা থেকে।" তিনি আবার বলেন, "নিশ্চয় আমি আপনাকে মহব্বত করি।" অতঃপর মহানবী (দ:) বলেন, "এখন এর ওপর অটল হয়ে দাঁড়াও, কেননা আমি আমার নিজ হাতে তোমাকে (মানে তোমার নফসকে) হত্যা করবো। তোমার জন্যে আফসোস!"

মহানবী (দ:)-এর কাছে আরেক ব্যক্তি এসে বলেন, "আমি এই ধর্ম চাই না। কসম খোদার, এটি আপনি ফেরত নেন। আপনার ধর্মে যেদিন থেকে দাখিল হয়েছি, সেদিন থেকে একদিনের তরেও শান্তি পাইনি। আমার ধনসম্পদ নিঃশেষ হয়েছে, আমার স্ত্রী আমায় ত্যাগ করেছে, আমার সন্তানকে (খুঁজে) পাওয়া যাচ্ছে না, আমার মান-মর্যাদা ধূলিসাৎ হয়েছে, আমার শক্তি ক্ষীণ হয়েছে, এমন কী আমার কামভাব-ও তিরোহিত হয়েছে।" রাসূলুল্লাহ (দ:) উত্তর দেন, "তুমি কী আশা করেছিলে? আমাদের ধর্ম যেখানে যায়, সেখান থেকে ওই ব্যক্তির (নফসের) মূলোৎপাটন না করে এবং তার ঘর (অন্তর) পরিষ্কার না করে আর ফিরে আসে না।"

"(অন্তর) পরিশুদ্ধ জন ছাড়া কেউই খোদার সান্নিধ্য অর্জন করতে পারবে না।" [সরাসরি অনুবাদ]

যতোক্ষণ তোমার মধ্যে বিরাজ করবে আত্মপ্রেমের ন্যূনতম চিহ্ন, খোদা ততোক্ষণ তাঁর চেহারা মোবারক তোমাকে প্রদর্শন করবেন না। তুমি তাঁর নৈকট্যের যোগ্য হবে না। তোমাকে অবশ্যঅবশ্য-ই নিজের (নফসের) প্রতি এবং দুনিয়ার প্রতি উদাসীন হতে হবে যাতে বন্ধু (খোদা) তাঁর পবিত্র চেহারা দেখাতে পারেন। অতএব, যখন-ই আমাদের ধর্ম কোনো অন্তরে বসতি স্থাপন করে, সেটি ওই অন্তরকে খোদার দরবারে হাজির না করা এবং অসত্য সবকিছু হতে সম্পর্কোচ্ছেদ না করা পর্যন্ত নিজের হাতকে গুটায় না।



মহানবী (দ:) ওই ব্যক্তিকে আরো বলেন, "তোমার কোনো শান্তি নেই, কেননা এই দুঃখের উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাকে তোমার ইতিপূর্বেকার আনন্দ-ফুর্তি হতে খালি করা। যতোক্ষণ তোমার পেট খাবারে পূর্ণ থাকে, ততোক্ষণ তোমাকে নতুন খাবার খেতে দেয়া হয় না। মলমূত্র ত্যাগের সময় আমরা কিছু খাই না। কিন্তু যখন আমাদের পেট খালি ও ক্ষুধার্ত হয়, আমাদেরকে খাবার দেয়া হয়। অতএব, ধৈর্য ধারণ করো এবং দুঃখকে বরণ করো, কেননা দুঃখী হওয়া তোমার নিজকে খালি করা বটে। তুমি শূন্য হলেই খুশি প্রবেশ করতে পারবে - যে খুশির কোনো দুঃখ নেই, যে গোলাপের কোনো কাঁটা নেই, যে শরবতের উদরপূর্তিজনিত কোনো পীড়া নেই।"

রাত-দিন কেন তুমি নীরব পরিবেশ ও বিশ্রাম তালাশ করো? এগুলো তো এ দুনিয়ায় পাওয়া যাবে না। অথচ এক মুহূর্তের তরেও তুমি এসব জিনিস অন্বেষণ হতে ক্ষান্ত দাও না। এই পৃথিবীতে যে আরাম ও শান্তির দেখা তুমি পাও, তা বিজলি চমকের মতোই, যেটি (দ্রুত) অতিক্রান্ত হয় কিন্তু কখনোই স্থায়ী হয় না। আর এই বিজলির চমকটি কী ধরনের জানো? এর সাথে রয়েছে প্রবল শিলাবৃষ্টি ও তুষারপাত এবং দুঃখকষ্ট ও ভোগান্তি। উদাহরণস্বরূপ, কেউ আনাতোলিয়া (তুরস্কে অবস্থিত অঞ্চল) অভিমুখে রওয়ানা হলো। সে সেখানে পৌঁছুনোর আশায় কায়সারিয়া'র দিকে গেল, আর কখনোই ওই পথ থেকে ফেরত এলো না, যদিও ওই পথে আনাতোলিয়ায় পৌঁছুনো একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু অন্যজন লেংচা ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও আনাতোলিয়া'র রাস্তা ধরেই এগোলো; তবু সে-ই গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। কেননা, সেখানেই আনাতোলিয়াগামী রাস্তার যে হয়েছে শেষ।

এই জগৎ কিংবা পরলোকের কোনো কাজ-ই দুঃখকষ্ট ছাড়া নয়। অতএব, তোমার দুঃখকষ্টকে পরবর্তী জগতের জন্যে একান্তভাবে নিয়োজিত করো, যাতে তা বৃথা না হয়। তুমি বলো, 'এয়া মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম), এই ধর্ম আপনি আমার কাছ থেকে নিয়ে যান, কেননা আমি (এতে) কোনো আরাম ও শান্তি পাচ্ছি না।' আমাদের ধর্ম গন্তব্যে না পৌঁছে কীভাবে কাউকে ছেড়ে যেতে পারে?

কোনো এক শিক্ষক দারিদ্র্যের কারণে ভরা শীত মৌসুমেও একখানি সুতোর তৈরি বস্ত্র পরিধান করতেন। দৈবক্রমে প্রবল বর্ষণের দরুন পাহাড়

থেকে স্রোতের সাথে একটি ভল্লুক নেমে আসে, যার মাথা পানির নিচে আড়াল অবস্থায় ছিল। শিশুরা তার পিঠখানি দেখে চেঁচিয়ে বলে, 'মাস্টার মশাই, চেয়ে দেখুন! একটি লোমশ চামড়ার কোট পানিতে পড়েছে, আর আপনিও শীতার্ত। অতএব, এটি আপনি গ্রহণ করুন!'

ওই শিক্ষক শীত থেকে বাঁচার চরম প্রয়োজনে লোমশ চামড়ার কোটখানা ধরতে পানিতে ঝাঁপ দেন। আর অমনি ভল্লুকটি শিক্ষকের পিঠে ওর তীক্ষ্ণ নখর বসিয়ে দেয়। ফলে পানিতে ভাসমান ভল্লুকটি ওই শিক্ষককে ধরে ফেলে।

বাচ্চারা চিৎকার করে বলে, 'মাস্টার মশাই, হয় আপনি লোমশ চামড়ার কোটটি ধরুন, না হয় তা ছেড়ে দিয়ে (পানি হতে) উঠে আসুন!'

শিক্ষক মশাই জবাবে বলেন, 'আমি তো লোমশ চামড়ার কোট ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু ওই কোট তো আমায় ছাড়ছে না। আমি কী করতে পারি?'

খোদাতা'লার এশক্ব-মহব্বত তোমাকে কীভাবে ছেড়ে যেতে পারে? আল্লাহ যে আমাদেরকে ছেড়ে যান না, সেজন্যে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কোনো শিশু যখন একদম ছোট থাকে, তখন সে তার মা ও বুকের দুধ ছাড়া কিছুই জানে না। তবু আল্লাহতা'লা শিশুটিকে ওই অবস্থায় ছেড়ে আসেন না, বরং তাকে রুটি খেতে শেখান এবং খেলতেও শেখান, আর এ উপায়েই বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তি-বিবেচনার পর্যায়ে উপনীত করেন। একইভাবে তিনি এই দুনিয়া, যেটি অপর জগতের তুলনায় শৈশবে রয়েছে, সেটিতে তোমাকে ছেড়ে যান না, বরং এমন অবস্থায় উপনীত করেন যার দরুন তুমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হও যে এটি শিশুত্ব, এছাড়া আর অন্য কিছু-ই নয়। আমি সেসব লোকের প্রতি অবাক হই, যাদেরকে শেকল দ্বারা বেঁধে জান্নাতে টেনে টেনে নিতে হবে।

"ওদের ধরে করো শেকলাবদ্ধ,
জান্নাতে এরপর করো ওদের সিদ্ধ,
অতঃপর মহাপ্রভুর মিলনে উদ্বুদ্ধ,
তাঁর সৌন্দর্যের তীরে এরপর বিদ্ধ,
অতঃপর পূর্ণতাপ্রাপ্তিতে স্নিগ্ধ।" [ভাবানুবাদ]



মৎস্যশিকারীরা একবারেই মাছ পানি থেকে টেনে ওঠান না। বড়শির কাঁটা মাছের গলায় বিঁধলে তারা একটু একটু করে টানেন, যাতে মাছটি শক্তি হারিয়ে ফেলে। এরপর তারা কিছুটুকু ছাড়েন এবং আবার টানেন - যতোক্ষণ না তা দুর্বল হয়ে পড়ে। (খোদার) এশক্ব-মহব্বতের বড়শি যখন আমাদের গলায় বিঁধে যায়, তখন খোদাতা'লাও ধীরে ধীরে আমাদের এমনভাবে কাছে টানেন, যাতে অল্প অল্প করে ওইসব মন্দ বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব আমাদের ত্যাগ করে যায়।

সাধারণ মানুষ বলেন, "নেই কোনো খোদা, খোদাতা'লা ব্যতিরেকে।" কিন্তু মনোনীত জনেরা (মানে বুযূর্গানে দ্বীন) বিশ্বাস করেন, "নেই কোনো সত্তা, (ঐশী) সত্তা ব্যতিরেকে।" কেউ একজন স্বপ্নে নিজেকে শাসক হিসেবে দেখতে পেলো; সিংহাসনে বসা অবস্থায় সে, আর আশপাশে দাঁড়িয়ে আছে সেবক, প্রাসাদ-সরকার ও রাজন্যবর্গ। সে বলে, "আমি হলাম শাসক, এবং আমি ব্যতিরেকে নেই কোনো শাসক।" একথা সে ঘুমের মধ্যে বলে। ঘুম থেকে যখন সে জেগে ওঠে এবং নিজেকে ছাড়া আর কাউকে বাড়িতে দেখতে পায় না, তখন সে বলে, "আমি-ই আছি, এবং আমি ছাড়া অন্য কেউ-ই নেই।" এটি উপলব্ধি করতে হলে কাউকে পুরোপুরিভাবে জাগ্রত হতে হবে।

প্রতিটি ধর্ম-ই অপরাপর ধর্মকে অস্বীকার করে। কোনো একটি দল বলে, "আমরাই সঠিক দল, ওহী তথা ঐশী প্রত্যাদেশ আমাদেরই অধিকারে, বাকি সব মিথ্যে।" কিন্তু বাকিরাও একই কথা বলে থাকে। অতএব, বাহাত্তরটি দল এবিষয়ে একমত যে অন্য সবাই ওহী-বিহীন। তারা ঐকমত্য পোষণ করে যে অন্য কোনো ধর্মে ওহী নেই, আর তাদের সবার মধ্য হতে একটি-ই সত্য-সঠিক পথ বিদ্যমান। তাই কোন্ পথটি সঠিক সে ব্যাপারে প্রত্যেক ঈমানদারের জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও পার্থক্য করার সামর্থ্য থাকতে হবে। এধরনের পার্থক্য করার গুণ ও জ্ঞান হচ্ছে প্রকৃত ঈমান (ধর্মবিশ্বাস)।

(দরবারি মজলিশে উপস্থিত) কেউ একজন বলেন: "(সত্য সম্পর্কে) জানে না এমন ধর্মের সংখ্যা অনেক, আর যেসব ধর্ম সেটি সম্পর্কে জানে সেগুলোর সংখ্যা কম। আমরা এগুলোর সবকে বাছাই করতে ব্যস্ত হলে তা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হবে।" [জরুরি নোট: এখানে বিভিন্ন ওহী,

যেমন তৌরাত, জাবুর, ইন্‌জিল কিতাব প্রাথমিক অবস্থায় যখন আম্বিয়া (আ:)-বৃন্দের কাছে নাযেল হয়, তখনকার সেসব ধর্ম সম্পর্কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে; বর্তমানকালের অন্যান্য ধর্মকে এতে উদ্দেশ্য করা হয়নি।]

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: যদিও এমন অনেক (ধর্ম) আছে যারা (সত্য সম্পর্কে) জানে না, তবুও তুমি (ওগুলোর) সামান্য কয়েকটি সম্পর্কে জানলেই সবগুলো সম্পর্কে জেনে যাবে। একইভাবে তুমি যখন এক মুঠোভর্তি শস্যকণা সম্পর্কে জানবে, তখন তুমি সারা বিশ্বের শস্যস্তূপগুলো সম্পর্কেই জেনে যাবে। তুমি একবার চিনির স্বাদ গ্রহণ করলে হালুয়া যদিও এক শটি পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়, তবুও ওই হালুয়ায় তুমি চিনিকে চিনতে পারবে, জানতে পারবে।

এসব কথা তোমার কাছে পুনরাবৃত্তিপ্রবণ মনে হলে সেটি কেবল একারণে যে তুমি প্রথম শিক্ষাটি-ই এখনো শিখতে পারোনি, আর তাই আমাকে প্রতিদিন এ কথা বলতেই হবে। একবার এক শিক্ষার্থীকে তিন মাস যাবৎ শিক্ষা দেয়া হয়, কিন্তু সে 'অ-তে আপেলের' বেশি কিছু শিখতে পারেনি। ওই শিশুর বাবা এসে শিক্ষককে বলেন, "আমি আপনার টিউশন-ফী দিতে কখনো ব্যর্থ হইনি। আমি কোনো সময় তা দিতে ব্যর্থ হয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে আমায় জানাবেন। আমি আরো অর্থ পরিশোধ করবো।" শিক্ষক জবাবে বলেন, "ব্যর্থতা আপনার নয়, বরঞ্চ শিশুটি এর বেশি শিখতে পারছে না।" তিনি তাঁর ওই ছাত্রকে ডেকে বলেন, "বলো, 'অ-তে আপেল'।" শিশুটি 'অ' উচ্চারণ করতে অক্ষম হয়ে বলে, "-তে আপেল।" শিক্ষক তখন তার বাবাকে বলেন, "দেখেছেন তো? যেহেতু শিশুটি প্রথম পাঠ-ই পেরোতে ব্যর্থ, এমতাবস্থায় আমি কীভাবে তাকে এর বেশি শিক্ষা দিতে পারি?" ওর বাবা তখন বলেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহতা'লারই (প্রাপ্য)।"

আমরা এক বেলা খাবারের পরে 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর (প্রাপ্য)' - কথাটি এই কারণে বলি না যে তাতে (আহারে) রুটির অভাব থাকে। বস্তুতঃ রুটি ও আশীর্বাদের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই, কিন্তু খিদে মিটে যায় এবং মেহমানদের খিদেও মিটে যায়। এই কারনেই আমরা বলি, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহতা'লারই (প্রাপ্য)।"



ঐশী প্রত্যাদেশের (ওহীর) রুটি এই দুনিয়ার রুটি হতে একদম ভিন্ন, কেননা এমন কী কোনো খিদে না থাকলেও তুমি নিজেকে জোর করে যতোখানি চাও দুনিয়ার রুটি খাওয়াতে পারো। আর যেহেতু এটি জড় বা প্রাণহীন, সেহেতু তুমি এটিকে যেখানে পছন্দ টেনে নিতে পারো। এর কোনো আত্মা নেই যা দ্বারা নিজেকে অযোগ্যদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেবে। কিন্তু ঐশী রুটি হচ্ছে জীবন্ত জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং জীবন্ত আশীর্বাদ-ও। যতোক্ষণ পর্যন্ত তুমি অন্য কোনো কিছু কামনা না করো, ততোক্ষণ এটি তোমার দিকেই অগ্রসর হয় এবং তোমার খাদ্য হয়। কিন্তু তোমার কামনা ব্যর্থ হলে তুমি আর এটিকে খেতে সক্ষম হবে না, এমন কী জোরপূর্বক-ও নয়। তখন এটি পর্দার আড়ালে লুকোয় এবং তোমাকে নিজের মুখ দেখায় না।

[মওলানা রূমী (রহ:) আউলিয়াবৃন্দের কারামত/অলৌকিক ক্ষমতা প্রসঙ্গে বলেন]: কারো জন্যে এই স্থান হতে কা'বা শরীফে মুহূর্তে উড়ে যাওয়া ততো চমৎকার কিছু নয়, যদিও আউলিয়াবৃন্দ এরকম করেছেন মর্মে অনেক ঘটনার নজির আছে। কিন্তু প্রকৃত কারামত হলো, আল্লাহ পাক তোমাকে নিচুস্তর হতে উঁচুস্তরে উন্নীত করেছেন; তুমি অজ্ঞতা থেকে যুক্তি-বিবেচনায় উপনীত হয়েছো; প্রাণহীন হতে জীবন প্রাপ্ত হয়েছো। ঠিক যেমন তুমি প্রথমাবস্থায় ছিলে মাটি ও খনিজ, আল্লাহতা'লা তোমাকে উদ্ভিদজগতে নিয়ে আসেন। অতঃপর তুমি উদ্ভিদজগত থেকে প্রাণিজগতে গমন করো, আর প্রাণিজগত থেকে গমন করো মনুষ্যজগতে। [অনুবাদকের নোট: এটি সম্ভবতঃ মানব সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনা করেছেন মওলানা রূমী (রহ:)]

এগুলোই প্রকৃত কারামত। এসব মাক্বাম ও আকৃতির মধ্য দিয়ে তুমি ভ্রমণ করেছো, একবারও চিন্তা বা কল্পনা করো নি কোথায় গিয়ে তুমি পৌঁছুবে, কোন্ রাস্তা দিয়ে তোমাকে নেয়া হবে, কিংবা কীভাবে তোমাকে আনা হবে। তথাপি তোমাকে এক শটি অন্য জগতে আনা হবে। এতে সন্দেহ কোরো না, আর এরকম কাহিনী তোমাকে বলা হলে সেগুলোতে বিশ্বাস কোরো।

খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা:)-এর সামনে এক বাটিভর্তি বিষ উপহার হিসেবে আনা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "এটি কী কাজে আসে?" তারা

উত্তরে বলে, "যখন কাউকে প্রকাশ্যে হত্যা করার কথা সর্বসাধারণ্যে পরামর্শস্বরূপ বলা যায় না, তখন আপনি এর কিয়দংশ তাকে (পান করতে) দিতে পারেন। তারা (সবার) অজান্তেই মারা যাবে। এ যদি হয় কোনো শত্রু যাকে তরবারি দ্বারা হত্যা করা যাচ্ছে না, তবে এ বিষের অল্প পরিমাণ দিয়েই তাকে গুপ্তভাবে হত্যা করা যাবে।"

হযরত উমর (রা:) বলেন, "তোমরা আমার কাছে একটি অতি উত্তম জিনিস নিয়ে এসেছো। এটি আমায় পান করতে দাও, কেননা আমার অভ্যন্তরে রয়েছে এক শক্তিধর দুশমন যাকে তরবারি বাগে পায় না। জগতে তার থেকে বড় আর কোনো শত্রু আমার নেই।"

তারা তাঁকে বলে, "এক ঢোকে পুরোটুকু পান করার কোনো প্রয়োজন নেই, বরং এক চুমুক-ই পর্যাপ্ত হবে। এই বাটিতে যে বিষ আছে, তা এক লক্ষ লোকের জন্যে যথেষ্ট। খলীফা উমর (রা:) বলেন, "আমার দুশমন-ও একজন নয়, বরং সে একাই এক সহস্রজন; আর সে এক লক্ষজনকে ধরাশায়ী-ও করেছে।"

অতঃপর হযরত উমর (রা:) পাত্রটি হাতে নিয়ে এক ঢোকে সমস্তটুকু (বিষ) পান করেন। তৎক্ষণাৎ সমবেত জনতা সবাই ঈমানদার মুসলমান হয়ে যান উচ্চস্বরে এ কথা বলে, "আপনার দ্বীন (ধর্ম) সত্য!" হযরত উমর (রা:) বলেন, "তোমরা সবাই ঈমানদার হয়ে গিয়েছো ঠিকই, কিন্তু আমার অভ্যন্তরে এই কাফের (অবিশ্বাসী) তো এখনো ঈমানদার হয়নি।"

হযরত উমর (রা:) যা কামনা করেছিলেন, তা সাধারণ মানুষের ঈমান নয়। বস্তুতঃ তাঁর ওই ঈমান ছিল, বরং এরও বেশি কিছু ছিল; সত্যি, তাঁর ছিল সত্যনিষ্ঠের ঈমানদারি। কিন্তু তিনি অন্বেষণ করছিলেন আম্বিয়া (আ:)-মণ্ডলীর পরিপূর্ণ নিশ্চিত ঈমান। সেটি-ই তিনি আশা করেছিলেন।

এক সিংহের কাহিনী পৃথিবীর আনাচে-কানাচে পৌঁছে গিয়েছিল। কথিত ছিল যে এটি বিশেষ এক গুণে গুণান্বিত। কেউ সাহসিকতার সাথে তার সামনে গিয়ে তার গায়ে স্নেহভরে হাত বুলিয়ে দিলে কোনো ক্ষতির মুখোমুখি হতো না; কিন্তু ভয় পেলে সিংহটি রাগান্বিত হতো। কখনো কখনো সে আক্রমণ-ও করে বসতো - যেন একথা বলতে, "আমার ব্যাপারে তোমার এই মন্দ ধারণাটি কী?"



কোনো এক ব্যক্তি এই গুজব শুনে বহু দূর দেশ সফর করে সিংহটিকে দেখতে যায়। এক বছর সে রাস্তার তকলিফ সহ্য করে এবং এক শহর হতে আরেক শহরে ভ্রমণ করতে থাকে। অবশেষে ওই জঙ্গলে পৌঁছে সে দূর থেকে সিংহটিকে গোপনে লক্ষ্য করতে থাকে। কিন্তু এই সিংহ-তালাশী লোকটি স্থির দণ্ডায়মান হয়ে যায়, সামনে আর অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষেরা এই লোকটিকে বলে, "এ সিংহটির প্রতি ভালোবাসাস্বরূপ তুমি এতো দীর্ঘ রাস্তা পাড়ি দিয়ে এসেছো; এই জীবের জন্যে তুমি এতো সংগ্রাম করেছো। আর এখন তুমি এতো কাছে এসেও স্থির দণ্ডায়মান কেন? এক কদম অগ্রসর হও!"

কিন্তু এ ধরনের লোকের কারোরই আরেক কদম এগোবার সাহস নেই। তারা সবাই বলে, "এ পর্যন্ত যেসব কদম বাড়িয়েছি, সেগুলোর সবই সহজ ছিল। কিন্তু এই একটি কদম-ই আমরা আর অগ্রসর হতে পারছি না।"

খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা:) ওই কদম বাড়াতে চেয়েছিলেন; সিংহের উপস্থিতিতে সিংহের দিকে এক কদম অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। ওই একটি পদক্ষেপ বিশাল ও বিরল ব্যাপার, যেটি খোদাতা'লার মনোনীত ও ঘনিষ্ঠ বান্দাদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। তথাপি এই কদম-ই প্রকৃত, আর বাকিগুলো স্রেফ পদচিহ্ন। এধরনের ঈমানদারি কেবল পয়গম্বর (আ:)-বৃন্দের কাছেই আবির্ভূত হয়, যাঁরা নিজেদের জীবনের হাতগুলো ধুয়ে (পরিষ্কার করে) ফেলেছেন।

কোনো আশেক্-ভক্ত হচ্ছেন একজন চমৎকার ব্যক্তিত্ব। আমরা এমন কী আমাদের প্রেমাস্পদসম্পর্কিত ভাবনা হতেও শক্তি, জীবন ও বৃদ্ধি লাভ করি। এটি কেন বিস্ময়কর হবে? লায়লার আত্মা মজনূনকে শক্তি যুগিয়েছিল এবং তার খোরাক হয়েছিল। তার চেহারা যদি মজনূনের ওপর এরকম ক্ষমতা ও প্রভাব ফেলতে পারে, তাহলে আল্লাহর ধ্যান হযরত উমর (রা:)-কে শক্তি যোগানোর ব্যাপারটিতে তুমি কেন বিস্মিত হচ্ছো? সেটি তো কোনো মামুলি চিন্তা ছিল না। সেটি ছিল সকল বাস্তবতার মূল আত্মা! এটি এমনই এক দর্শন যা এই পৃথিবীকে জারি রেখেছে।

তুমি বলো যে 'বাস্তবতা' তা-ই যা তুমি (চর্মচক্ষে) দেখতে পাও এবং তোমার ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করো, নতুবা সেটিকে তুমি 'কল্পনা' বলে থাকো। এর উল্টোটি-ই কিন্তু সত! এই জগৎ স্রেফ একখানা কল্পনা। আর বাস্তবতা হতে উৎসারিত হবে এ জগতের মতো এক শটি জগৎ যা একদিন পচে, গলে অদৃশ্য হয়ে যাবে। অতঃপর আরেকটি নতুন জগতের সৃষ্টি হবে, যা আগেরটি হতে শ্রেয়তর। বাস্তবতা পুরোনো বা নতুন হয় না। এগুলো হচ্ছে হাক্বীকৃত তথা বাস্তবের ক্ষণস্থায়ী অভিব্যক্তি।

কোনো স্থাপত্য-প্রকৌশলী তাদের ভাবনায় কোনো একটি ইমারতকে দেখতে পান। এটির উঁচু, দীর্ঘ ও মেঝের কোণগুলোর ব্যাপ্তি এবং উঠোনের আকৃতি তারা কল্পনা করে থাকেন। মানুষজন কিন্তু একে 'কল্পনা' বলে না। কিন্তু যখন ইমারত সম্পর্কে একেবারেই জ্ঞানহীন কেউ ওইসব বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে আলোকপাত করেন, তখন তা নিশ্চয় ভিন্ন কোনো কিছু হবে; যেমনটি মানুষ বলে থাকে, "তারা স্রেফ কল্পনা করছে।"

## উপদেশ বাণী - ২৭

সূফীবৃন্দ যেসব কথা বলেন, সে বিষয়ে প্রশ্ন না উত্থাপন করাই শ্রেয়তর, কেননা এটি (মানে প্রশ্ন উত্থাপন) তাঁদেরকে অসত্য কোনো কিছু উদ্ভাবনে বাধ্য করে। যদি কোনো বস্তুবাদী একজন সূফীকে প্রশ্ন করে, তাহলে তাঁকে উত্তর দিতেই হয়। কিন্তু সূফী-দরবেশবৃন্দ কীভাবে অবুঝ কারো সাথে পুরোপুরি সত্যপরায়ণ হতে পারেন? বস্তুবাদীর মুখ ও ঠোঁট তো এরকম উপাদেয় বা সুস্বাদু গ্রাস গ্রহণে অক্ষম। তাই মানুষের আপন আপন গ্রহণক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সূফীবৃন্দকে তাদের প্রতি উত্তর দিতে হয়, এমন উদ্ভাবিত উত্তর যা দ্বারা তারা দূর হয়ে যায়।

যদিও সূফীবৃন্দ যা উত্তর দেন তা (খাঁটি) সত্য এবং (কখনোই) মিথ্যে হতে পারে না, তথাপিও সূফী প্রথম যে জিনিসটি বলেন তা অনেক মহত্তর। এটিকে যদি প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়, তাহলে আরো সত্যসহ উত্তর দেয়াতে কী ভালাই নিহিত থাকতে পারে? এর চেয়ে বরং বস্তুবাদীকে



সূফীর প্রদত্ত অসত্য বস্তু-ই তার জন্যে উত্তম, আর তা সত্য-সঠিকের চেয়েও ঢের বেশি।

কোনো এক দরবেশের এমন এক শিষ্য ছিলো, যে তাঁর জন্যে ভিক্ষা করতো। একদিন ভিক্ষালব্ধ অর্থ দিয়ে শিষ্য তার পীরের জন্যে খাবার নিয়ে আসে। দরবেশ তা গ্রহণ করেন। ওই রাতে তাঁর সুপ্তিস্খলন/স্বপ্নদোষ হয়।

দরবেশ তাঁর শিষ্যকে জিজ্ঞেস করেন, "এই খাবার তুমি কোথায় পেয়েছিলে?"

শিষ্য উত্তর দেয়, "এক সুন্দরী নারী তা আমায় দিয়েছিল।"

দরবেশ বলেন, "আল্লাহর কসম, (দীর্ঘ) বিশ বছর আমার কোনো সুপ্তিস্খলন হয়নি। এটি ওই নারীর (প্রদত্ত) গ্রাসেরই প্রভাব।"

এটি পরিস্ফুট করে যে দরবেশবৃন্দকে সতর্ক হতে হবে; তাঁরা প্রতিটি গ্রাস-ই গ্রহণ করতে পারবেন না। কেননা, তাঁরাও (এক্ষেত্রে) সংবেদনশীল। বিভিন্ন বিষয়/জিনিস তাঁদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং দৃশ্যমান-ও হতে পারে, ঠিক যেমনিভাবে ক্ষুদ্র কালো দাগ কোনো পরিষ্কার সাদা জামার ওপর দেখা যায়। তবে অনেক বছর যাবৎ ঝুলকালি পড়া কোনো কালো জামার ক্ষেত্রে এক হাজারটি ময়লা বেয়ে পড়লেও তাতে কোনো পার্থক্য হয় না।

## উপদেশ বাণী - ২৮

খোদার অন্বেষণকারী ও এ পথের পথিকবৃন্দের দীর্ঘ বিনীত প্রার্থনা-গীত (আধ্যাত্ম) সাধনা ও ধার্মিকতায় নিয়োজিত জীবনগুলোর কাহিনী বিবৃত করে, যার প্রতিটি প্রয়াস আপন আপন বিশেষ বা নির্দিষ্ট সময়ের প্রতি বরাদ্দ। এটি যেন কোনো অভ্যেসের তত্ত্বাবধানকারী তাঁদেরকে তাঁদের সুনির্দিষ্ট কাজের দিকে টেনে নেন। উদাহরণস্বরূপ, ভোরে প্রথমে ঘুম থেকে জেগে মস্তিষ্ক শান্ত ও সৌম্য থাকাকালীন তাঁরা এবাদত-বন্দেগী ও ধ্যান-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ফলে তাঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ

সত্তার উপযোগী খেদমত/সেবা প্রদান করেন এবং তাঁদের মহান রূহ/আত্মার ব্যাপ্তির মধ্যে চলে আসেন।

(সূফী-দরবেশবৃন্দের) এক লক্ষটি সারি বা বিন্যাস রয়েছে। যিনি যতো খাঁটি হন, তাঁকে ততোই (উচ্চ মক্বামে) উন্নীত করা হয়। আধ্যাত্মিক বিকাশ বা বৃদ্ধির এ এক দীর্ঘ কাহিনী। যে কেউ এটিকে সংক্ষিপ্ত করতে চাইলে আপন প্রাণ ও আত্মাকেই সংক্ষিপ্ত করবে, শুধু আল্লাহর অনুগ্রহেই তা হয় না। আর আল্লাহর সাথে মিলনপ্রাপ্ত হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের প্রার্থনা-গীত সম্পর্কে বলতে গেলে আমাকে সমঝদারির সীমার ভেতরে থেকেই তা বলতে হবে; কেননা তাঁদের (অন্তরের) ভালোবাসা ও কণ্ঠস্বরের নির্মলতা পবিত্র রূহসমূহ, খাঁটি ফেরেশতাবৃন্দ ও সেসব দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে থাকে, যাঁদেরকে কেউই চেনেন-জানেন না একমাত্র খোদাতা'লা ছাড়া। এঁরা নীরব/নিশ্চুপ সত্তামণ্ডলী যাঁদের নামগুলো চরম হুঁশিয়ারিজনিত কারণে এ জগৎ হতে আড়াল করে রাখা হয়েছে।

তুমি তাঁদের পাশেই আসনে উপবিষ্ট, কিন্তু তুমি তাঁদেরকে দেখতে পাও না। তাঁদের ভাষণ, সালাম-সম্ভাষণ বা হাসিও শুনতে পাও না। এর মধ্যে চমকপ্রদ কী আছে? কেউ অসুস্থ হলে নানা কিছুকে দৃশ্যমান হতে দেখে, যা অন্যরা দেখতে পায় না। অথচ ওইসব (নীরব) আত্মিক সত্তা এসব দৃশ্যমান বস্তুর চেয়ে হাজার গুণ সূক্ষ্ম। কেননা, কোনো সাধারণ মানুষ অসুস্থ না হলে যেমন এধরনের দৃশ্য দেখে না বা শোনেও না, তেমনি মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত ওইসব আধ্যাত্মিক সত্তাকে তারা দেখতে পাবে না। এই (নীরব) আধ্যাত্মিক সত্তাবৃন্দ সূফী-দরবেশমণ্ডলীর পরিশুদ্ধ হালত/অবস্থা ও রাজকীয়তা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। তাঁরা ভোর হতেই (দরবেশবৃন্দকে) অবলোকন করেন, যখন অন্যান্য সহস্র ফেরেস্তা ও নির্মল আত্মা সূফী-দরবেশবৃন্দের খেদমতে অপেক্ষারত থাকেন। এ কারণেই নীরব সত্তাবৃন্দ অপেক্ষায় থাকেন নিরবধি - তাঁরা (সূফী/দরবেশমণ্ডলীর) এই প্রার্থনার বৃন্দগীতির মাঝখানে বাধা দিতে চান না, কিংবা তাঁরা যাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে চান তাঁদের মনোযোগ নষ্ট করতেও চান না।

বাদশাহ'র প্রাসাদের দরজায় গোলামবৃন্দ প্রতিদিন সকালে হাজির। তাঁদের প্রত্যেকেরই নির্ধারিত মক্বাম (স্তর), নির্ধারিত খেদমত (সেবা) ও নির্ধারিত প্রার্থনা বিদ্যমান। কেউ দূর থেকে সেবা করেন, তাঁদেরেকে



রাজা দেখেন না বা খেয়াল-ও করেন না। কিন্তু সকল গোলাম-ই জানেন তাঁদের মধ্যে কে সুলতানের উপস্থিতিতে থাকার মহাসম্মান লাভ করেছেন। বাদশাহ যখন (সভাস্থল) ত্যাগ করেন, তখন গোলামবৃন্দ ওই সম্মানিত জনকে প্রতিটি দরজা দিয়েই সেবাদানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন; কেননা রাজার প্রতি খেদমতের এর চেয়ে উত্তম আর কোনো পন্থা নেই। ওই (গোলাম) সুলতানের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, আর তাই তিনি অন্য সবার জন্যে বাদশাহের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিতে পরিণত হন।

এটি এক অত্যন্ত রাজকীয় মক্বাম (স্তর/পর্যায়), যা অবর্ণনীয় বটে। এর রাজকীয়তা স্রেফ 'রা-জ-কী-য়' বানান অথবা উচ্চারণ দ্বারা বোধগম্য হবে না। এই রাজকীয়তার এক ছোট্ট নিদর্শন-ও যদি পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ করতো, তাহলে 'র' অক্ষরটি লেখা অসম্ভব হতো, 'র' স্বরটি উচ্চারণেরও অতীত হতো, আর কোনো ইশারা বা প্রতীক-ও অবশিষ্ট থাকতো না। গোটা শহরটি নূরের সেনাদল কর্তৃক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতো।

"রাজা-বাদশাহবৃন্দ কোনো শহরে প্রবেশ করলে সেটির নিয়ম-কানুন ভেঙ্গে দেন।"

কোনো উট একটি ঘরে প্রবেশ করলে ঘর তছনছ হয়, কিন্তু ওই ধ্বংসস্তূপে পড়ে থাকে এক হাজারটি রত্ন।

"রত্ন শুধু ধ্বংসস্তূপেই পাওয়া যায়,
সমৃদ্ধ শহরে কুকুর তবু কুকুর-ই রয়।"

আমি যদি খোদার অন্বেষণকারীদের মক্বাম সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেই, তাহলে যাঁরা প্রভুর রেযামন্দি অর্জন করেছেন, মানে তাঁকে পেয়েছেন, তাঁদের আহওয়াল (আধ্যাত্মিক অবস্থাগুলো) কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবো? তাঁদের কোনো শেষ নেই, শুধু অন্বেষণকারীদেরই শেষ আছে। সকল অন্বেষণকারীর শেষ হচ্ছে (খোদার) সান্নিধ্য অর্জন। কিন্তু সে সকল জনের শেষ কোথায় যাঁরা খোদার সাথে মিলিত হয়েছেন, যে মিলনে কোনো বিচ্ছেদ-ই নেই? কোনো পাকা আঙ্গুর-ই কাঁচা আঙ্গুরে ফিরে যায় না। কোনো পাকা ফল-ই আবার কাঁচা হয় না।

"হ্যাঁ, এসব কথা নারী-পুরুষদের জানানো বৈধ নয়, কিন্তু, হে খোদা, একবার আপনার নাম উল্লেখিত হলে তাদের জন্যে একথা উৎসারিত হয়,

কসম আল্লাহর, আমি সংক্ষেপ করবো, করবো না দীর্ঘ বাক্যব্যয়, আমার জীবন নিঃশেষিত, কিন্তু আপনি তা শরবতে বদলে করেছেন মধুময়, আপনি বলেন সব-ই আপনার দান হিসেবে রয়, অতএব, (মোর) এই আত্মাখানি আপন বলে করুন গ্রহণ, হে দয়াবান অতিশয়।" [ভাবানুবাদ]

এই কাহিনী যে কেউ সংক্ষেপ করতে চাইলে (মানে শর্টকাট পথ খুঁজলে) তা এমন হবে যেন তারা সঠিক রাস্তা পরিত্যাগ করে জীবনবিনাশী বন-জঙ্গলের রাস্তা ধরবে, যেখানে তারা বলবে, "এসব গাছ দেখে মনে হয় এটি-ই ঘরে যাওয়ার সঠিক পথ।"

## উপদেশ বাণী - ২৯

আল-জাররাহ নামের এক খৃষ্টান ব্যক্তি বল্লো: "শায়খ সদরউদ্দীনের কিছু সংখ্যক সাথী (অনুসারী) আমার সাথে মদ্যপান করেছিল, আর তারা বলেছিল, 'যীশু খৃষ্ট (পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস্ সালাম) হচ্ছেন খোদা, যেমনটি তোমরা (খৃষ্টানেরা) দাবি করে থাকো। একথা আমরা সত্য বলে স্বীকার করি, কিন্তু তা গোপন রাখি এবং অস্বীকার করি যাতে আমাদের (মুসলমান) সমাজের মান-সম্মান রক্ষা হয় ।'"

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: আল্লাহ মাফ করুন! এসব কথা পথভ্রষ্টকারী শয়তানের মদ্যপানে মাতাল ওই লোকগুলোরই হতে পারে। ঈসা মসীহ (আ:) যিনি এরকম দুর্বল শরীরবিশিষ্ট হয়ে, অধিকন্তু যিনি চক্রান্তকারী ইহুদীদের কাছ থেকে বাঁচার জন্যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, আর যিনি দুই হাত লম্বাও নন, তিনি কীভাবে সাত আসমানের রক্ষাকর্তা হতে পারেন, যেগুলোর প্রতিটি ৫০০ বছর সমান দীর্ঘ, আর এক আসমান থেকে পরবর্তী আসমানে যেতে সময় লাগে ৫০০ বছর, উপরন্তু প্রতিটি পৃথিবী ৫০০ বছর সমান দীর্ঘ, আর এক পৃথিবী থেকে আরেক পৃথিবীতে যেতে সময় লাগে ৫০০ বছর? আর এ আরশের নিচে রয়েছে রূহ/আত্মাসমূহের সাগর, যার গভীরতা আরো অনেক বেশি, এমন কী এর (অর্থাৎ, আসমান ও জমিনের) মতো জিনিসেরও বহু গুণ বেশি? তোমাদের যুক্তি-বিবেচনা কীভাবে এ ব্যাপারটি মেনে নিতে পারে যে এসব কিছুর শাসক সবচেয়ে দুর্বলতম আকৃতির কেউ হতে পারেন?



উপরন্তু, (তোমাদের যুক্তি-বিবেচনা) এ কথাও কীভাবে মেনে নিতে পারে যে যীশুর জন্মলাভের আগে তিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা ছিলেন? ওয়াল্লাহ! পাপ সংঘটনকারীরা যা ভেবে নিয়েছে তার মোকাবেলায় সকল প্রশংসা আল্লাহতা'লারই জন্যে বিহিত!

ওই খৃষ্টান বলে: "তাঁর (যীশুর) শরীর স্রেফ ধুলো ছিল। ধুলো ধুলোয় মিশেছে, আর নির্মল আত্মা মিশেছে নির্মল আত্মায়।"

মওলানা রূমী (রহ:) জবাব দেন: ঈসা মসীহ (আলাইহিস্ সালাম)-এর রূহ যদি খোদা হন, তবে তাঁর আত্মা কোথায় গিয়েছে? রূহ তার উৎস ও সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করে থাকে। যদি তিনি-ই উৎস ও সৃষ্টিকর্তা হন, তাহলে তার (রূহের) কোথায় যাওয়া উচিত?

ওই খৃষ্টান বলে: "আমরা (শাস্ত্রলিপিতে) এটি-ই বিবৃত পেয়েছি, আর তাকেই আমাদের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছি।"

মওলানা রূমী (রহ:) জবাব দেন: তোমরা যদি তোমাদের পিতা-মাতার মেকি স্বর্ণ যা কালো ও খাদ মেশানো তা উত্তরাধিকারস্বরূপ পাও, তাহলে কি তোমরা সেটিকে খাঁটি ও মানসম্মত সোনা যা খাদমুক্ত তার সাথে অদলবদল করবে না? না, তোমরা ওই সোনাকেই রেখে দেবে একথা বলে, "আমরা এভাবেই যে এটিকে পেয়েছি।"

অথবা, তোমাদের পিতা-মাতা হতে তোমরা উত্তরাধিকারস্বরূপ পেয়েছো এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাত, যার চিকিসা ও চিকিৎসকের সন্ধান-ও তোমরা পেয়েছো। তোমরা কি তা গ্রহণ করছো? না, উল্টো তোমরা বলছো, "আমি আমার হাতকে পেয়েছি পক্ষাঘাতগ্রস্ত, কিন্তু আমি এটিকে (চিকিৎসা দ্বারা) পরিবর্তন করবো না।" কিংবা যদি তোমরা নোনা জলের সন্ধান এমন কোনো খামারে পাও যেখানে তোমাদের পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তোমাদেরকে যেখানে বড় করা হয়েছে, আর তোমাদেরকে যদি দেখানো হয় মিষ্টস্বাদের পানিবিশিষ্ট আরেকটি খামার যার ফসল সজীব এবং যেখানকার মানুষেরা স্বাস্থ্যবান, তাহলে তোমরা কি ওই অপর খামারটিতে বসতি স্থাপন করে রোগ-ব্যাধি নিরাময়কারী পানি পান করতে চাইবে? না, তোমরা (বরঞ্চ) বলো, "আমরা এই খামারটি এর লবণাক্ত পানি ও জরা-ব্যাধিসহ পেয়েছি, আর আমরা তা আঁকড়ে ধরে রেখেছি।"

আল্লাহতা'লা মাফ করুন! এটি তো কোনো সুস্থ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কথা বা কাজ নয়। খোদাতা'লা তোমাদেরকে তোমাদের পিতা-মাতা হতে নিজস্ব আলাদা বিচার-বুদ্ধি দিয়েছেন; দিয়েছেন তোমাদেরই পিতার দৃষ্টিশক্তি হতে আলাদা এক দৃষ্টিশক্তি; আর দিয়েছেন তোমাদের নিজস্ব পার্থক্য করার বুদ্ধি-বিবেচনা। তাহলে কেন তোমরা তোমাদের দৃষ্টিক্ষমতা ও বুদ্ধিকে নিঃস্ব করে এমন মস্তিষ্কজাত ভাবনার অনুসরণ করছো যা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত ও বিনাশ করবে?

ইউতাশ (সম্ভবতঃ শামসউদ্দীন ইউতাশ বেগলারবেগী নামের তুর্কী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি)-এর পিতা ছিলেন একজন চর্মকার। অথচ যখন তিনি (ইউতাশ) রাজার উপস্থিতিতে পৌঁছুনোর মর্যাদা লাভ করলেন, রাজা-বাদশাহদের আদব-কায়দা শিক্ষা করে তরবারি চালনায় দক্ষতা অর্জন করলেন এবং রাজাও তাঁকে সর্বোচ্চ পদমর্যাদা দান করলেন, তখন তিনি একথা কভু বলেননি, "আমি আমার পিতাকে চর্মকার হিসেবে পেয়েছি, তাই আমি এ (রাজকীয়) পদবী চাই না। হে সুলতান, আমাকে বাজারে একটি দোকান বরাদ্দ দিন যাতে আমি জুতো মেরামত করতে পারি।" সত্যি, এমন কী একটি কুকুর নিজের সমস্ত হীনতা সত্ত্বেও একবার সুলতানের পক্ষে শিকারীতে পরিণত হলে কীভাবে সে বেড়ে উঠেছিল, কীভাবে ময়লার স্তূপে ও আবর্জনাময় ভূমিতে সে ঘুরাফেরা করতো এবং (ক্ষুদ্রপ্রাণির) গলিত মাংসের আকাঙ্ক্ষা করতো, এগুলোর সবই সে ভুলে যায়। পক্ষান্তরে, সে সুলতানের অশ্বগুলোকে অনুসরণ করে শিকারে অংশগ্রহণ করে থাকে। একই অবস্থা বাজপাখিরও। সুলতান যখন তাকে প্রশিক্ষণ দেন, তখন সে আর কখনো বলে না, "আমি আমার পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাহাড়ি নির্জন আস্তানা ও মৃত জীব ভক্ষণ করার শিক্ষা পেয়েছিলাম। তাই আমি সুলতানের ঢোলের প্রতি কর্ণপাত করবো না, তাঁর শিকারের প্রতিও নয়।"

কোনো পশুর বুদ্ধি যদি নিজের পিতা-মাতা হতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বস্তুর চেয়ে উত্তম জিনিস পছন্দ করতে পারে, তাহলে একজন মানুষ, যে পৃথিবীর সকল প্রাণির চেয়ে বুদ্ধি-বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ, সে ওই পশুর চেয়ে অধম হওয়া সত্যি কেলেঙ্কারিজনক ও অপ্রীতিকর। আমরা এ থেকে আল্লাহর মাঝে আশ্রয় নিচ্ছি!



নিশ্চয় একথা বলা সঠিক যে আল্লাহতা'লা হযরত ঈসা মসীহ (আলাইহিস্ সালাম)-কে সম্মানিত করেছিলেন এবং আপন সান্নিধ্যে নিয়েছিলেন, যার কারণে যে কেউ পয়গম্বর ঈসা (আ:)-এর সেবা করলে খোদাতা'লারই সেবা করেছিলেন, যে কেউ তাঁকে মান্য করলে খোদাতা'লাকেই মান্য করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু আল্লাহতা'লা যুগে যুগে পয়গম্বর (আ:)-বৃন্দকে প্রেরণ করেছেন এবং পয়গম্বর ঈসা (আ:)-এর হাতে যেসব অলৌকিকত্ব তিনি প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের সবার হাতে সেসব অলৌকিকত্বসহ আরো অনেক কিছু প্রকাশ করেছিলেন, সেহেতু আমাদের জন্যে অবশ্য কর্তব্য হয়েছে (আখেরী জমানার) ওই মহানবী (দ:)-কে অনুসরণ করার; এটি তাঁর খাতিরে নয়, বরং খোদাতা'লারই ওয়াস্তে।

কেবল খোদাতা'লার খাতিরেই তাঁর সেবা করা যায়। অতএব, শুধুমাত্র আল্লাহকেই প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসা যায়। অন্য সবকিছুর ভালোবাসা আল্লাহতে এসেই পরিণতি পায়। তাই তুমি তাঁরই খাতিরে কোনো কিছুকে ভালোবাসো, আর তাঁরই ওয়াস্তে কোনো কিছুর তালাশ করো, যতোক্ষণ না সবশেষে তুমি খোদাতা'লায় উপনীত হও এবং তাঁরই খাতিরে তাঁকে ভালোবাসো।

"কা'বা শরীফকে বস্ত্রে সজ্জিত করা এক বৃথা আকাঙ্ক্ষা,
তোমার যতো বস্ত্রের প্রয়োজন তা স্রেফ খোদার উপস্থিতিতে থাকা।"
[ভাবানুবাদ]

জীর্ণ ও ছেঁড়া জামাকাপড় যেমন সম্পদ ও মহিমার আভিজাত্যকে গোপন করে, তেমনি চমৎকার বস্ত্র ও ভূষণ সূফি/দরবেশের চিহ্ন, সৌন্দর্য ও পূর্ণতাকে (লোকচক্ষু হতে) আড়ালে রাখে। সূফি-দরবেশের জামা যখন ছিঁড়ে যায় এবং জোড়াতালি দেয়া হয়, তখন-ই তাঁদের হৃদয়গুলো প্রকাশ পায়।

## উপদেশ বাণী - ৩০

এমন অনেক শির আছে যেগুলো সোনার মুকুট দ্বারা শোভিত, আর এমন-ও অনেক শির আছে যেগুলোর সুন্দর কোঁকড়ানো কেশরাজিকে শুধু হীরে ও সোনা দ্বারা আড়াল করা যায় না। আমাদের হৃদয়ের প্রেমাস্পদের

কোঁকড়ানো কেশ প্রেম জাগ্রত করে, আর প্রেম হচ্ছে হৃদয়ের সিংহাসন-ঘর। কিন্তু মুকুট স্রেফ ধাতু ও পাথর ছাড়া কিছু নয়।

হযরত সুলায়মান (আ:)-এর আংটি আমরা সর্বত্র খুঁজেছি। আমরা তাঁর জ্ঞানকে ধনসম্পদ হতে অনেক দূরে পেয়েছি। সম্পদ পরিত্যাগ করে আমরা ওই মনোরম রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছি। গরিবিতেই আমরা আমাদের আস্থা স্থাপন করেছি এবং আমাদের প্রেমাস্পদ (মাশূক) এতে যতোখানি রাজি হয়েছেন, অন্য কোনো কিছুতে এতোখানি রাজি হননি।

হ্যাঁ, আমি একজন পতিতাগামী ব্যক্তি [মওলানা রূমী (রহ:)-এর একথা আক্ষরিক অর্থে নয়, বরং রূপক - অনুবাদক]। আমার যৌবনকাল হতেই আমি ছিলাম প্রেম বিক্রয়কারী। আমি জানি এটি বাধার দেয়ালে ধস সৃষ্টি করে এবং অন্তরের পর্দাগুলো খেয়ে ফেলে। প্রেম-মহব্বত হচ্ছে সকল আনুগত্যের শেকড় বা মূল; বাকি সব কিছু স্রেফ অলঙ্করণ। তুমি কুরবানি না করলে তোমার অন্তরের কামনা-বাসনা কীভাবে অর্জন করবে? সব কিছু পরিত্যাগ বিলীন হওয়াতে উপনীত হয়, যে 'ফানা' তথা বিলীন অবস্থা বিচ্ছেদের অস্তিত্ববিহীন সকল সুখের উৎস।

"এবং আল্লাহতা'লা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" [সরাসরি অনুবাদ]

প্রতিটি দোকান বা তরল দাওয়াই মাঝে, প্রতিটি পণ্যে বা ব্যবসায়, এগুলোর প্রত্যেকটির রশির শেষ প্রান্তে প্রয়োজন হয় মানবাত্মার। চাহিদা না দেখা দেয়া পর্যন্ত ওই রশির শেষপ্রান্ত আড়ালে লুকোনো থাকে। প্রতিটি ধর্ম, প্রতিটি ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রতিটি (ঐশী) দান, প্রতিটি কারামত (অলৌকিকত্ব) এবং পয়গম্বর (আ:)-বৃন্দের সকল হালত (আধ্যাত্মিক অবস্থা)-এর ক্ষেত্রেই প্রতিটি রশির শেষপ্রান্ত আমাদের নাগালে রয়েছে। চাহিদা দেখা না দেয়া পর্যন্ত ওই রশির শেষপ্রান্ত অদৃশ্য থেকে যায়।

"সকল বস্তুরই হিসেব রয়েছে এবং (সেগুলো) স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ।"
[সরাসরি অনুবাদ]

কেউ একজন প্রশ্ন করেন: "ভালো ও মন্দের উৎস কি একটি, না দুটি?"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: এই দুটি বিষয়ের নিরন্তর পারস্পরিক লড়াইয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চিতভাবে এগুলোকে দুটি (আলাদা) বিষয় বলতে হবে। কেননা কোনো ব্যক্তির



পক্ষে নিজের বিরোধী হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ভালো ও মন্দের অবিচ্ছেদ্য হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলতে হয়, যেহেতু ভালো হওয়ার মানে মন্দ পরিত্যাগ করা, আর মন্দ পরিত্যাগ করা মন্দ না হয়ে অসম্ভব, উপরন্তু মন্দের উস্কানি ছাড়া কেউই ভালো কিছুকে পরিত্যাগ করে না, সেহেতু এগুলো দুটি নয়। মজুসিয়া তথা (পারসিক) অগ্নি-উপাসকবর্গ বলে যে এয়াযদান হচ্ছে উত্তম বিষয়গুলোর স্রষ্টা এবং আহরিমান সৃষ্টি করে মন্দ ও ঘৃণিত বস্তুগুলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলো কখনোই ঘৃণিত বস্তু হতে আলাদা নয়। ঘৃণিত ছাড়া কাঙ্ক্ষিতের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, কেননা আমরা যা পছন্দ করি তা সবসময়-ই আমরা যা অপছন্দ করি তার সাথে তুলনীয় হয়; আর আমরা কোনো বিষয়ের যতো মন্দ চিন্তা করি, তার ঠিক উল্টো আমরা কামনা করি। আনন্দ হচ্ছে দুঃখের শেষ; আনন্দ ব্যতিরেকে দুঃখের শেষ অসম্ভব। তাই তারা এক ও অভিন্ন।

কোনো বস্তু অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তার প্রকৃত অর্থ জানা যায় না। কারো জীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার বিচার করা যায় না, কারণ যার সূচনা মন্দ দিয়ে তা ভালো কিছু দিয়ে শেষ হতেও পারে। আর শব্দগুলো বাণীতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত কে সেগুলোর অর্থ জানতে সক্ষম?

যে কেউ কোনো সূফী/দরবেশের সমালোচনা করলে সে বাস্তবে ওই সূফীর ভালাই করে; কেননা সূফী/দরবেশ প্রশংসা হতে শরমিন্দা হন। বস্তুতঃ তিনি অহঙ্কার বা দম্ভের একজন দুশমন। তাই যে কেউ সূফী/দরবেশের নফস তথা অহঙ্কারী সত্তার সমালোচনা করলে সে প্রকৃতপক্ষে সূফীর শত্রুরই সমালোচনা করে এবং তাঁদেরকে সহায়তা করে। "বিষয়সমূহ তার বিপরীত দ্বারাই স্পষ্ট হয়।" অতএব, সূফী জানেন তাঁর সমালোচক কোনো শত্রু নয়, বরঞ্চ বন্ধু।

আমি ময়লা-আবর্জনাপূর্ণ ও কণ্টকাকীর্ণ দেয়াল দ্বারা ঘেরাও এক স্মিতহাস্যকারী উদ্যানের মতোই। যারা এটি অতিক্রম করছে, তারা এ বাগানটি দেখতে পাচ্ছে না; তারা শুধু দেখছে দেয়ালটি এবং এটিকে তারা উপহাস করছে। তাহলে কেন বাগানটি তাদের প্রতি রাগান্বিত হবে? সমালোচকবর্গ কেবল নিজেদেরকেই পেছনে টেনে ধরছে, যেহেতু উদ্যানে পৌঁছুতে হলে তাদেরকে অবশ্যই আগে দেয়াল টপকাতে হবে।

এমতাবস্থায় দেয়ালে ত্রুটি খুঁজতে গিয়ে তারা বাগান থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিচ্ছে, আর নিজেদেরই ধ্বংস ডেকে আনছে। মহানবী (দ:) বলেন, "আমি কতলের সময় হাসি।" এর মানে তিনি অবিশ্বাসীদের একটি উপায়ে হত্যা করেন, যাতে কুফফার-বর্গ এক শটি পন্থায় নিজেদেরকে হত্যা করতে না পারে। তাই তিনি কতলের সময় হাসেন। [অনুবাদকের নোট: এটি সম্ভবতঃ জ্বেহাদের সময়কার অবস্থা হতে পারে। এ ঘটনাকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়]

## উপদেশ বাণী - ৩১

চোরকে আটক করার জন্যে পুলিশ সবসময় চোরের খোঁজে থাকে, আর চোর-ও সবসময়ই পলায়মান। পুলিশের হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দেবার ও কারা বরণ করবার মতো কোনো চোর খুঁজে পাওয়া সত্যি বিরল ঘটনা। সেটি তো চোরদের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা নয়।

আল্লাহতা'লা (শায়খ) আবূ এয়াযীদকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কী কামনা করো, হে আবূ এয়াযীদ?" তিনি উত্তর দেন, "আমি আকাঙ্ক্ষা করি যাতে কামনা না করি।"

পুরোপুরিভাবে কামনা-বাসনাহীন থাকা কোনো স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা নয়, কেননা এর জন্যে নিজেকে খালি করতে হবে এবং অস্তিত্বহীন-ও হতে হবে। কিন্তু আল্লাহতা'লা আবূ এয়াযীদকে একজন নিখুঁত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত শায়খ বানাতে চেয়েছিলেন, যাতে তাঁর মধ্যে কোনো দ্বৈততা বা বিচ্ছেদ না থাকে, বরঞ্চ স্রেফ পূর্ণতাপ্রাপ্ত মিলন ও ঐক্য বিরাজ করে।

তরীক্বত তথা আধ্যাত্মিকতার পথে (আউলিয়া-দরবেশের) বিভিন্ন শ্রেণি ও আলাদা আলাদা সারি রয়েছে। কর্মপ্রচেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনার মাধ্যমে কেউ কেউ এমন মক্বাম অর্জন করেছেন, যা প্রতিটি কামনা-বাসনা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। সেটি কারো কারো আয়ত্ত্বাধীন বটে। কিন্তু অন্তরে কামনার কোনো স্পৃহাকে প্রবেশ না করতে দেয়া কারোরই আয়ত্ত্বাধীন নয়। শুধু খোদাপ্রেম-ই সেটিকে (মানে স্পৃহাকে) দূর করতে পারে।



একথা বিবৃত হয়েছে যে মহানবী (দ:) ও পয়গম্বর (আ:)-বৃন্দের পরে আর কারো প্রতি ঐশী প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হবে না। কিন্তু এটি অসত্য। একারণেই রাসূলুল্লাহ (দ:) এরশাদ ফরমান, "ঈমানদার আল্লাহতা'লার নূর (অর্থাৎ, আলো/জ্যোতি) দ্বারা প্রত্যক্ষ করেন।" কেউ যখন খোদাতা'লার জ্যোতির সাহায্যে অবলোকন করেন, তখন তিনি দেখে থাকেন সবকিছু-ই, প্রথম ও শেষ, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য। (কেননা) আল্লাহতা'লার নূর হতে কোনো কিছু কীভাবে লুকোনো বা আড়াল থাকতে পারে? কোনো বস্তু গোপন বা আড়ালে থাকলে সেটি তো খোদাতা'লার নূর হতে পারে না। অতএব, এটি-ই ঐশী প্রত্যাদেশ, তারা ঐশী প্রত্যাদেশ বলুক বা না-ই বলুক। [অনুবাদকের নোট: খোদাতা'লার কাছ থেকে প্রত্যাদেশ দুই ধরনের: (১) ওহী - যেটি পয়গম্বর (আলাইহিমুস্ সালাম)-বৃন্দের প্রতি অবতীর্ণ হয়; এবং (২) এলহাম - যেটি বিশিষ্ট উম্মত তথা আউলিয়া-দরবেশ (আলাইহিম আল-রাহমাহ)-বৃন্দের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়। দুটোই ঐশী প্রত্যাদেশ। তবে একটি প্রকাশ্য ঐশী বিধান, অপরটি ওই সূফী/দরবেশের জন্যে বা তাঁর তরীকতের অনুসারীদের জন্যে খাস্ নির্দেশ।]

সাহাবী উসমান ইবনে আফফান (রা:) যখন খলীফা হন, তখন তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন। তিনি কী বলেন তা শোনার জন্যে মানুষজন অপেক্ষা করতে থাকেন; এমতাবস্থায় তিনি নিশ্চুপ রইলেন, মুখে কিছুই বল্লেন না। মানুষের দিকে বরঞ্চ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন; আর এতে তাঁদের মাঝে এক আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাস অবস্থার সৃষ্টি হলো, যার দরুন তাঁরা চলৎশক্তি হারিয়ে ফেল্লেন, আর তাঁরা কোথায় আছেন সেটি-ও বলতে অক্ষম হলেন। এরকম একটি চমৎকার (আধ্যাত্মিক) হাল/অবস্থা এক শটি ওয়ায-নসীহত দ্বারাও তাঁদেরকে দেখানো সম্ভব হতো না। মহামূল্যবান পাঠদান ও ভেদের রহস্য উন্মোচন করা হয় এসময়েই। ওই মজলিশের শেষ অবধি তিনি শুধু এভাবেই তাকিয়ে রইলেন, কোনো কথা বল্লেন না। অতঃপর মিম্বর ত্যাগের আগ-মুহূর্তে তিনি বল্লেন, "তোমাদের জন্যে বক্তা ইমামের চেয়ে কর্মী ইমাম-ই শ্রেয়তর।"

খলীফা উসমান যিন্নুরাইন (রা:) যা বলেছিলেন তা সত্য। মানুষের (আধ্যাত্মিক) উন্নতি সাধনে সূক্ষ্মভাবে (ঐশী) নির্দেশনা পৌঁছে দেয়াই

যদি কথা বলার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বহুবার তা কথা না বলেই সাধন করা হয়েছে। সুতরাং খলীফা উসমান (রা:) যা বলেছিলেন তা সঠিক। তিনি যতোক্ষণ মিম্বরে ছিলেন, ততোক্ষণ মানুষের চোখে দৃশ্যমান কোনো বাহ্যিক কাজ তিনি করেননি; তিনি প্রার্থনা করেননি, হজ্ব-ও না, দান-সদকাহ-ও না, আল্লাহতা'লার যিকর-ও না, এমন কী খলীফার ভাষণ-ও তিনি দেননি। অতএব, জেনে রাখো, (পুণ্যদায়ক) কর্ম ও আমল স্রেফ বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরঞ্চ এসব কাজের দৃশ্যমান আকৃতি হলো রূহ বা আত্মার প্রকৃত কর্মের স্রেফ একখানি ছায়া মাত্র।

মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান, "আমার সাহাবা (সাথী)-বৃন্দ নক্ষত্র সমতুল্য; তাঁদের যে কাউকে তোমরা অনুসরণ করলে হেদায়াত তথা সত্য-সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে।" কেউ যখন (রাতের আঁধারে) কোনো তারকাকে অনুসরণ করেন এবং সেটির সাহায্যে রাস্তা খুঁজে পান, তখন তারকাটি কোনো কথা বলে না। শুধু ওই তারার দিকে তাকিয়েই রাস্তা তালাশকারী সেই অদৃশ্য পথটি পেয়ে যান এবং লক্ষ্যে পৌঁছেন। একইভাবে, খোদার আউলিয়া-দরবেশের দিকে স্রেফ তাকিয়ে থেকেই আধ্যাত্মিক পথটির সন্ধান লাভ করা সম্ভব। বিনা বাক্যব্যয়ে, বিনা প্রশ্নে, বিনা ভাষণে লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়।

সারা দুনিয়াতে উদ্ভট ও হাস্যকর কোনো কিছুকে সহ্য করার চেয়ে কঠিনতর বিষয় আর নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরো তুমি একটি নির্দিষ্ট বই অধ্যয়ন করেছো, তা সংশোধন, পরিমার্জন এবং পুরোটুকু পাঠ বা আবৃত্তি-ও করেছো। এমতাবস্থায় তোমারই পাশে উপবিষ্ট কেউ একজন বইটি সম্পূর্ণ ভুলভাবে পাঠ করলো। তুমি কি তা সহ্য করতে পারবে? না, তা একদম অসম্ভব ব্যাপার। তবে তুমি যদি বইটি কখনোই না পড়ে থাকো, তাহলে কেউ তা ভুলভাবে না সঠিকভাবে পাঠ করলো তাতে কোনো পার্থক্য হবে না; তুমি এই পার্থক্য বলতে পারবে না। অতএব, উদ্ভট ও হাস্যকর কিছুকে সহ্য করা মহা এক শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতা বটে।

আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) ও আউলিয়া (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম) নিয়ম-শৃঙ্খলাকে পরিহার করেন না। তাঁদের প্রথম নিয়মানুবর্তিতা হলো এই নফস্ তথা কুপ্রবৃত্তিপূর্ণ একগুঁয়ে সত্তা, যেটি কামনা-বাসনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাকে হনন করা। এটি-ই 'জ্বেহাদে আকবর' বা সর্ববৃহৎ



ধর্মযুদ্ধ। তাঁরা যখন এটি অর্জন করেন এবং নিজেদেরকে নিরাপত্তাপূর্ণ মক্বামে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন সঠিক ও ভ্রান্ত বিষয়াদি তাদের কাছে প্রকাশ পায়। তথাপিও তাঁরা এক মহা সংগ্রামে রত থাকেন, কেননা এই (মর্ত্যের) মরণশীল মানুষেরা সবকিছুই ভুলভাবে করে থাকে। সূফী-দরবেশবৃন্দ তা প্রত্যক্ষ করেন, আর তাঁদেরকে এগুলো সহ্য করতেই হবে। তাঁরা সহ্য না করে মরণশীল মানুষকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করলে আসমান ও জমিনে অবস্থিত কেউই মরণশীলদের পাশে এসে দাঁড়াবেন না। খোদাতা'লা আউলিয়াবৃন্দের মাঝে সহ্য করার এক মহান ও বিশাল ক্ষমতা দান করেছেন। এ কারণে তাঁরা এক শটি ভুলত্রুটির মধ্য হতে স্রেফ একটি উল্লেখ করেন, যাতে তা শুধরানো কঠিন না হয়। অন্য ভুলগুলো তাঁরা গোপন করে রাখেন এবং এমন কী প্রশংসা-ও করেন এ কথা বলে, "তোমার ওই ভুলটি সঠিক", যাতে অল্প অল্প করে মরণশীল মানুষ এই অজ্ঞতাকে জয় করতে পারে।

একই অবস্থা বিরাজমান যখন কোনো শিক্ষক একটি শিশুকে লিখতে শেখান। শিশুটি গোটা বাক্যের লাইন লেখার পর শিক্ষককে দেখানোর জন্যে ছুটে যায়। শিক্ষকের চোখে এটি ভুলে ভরা, কিন্তু তিনি শিশুটিকে উৎসাহিত করেন স্নেহভরা এ কথা বলে, "চমৎকার হয়েছে। তুমি ভালো লিখেছো। সাব্বাশ! শুধু এই অক্ষরটি পুরোপুরি ঠিক হয়নি, এটি এরকম হবে। আর এই অন্য অক্ষরটিও এরকম হবে দেখতে।" শিক্ষক ওই বাক্যের কিছু অক্ষরকে ভুল বলে চিহ্নিত করেন এবং শিশুটিকে সেগুলো কীভাবে লিখতে হবে তা দেখিয়ে দেন। বাকি সবগুলোর প্রশংসা করা হয় যাতে শিশুটির মন ভেঙ্গে না যায়। এই অনুমোদন হতে শিশুটির দুর্বলতা শক্তি সঞ্চয় করে থাকে, আর এভাবেই ক্রমান্বয়ে তাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয় এবং তাদের বিদ্যা শিক্ষার যাত্রায় সমর্থন যোগানো হয়।

আমরা আশা করি, আল্লাহতা'লা (দেশের) আমির (শাসক)-কে তাঁর মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা মঞ্জুর করবেন। সেই সাথে আরো আশা করি, আমির যেসব উত্তম (খোদায়ী) দান সম্পর্কে জানেনই না, সেগুলোও আল্লাহ তাঁকে মঞ্জুর করবেন, যাতে তাঁর অন্তর যখন ওইসব প্রকৃত খোদায়ী দান প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবেন, তখন আপন পূর্ববর্তী কামনা-বাসনা সম্পর্কে তিনি শরমিন্দা হবেন।

আমাদের নিজস্ব কল্পনারও অতীত কোনো কিছুর সন্ধান পেলে তাকেই প্রকৃত দান বলা হয়। কেননা যা কিছু কারো কল্পনায় আসে, তা তারই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সামর্থ্যের মাপের মধ্যে পড়ে। কিন্তু খোদাতা'লার দান কেবল তাঁরই ক্ষমতার মাপের আওতায় পড়ে। এটি এমন-ই এক দান-

"যা নয়ন করেনি দর্শন,
কান করেনি শ্রবণ,
কল্পনাও করেনি মানুষের মন।"

খোদার যে নেয়ামত/আশীর্বাদ সম্পর্কে তুমি ধারণা করো, তা সমস্ত কল্পনারও অতীত।

## উপদেশ বাণী - ৩২

আলিম তথা (অদৃশ্য জ্ঞানের) পরিজ্ঞাত সত্তা (মানে খোদা) হলেন নিখুঁত শায়খ। (ঐশী) প্রেরণা ও সৎ/প্রকৃত চিন্তাগুলো তাঁরই শিষ্যবর্গ, যেগুলো খোদাতা'লার সাথে তাদের নৈকট্যের মর্যাদানুযায়ী সারিবদ্ধ। প্রতিটি চিন্তা সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে সেটি পরিজ্ঞাত অবস্থার আরো কাছাকাছি চলে আসে এবং সন্দেহ হতে আরো দূরে সরে যায়।

সকল চিন্তা-ই নিশ্চয়তার বুকের দুধ পান করে থাকে এবং ফলশ্রুতিতে বেড়ে ওঠে। তত্ত্ব ও এর (ব্যবহারিক দিকের) অনুশীলন প্রতিটি চিন্তাকে হৃষ্টপুষ্ট করে থাকে, যতোক্ষণ না তা নিশ্চয়তায় উপনীত হয়। অতঃপর চিন্তা নিশ্চয়তায় রূপান্তরিত হয়, কেননা পরিজ্ঞাত অবস্থায় চিন্তা আর অবশিষ্ট থাকে না।

আজকের জগতে মাশায়েখবৃন্দ ও তাঁদের মুরীদান হচ্ছেন ওই পরিজ্ঞাত অবস্থার শায়খেরই (মানে খোদাতা'লারই) ছায়ার প্রতিফলন। যদিও শিক্ষার পদ্ধতি যুগে যুগে ও প্রজন্মের পর প্রজন্মে পরিবর্তিত হয়, তবুও মুরীদানবৃন্দ হচ্ছেন প্রমাণ এই মর্মে যে নিশ্চয়তার শায়খ (মানে মাশূক খোদাতা'লা) ও সত্যপ্রেমিক (আশেক্ব)-বৃন্দ চিরন্তন, আর এঁরা কখনোই পরিবর্তিত হন না।

ভুল ও সন্দেহপূর্ণ চিন্তা পরিজ্ঞাত শায়খেরই (মানে খোদারই) বহিষ্কৃত শিষ্যবর্গ। প্রতিদিন তারা সত্য থেকে আরো দূরে সরে যায়, এবং আরো অন্ধকারে পতিত হয়।



"তাদের অন্তরে রয়েছে এক ব্যাধি, এবং আল্লাহতা'লা তা আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।" [সরাসরি অনুবাদ]

[মালিকবৃন্দ খান খেজুর, বন্দিরা খায় কাঁটা]

"শুধু তাদের ছাড়া যারা সত্যে প্রত্যাবর্তন করেছে, আর পুণ্যদায়ক কাজ করেছে, আল্লাহতা'লা তাদের মন্দ কাজকে উত্তম কাজে পরিবর্তন করে দেবেন।" [সরাসরি অনুবাদ]

প্রতিটি অভিজ্ঞতাই আমাদেরকে নিশ্চয়তায় উপনীত করে, এটি এমন কী দুর্নীতির ক্ষেত্রেও বহাল। ঠিক যেমন ধূর্ত কোনো চোর, যিনি অনুতপ্ত হন ও পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেন, আর এঁদের সমস্ত চুরির কৌশল অতঃপর ন্যায়বিচারের পক্ষের শক্তিতে পরিণত হয়। অন্য সকল পুলিশ যাঁরা কখনো চুরির সাথে যুক্ত ছিলেন না, তাঁদের চেয়েও এঁরা অনেক বেশি নিশ্চিত। কেননা (ইতিপূর্বে) চুরি করার দরুন এঁরা চোরদের কৌশলগুলো সম্পর্কে জানেন। এমতাবস্থায় এঁরা যদি কোনো শায়খ হন, তবে নিখুঁত (কামেল তথা পূর্ণতাপ্রাপ্ত) হবেন, বিশ্বজগতের 'মরুব্বি' ও যুগের 'মাহদী' হবেন।

## উপদেশ বাণী - ৩৩

প্রত্যেকেই নিজ নিজ চাহিদা বা প্রয়োজনের মাঝে রয়েছে পড়ে। কোনো প্রাণিকেই আপন চাহিদা হতে পৃথক করা যায় না।

"তাদের সাথে দৃঢ়ভাবে এঁটে থাকে আপন চাহিদা যতো
সে তুলনায় তাদের পিতা-মাতাও ঘনিষ্ঠ নন অতো।"

ওই প্রয়োজন-ই হচ্ছে তাদের (চর্মনির্মিত) রজ্জু, যা তাদেরকে এভাবে টেনে ধরেছে; আর সেটি (গবাদি পশুর) নাকের আংটা ও শেকলের মতোই বস্তু। এমতাবস্থায় কে-ই বা নিজের জন্যে এমন রজ্জু বানাতে চাইবে? এটি একেবারেই উদ্ভট ব্যাপার; অতএব, অন্য কেউই এটি তাদের জন্যে বানিয়েছেন।

আমরা যদি নিজেদের প্রয়োজনের মাঝে পড়ে থাকি, তাহলে যিনি এই প্রয়োজন বা চাহিদা আমাদের দিয়েছেন সেই (মহান) সত্তার মাঝেও আমরা আছি। আমরা যদি সব সময় আমাদের নিজেদের রজ্জুর সাথে বাঁধা থাকি, তাহলে যিনি ওই রজ্জু টানেন সেই (মহান) সত্তার সাথে আমরা সর্বদা যুক্ত আছি। কিন্তু যদি আমাদের দৃষ্টি আমাদেরই শেকলের দিকে নিবদ্ধ থাকে, তাহলে আমরা মনোবল ও আশা হারাবো। বরঞ্চ আমাদের দৃষ্টি সেই (মহান) সত্তার প্রতি নিবদ্ধ থাকা চাই যিনি ওই শেকল ধরে রেখেছেন। তাহলেই কেবল আমরা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবো এবং নিজেদের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নেবো। কেননা ওই রশি আমাদের গলায় পেঁচানো হয়েছে যে (মহান) সত্তা তা ধরে রেখেছেন, স্রেফ তাঁরই (পরিচয়) প্রকাশের খাতিরে।

তারা (লোকে) বলে, "দূরে রও, কাছে যেয়ো না।"
"আমি কীভাবে রই দূরে যখন আপনি-ই হন আমার প্রয়োজন?
খোদা বয়োবৃদ্ধদের দেন যৌবনপূর্ণ তীব্র প্রেমানুভূতি এমন
যুবকদের যার সম্পর্কে নেই কোনো ঘুণাক্ষর জ্ঞান
বৃদ্ধ বয়স হচ্ছে মহান
শ্বেত কেশরাজি যখন হয় দৃশ্যমান
লীলাপরতা পায় বাঁধনহারা প্রাণ।"

এ রকম বয়োবৃদ্ধজন জগতকে এমন এক সজীবতাসহ দেখেন যেন এটি নতুন কোনো পৃথিবী। তাঁরা হাসেন এবং খেলেন।

লোকে জিজ্ঞেস করে, "আশি বছর পার হলে কি কেউ খেলতে পারেন?"

আমি (পাল্টা) প্রশ্ন করি, "তাঁরা কি আশি বছরের আগে খেলবেন?"

অতএব, খোদার (অন্যান্য) প্রদর্শনীর চেয়েও বৃদ্ধ বয়সের মহিমা সেরা। বসন্তকালে খোদাতা'লা তাঁর করুণা করেন প্রদর্শন - ক্ষণস্থায়ী ও স্মিতহাস্যকারী। হেমন্তকালে বৃদ্ধ বয়সের বিজয়কেতন ওড়ে। দুনিয়ার বাগান হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত। আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান অকৃপণ দান হয় তিরোহিত।

"খোদাতা'লা সকল বস্তু বা বিষয়েরও অতীত
বিনাশী শক্তি যাঁকে আঘাত দ্বারা করতে পারে না রহিত।"



## উপদেশ বাণী - ৩৪

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: আমি এক স্বপ্নে আমাদের বন্ধুকে একটি বন্য জন্তুর সুরতে দেখতে পেলাম, যার ওপর চড়ানো রয়েছে শেয়ালের চামড়া। সে একটি ছোট ঝুল-বারান্দায় অবস্থান করছিল এবং সিঁড়ির নিচের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি তাকে ধরবার জন্যে গেলে সে হাত উত্তোলন করে আর এদিক-সেদিক লম্ফঝম্প দিতে থাকে। এমন সময় আমি জালাল আল-তাবরিযীকে বেজির আকৃতিতে দেখতে পাই।

আমাদের বন্ধু শরমিন্দা হয়ে সরে যায়, কিন্তু আমি তাকে ধরে ফেলি যখন-ই সে আমাকে কামড়াতে চেষ্টা করে। আমি তার মাথা আমার পায়ের নিচে রেখে সজোরে চাপ দেই যতোক্ষণ না ওর ভেতরের সব কিছু বেরিয়ে আসে। তার ত্বকের মসৃনতার দিকে তাকিয়ে আমি বলি, "এটি সোনা, দামি পাথর, মণি-মাণিক্য ও তার চেয়েও চমৎকার বস্তু দ্বারা পূর্ণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে।" অতঃপর আমি বলি, "আমি যা চেয়েছিলাম, তা নিয়েছি। শরমিন্দা হও, লাজুক জন। যেখানে ইচ্ছে যাও, যেদিকে পছন্দ সেদিকে লাফ দাও!"

সে এখানে সেখানে লাফ দিতে থাকে, কেননা সে কারো অধীনে শিষ্যত্ব বরণের ব্যাপারে ছিল শঙ্কিত, তবু ওই শিষ্যত্ব বরণের মাঝেই নিহিত রয়েছে তার প্রকৃত সুখ। নিঃসন্দেহে তার গঠন হয়েছে (আকাশের) উল্কা খণ্ডসমূহ হতে; তার হৃদয় ছিল সিক্ত, আর সে সবকিছু সম্পর্কে জানতে ছিল আগ্রহী। সে এই পথে যাত্রা শুরু করেছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে এবং এ পথে চলতে ও এতে আশ্রয় নিতে কঠিন সংগ্রামেও রত হয়েছিল; কিন্তু তা তো যথেষ্ট নয়। কেননা ঐশী করুণার শায়খকে এ ধরনের জাল দিয়ে ধরা যায় না। আল্লাহওয়ালা শায়খ যদি সাধু-সজ্জন হন, তাহলে তাঁকে কে পাবে তথা কে তাঁর মন জয় করবে, সে সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। তাঁর পূর্ণ সম্মতি ছাড়া তাঁকে ধরা যাবে না।

আমাদের বন্ধু আড়ালে বসে তার শিকারের জন্যে ছিল অপেক্ষারত, কিন্তু ওই শিকার তারই লুকোবার গর্তে তাকে তার ধূর্ততাসহ লক্ষ্য করছিলেন। ওই শিকার হলেন স্বাধীন প্রতিনিধি যাঁর পন্থাগুলোর কোনো সীমা-

পরিসীমা নেই। তিনি সবার গর্তের পাশ দিয়ে গমন করেন না। তিনি নিজে যে ছক কাটেন, শুধু সে পথ দিয়েই গমন করে থাকেন।

"খোদার দুনিয়া বিস্তৃত,
কিন্তু তাঁর জ্ঞান নয়কো কারো উপলব্ধিকৃত,
সমঝদারি কেবল তাঁরই ইচ্ছায় হয় অর্জিত।"

এমন কী এসব সূক্ষ্মতাও যখন আমাদের বন্ধুর জিহ্বায় ও সমঝদারিতে নীত হয়, তখন সেগুলো বিনষ্ট হয় এবং সেগুলোর ত্রুটিহীন নির্যাস-ও হারিয়ে যায়; ঠিক যেমনি দূষণীয় বা প্রকৃত সব কিছু খোদার আশেক্বের জিহ্বায় ও সমঝদারিতে নীত হলে (ঐশী) করুণা ও অলৌকিকত্বের মোড়া বাঁধা অবস্থায় তা পরিবর্তিত হয়। তুমি কি দেখো না পয়গম্বর মূসা (আ:)-এর হাতের লাঠি কীভাবে আগের অবস্থায় আর থাকেনি? একই অবস্থা হয়েছিল মহানবী (দ:)-এর (হেলান দেয়ার) ক্রন্দনরত কাঠের এবং হাতের লাঠির; পয়গম্বর মূসা (আ:)-এর মুখের দোয়ার (সম্ভবত সামিরীকে দেয়া লা'নত); আর পয়গম্বর দাউদ (আ:)-এর হাতের লোহার। এগুলো আর আদি রূপ বা আকৃতিতে ছিল না, বরঞ্চ পরিবর্তিত হয়েছিল। তদ্রূপ সূক্ষ্ম জ্ঞান ও পবিত্র বাণী অন্ধকার জগতের হাতে ও পশুসুলভ মস্তিষ্কের কবলে পড়লে একইভাবে পরিবর্তিত হয়।

"কা'বা তোমার প্রার্থনার জন্যে এক সরাইখানা,
যতোক্ষণ প্রার্থনা তোমা হতে, তোমার সত্তা পায় ওর শরীকানা।"

[অনুবাদকের নোট: মওলানা রূমী (রহ:) 'আমাদের বন্ধু' বলতে নফস তথা প্রত্যেকের অন্তঃস্থ অবাধ্য সত্তাকে বুঝিয়েছেন। আর 'আল্লাহওয়ালা শায়খ' হলেন পথপ্রদর্শনকারী সূফি/দরবেশ]

অবিশ্বাসী ব্যক্তি খায় সাতটি পেটে, আর জালাল আল-তাবরিযী খায় সত্তরটি পেটে। যদিও বা তার পেট একটি, তবুও সে খায় সত্তরটি পেটে। কেননা যা কিছু ঘৃণিত তা তো ঘৃণিত-ই, ঠিক যেমন মাহবূব তথা প্রেমাস্পদের কাছ থেকে নিঃসৃত সবকিছু-ই মহব্বতের বস্তু। আমাদের বন্ধু যদি ফিরে আসতো, তাহলে আমি তার সাথে বসে তাকে পরামর্শ দিতাম, আর তাকে ছেড়ে যেতাম না, যতোক্ষণ না সে জালাল তাবরিযীকে তাড়িয়ে দিতো। কারণ জালাল আমাদের বন্ধুর বিশ্বাস,



অন্তর, রূহ ও বিচার-বিবেচনাকে দূষিত করেছে। জালাল যদি আমাদের বন্ধুকে ধর্মের ক্ষেত্রে দুষ্ট না করে মদ্যপান ও গায়িকা নারীতে আসক্তির মতো দুর্নীতিপূর্ণ আচার-আচরণে অভ্যস্ত করতো, তাহলে সেটিকে ঐশী করুণার শায়খ কর্তৃক সারিয়ে তুলে সঠিক পথে নিয়ে আসা যেতো। কিন্তু জালাল আমাদের বন্ধুর ঘরকে জায়নামায দ্বারা পূর্ণ করেছে। জালালকে সেগুলোতে মুড়িয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া গেলে আমাদের বন্ধুকে হয়তো এই বিভ্রান্তি হতে রক্ষা করা যেতো। কিন্তু জালাল কুৎসার বিষবাষ্প দ্বারা আল্লাহওয়ালা শায়খের প্রতি আমাদের বন্ধুর আস্থা নষ্ট করেছে, আর শায়খের মুখের ওপর তাঁকেই টিটকারি করেছে; অথচ এদিকে আমাদের বন্ধু (এ ব্যাপারে) কিছুই বলছে না এবং নিজের বিনাশ সাধন করে চলেছে। জালাল আমাদের বন্ধুকে ফাঁদে ফেলেছে (ধর্মীয়) জপমালা, প্রার্থনাগীত ও জায়নামাযের মাধ্যমে।[অনুবাদকের নোট: আজকাল বাতেলপন্থীরা বাহ্যিক আমলের ফাঁদে পড়ে নফসে আম্মারা'কে পুষছে এবং আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া (রহ:)-এর প্রতি বৈরী মনোভাব গ্রহণ করেছে। ভণ্ড পীরেরাও এতে সামিল হয়েছে।]

হয়তো খোদাতা'লা কোনো দিন আমাদের বন্ধুর চোখ খুলে দেবেন, আর সে দেখতে পাবে কী জিনিস তার সর্বনাশ ডেকে এনেছে এবং আল্লাহওয়ালা শায়খের কৃপাদৃষ্টি হতে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তখন সে তার নিজ হাত দ্বারা নিজেকেই আঘাত করবে আর বলবে, "তুমি আমার বিনাশ সাধন করেছো। এখন আমি এতো বড় বড় অপরাধ ও মন্দ কাজের দায়ভার বহন করছি। এটি ঠিক তাঁরা তাঁদের (ঐশী) প্রত্যাদেশে যেমনটি দেখেছিলেন - আমার মন্দকর্ম, বদ ও পাপপূর্ণ আক্বীদা-বিশ্বাস, যা আমার পিঠের আড়ালে গৃহের কোণায় লুকিয়ে ছিল। আমি নিজেই সেগুলো আল্লাহওয়ালা শায়খের কাছ থেকে লুকোচ্ছিলাম এবং দাফন করে দিচ্ছিলাম, অথচ তিনি সবই দেখছিলেন এবং বলছিলেন, 'তুমি কী লুকোচ্ছো? আল্লাহর মর্জিতে আমি যদি ওইসব নিকৃষ্ট (মন্দকর্মের) আকার-আকৃতিকে ডেকে পাঠাতাম, তাহলে সেগুলো দৃশ্যতঃ এক-এক করে আমার সামনে এসে নিজেদের আসল চেহারা ও প্রকৃতি তুলে ধরতো, আর তারা নিজেদের মধ্যে কী কী লুকিয়ে রেখেছে, তা-ও ফাঁস করে দিতো'।" আল্লাহতা'লা এমন সব রাহাজান লোকদের শিকারে

পরিণত সকলকে রক্ষা করুন, যারা (তথাকথিত) 'ভক্তি'র মাধ্যমে খোদার পথকে রুদ্ধ করে থাকে।

রাজা-বাদশাহবর্গ পোলো (ঘোড়ায় চড়ে হকির মতো লাঠি ও বলের এক খেলা-বিশেষ) খেলেন আপন আপন শহরের মানুষদের কাছে একজন যোদ্ধার দক্ষতার নজির স্থাপনের উদ্দেশ্যে - যেটি শত্রুর মাথা কেটে মাটিতে গড়িয়ে দেয়া, ঠিক যেমনটি (পোলো'র) বল মাঠে গড়াগড়ি খায়; আর যেমনটি যোদ্ধাদের সম্মুখ সমরের জন্যে আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণ চলে। মাঠের এই খেলাটি যুদ্ধের মতো গুরুতর বিষয়েরই একটি প্রতীক বটে। একইভাবে, আল্লাহওয়ালা বুযূর্গবৃন্দ আধ্যাত্মিক প্রার্থনা ও ওয়াজদ (দৈহিক স্পন্দন) পালন করেন তাঁদেরই অন্তরের গভীরতার কিছুটুকু প্রদর্শন করতে; তাঁরা কীভাবে তাঁদের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও পথকে অনুসরণ করেন তা দেখাতে। যে গায়ক তাঁদের নেতৃত্ব দেন, তিনি মসজিদে প্রার্থনারত মুসলমানদের ইমামের মতোই। মানুষেরা তাঁকে অনুসরণ করেন। তিনি ধীরে গাইলে তাঁরা আস্তে আস্তে ওয়াজদ করেন। তিনি দ্রুত লয়ে গাইলে মানুষেরা দ্রুত ওয়াজদ করেন। তাঁরা খোদার আহ্বানকে নিজেদের অন্তরের গভীরে কতোখানি অনুসরণ করেন, এটি কেবল তারই এক প্রতিফলন।

## উপদেশ বাণী - ৩৫

আমি অবাক হই সেসব লোককে দেখে যারা কুরআন মজীদ মুখস্থ (হেফয) করেছে, অথচ সূফীবৃন্দের রূহানী হাল তথা আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্পর্কে অবুঝ (মানে অজ্ঞ)। কুরআন মজীদে যেমনটি ঘোষিত হয়েছে: "এবং প্রত্যেক নিকৃষ্ট হুকুমকর্তা ব্যক্তিকে মান্য করবে না।"

কুৎসা রটনাকারী লোকেরা যখন এটি পাঠ করে, তখন তাদের দিকে তাকাও; বস্তুতঃ তারাই সেসব লোক যারা বলবে, "অমুক-তমুকের কথা মান্য করো না, তারা যা-ই বলুক না কেন। কেননা তারা তোমাদের বিরুদ্ধে একই (রকম) আচরণ করবে।"

"গীবতকারী, নিন্দুক,
ভালাইয়ের মস্ত প্রতিবন্ধক।"



কুরআন মজীদ এক বিস্ময়কর মন্ত্রকার। এটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের কানে স্পষ্টভাবে কথা বলে, যাতে তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। অথচ তারা একটুও বুদ্ধিমান নয়। তারা আল-কুরআনের প্রকৃত খোরাকের কোনো মর্ম-ই বুঝতে সক্ষম নয়।

"আল্লাহতা'লা একটি সীলমোহর মেরেছেন" [সরাসরি অনুবাদ]

আল্লাহতা'লা কতো বিস্ময়করভাবে করুণাময়! তিনি সীলমোহর মেরেছেন তাদের অন্তরে যারা শোনে অথচ বোঝে না, তর্কাতর্কি করে অথচ শেখেও না। খোদাতা'লা করুণাময়। তাঁর রাগ যেমন করুণা, তেমনি তাঁর তালা-ও করুণা। কিন্তু তালামুক্তির তুলনায় তালাবদ্ধতা কিছুই না। কেননা সেটির করুণা বর্ণনাতীত। আমি যদি টুকরো টুকরো হয়ে যাই, তাও আল্লাহ পাকের তালামুক্তির অসীম করুণার মাধ্যমেই হবে।

সাবধান, মনে করো না আমি অসুস্থ ও মৃত্যুপথযাত্রী। সেটি তো স্রেফ একটি পর্দা। আমার হন্তা হচ্ছে খোদার এই করুণা এবং তাঁরই অতুলনীয়তা। জরা-ব্যাধির ছুরি ঝলকায় কেবল অপরিচিতদের চোখ ধাঁধাঁতে, যাতে কোনো মন্দ ও নিকৃষ্ট চোখের চাহনি খোদার গোপন এই জান কবজ (প্রক্রিয়া) দেখতে না পায়।

## উপদেশ বাণী - ৩৬

সকল আকার-আকৃতি এশক্ব তথা প্রেম হতে উদ্ভূত হয়, যেমনিভাবে (বৃক্ষের) ডালপালা/শাখা-প্রশাখার উৎপত্তি শেকড় হতে। কোনো ডাল-ই সেটির শেকড় ছাড়া অস্তিত্বশীল থাকতে পারে না। অতএব, খোদাতা'লাকে আকার বলা হয় না, কেননা আকার হলো ডালাপালা। আল্লাহতা'লাকে কীভাবে ডাল বলে অভিহিত করা যায়?

কেউ একজন (দরবারী মজলিশে) বলেন: "ভালোবাসাকেও আকৃতি ছাড়া প্রকাশ করা যায় না, বা সেটির অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ও করা যায় না। তাই এটি আকার-আকৃতির শাখা (ডাল)।"

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: মাশূক্ব (প্রেমাস্পদ) কেন আকৃতিবিহীন আকৃতি হতে পারেন না? পক্ষান্তরে, প্রেমাস্পদ হলেন আকার-আকৃতির

ভাস্কর। লক্ষ আকার-আকৃতি মাশূক্বের কুমোরের চাকে বাহ্যিক রূপ লাভ করে। যদিও কোনো চিত্রকর চিত্রকর্মসমূহ ছাড়া অস্তিত্বশীল থাকতে পারেন না, তথাপিও চিত্রকর্ম হচ্ছে ডাল এবং চিত্রকর হলেন শেকড়। আঙ্গুল নড়লে আংটিও নড়ে।

কারো কোনো বাড়ি (নির্মাণে)'র প্রতি টান না থাকলে কোনো স্থপতি-ই ওর নকশা আঁকবেন না। একইভাবে, গম/যবের মূল্য কোনো বছর সোনার দামে চড়ে, আবার অন্য কোনো বছর ধুলোর দামে পতিত হয়। কিন্তু গম/যবের আকৃতি একই থাকে। অতএব, সেটির মূল্য (সেটির প্রতি) টান হতে আসে। তোমরা যে বিদ্যাশাস্ত্র ওই ধরনের টান বা আগ্রহ হতে অধ্যয়ন করো, তা তোমাদের চোখে মূল্যবান। কিন্তু যখন কেউই তা অন্বেষণ করে না এবং শিক্ষা করে না, তখন কে সেসব বিদ্যা শিক্ষা দেবেন?

কেউ একজন (দরবারী মজলিশে) বলেন: "ভালোবাসা হচ্ছে কোনো বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা। অতএব, চাহিদা হচ্ছে শেকড়, আর চাহিদাকৃত ওই বস্তুটি এর ডাল।"

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: তোমার উচ্চারিত এসব কথাও চাহিদা হতে বলা। প্রথমে এ কথাগুলোর প্রতি তোমার আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল, অতঃপর সেগুলোর উৎপত্তি হয়। অতএব, চাহিদার অস্তিত্ব আগে এবং এরপর তোমার কথার উৎপত্তি। এর মানে তোমার চাহিদা কোনো কথা ব্যতিরেকে সূচনাতেই অস্তিত্বশীল ছিল। অতএব, ভালোবাসা ও চাহিদা কথাবার্তার ডালপালা নয়।

কেউ একজন (এ সময়) বলেন: "কিন্তু এসব কথা তো ছিল ওই চাহিদারই লক্ষ্য; তাহলে লক্ষ্য কীভাবে শাখা/ডালপালা হতে পারে?"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: শাখা সর্বদা-ই লক্ষ্য। বৃক্ষের শেকড় অস্তিত্বশীল স্রেফ এর শাখা-প্রশাখার খাতিরে।



## উপদেশ বাণী - ৩৭

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: এই মেয়েটি সম্পর্কে যেসব কাহিনীর গুজব রটানো হয়েছে, সেগুলো মিথ্যে এবং এখানেই তা শেষ হওয়া উচিত। তবে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, এসব গুজবকে আমরা মিথ্যে বলে এক পাশে ফেলে দিলেও কল্পনার রাজ্যে কিছু একটি আসন গেড়ে বসেছে। আমাদের কল্পনা ও হৃদ-রাজ্য কোনো ভবনের প্রবেশ-কক্ষের মতোই, যেখানে চিন্তা আগে প্রবেশ করে, অতঃপর সেই চিন্তা গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

এই গোটা পৃথিবী একটি বাড়ির মতো, আর আমাদের মনের গভীরে বসতিকারী প্রতিটি প্রতিচ্ছায়াকেই ওই গৃহে আবির্ভূত ও দৃশ্যমান হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, এই যে বসত ঘর যেখানে আমরা বসে আছি, এটির আকৃতি সর্বপ্রথমে কোনো স্থপতির অন্তরে দৃশ্যমান হয়েছিল; অতঃপর এই বাড়িটি অস্তিত্ব পায়। কল্পনা, দিবাস্বপ্ন ও চিন্তা এই গৃহের প্রবেশ কক্ষ। ওই প্রবেশ কক্ষে যা-ই কিছু তোমরা প্রবেশ করতে দেখছো, জেনে রেখো একদিন তা এ গৃহে দৃশ্যমান হবে। আর ভালো ও মন্দ নির্বিশেষে যা তোমরা আজকের এ জগতে দেখতে পাচ্ছো, তার সবই এখানে দৃশ্যমান হওয়ার আগে প্রথমে ওই প্রবেশ কক্ষে দৃশ্যমান হয়েছিল।

আল্লাহতা'লা যখন এ জগৎ-সংসারে বিরল ও চমৎকার জিনিস প্রদর্শন করতে চান, যেমন ফুল ও ফলের বাগান, তৃণ ভূমি ও বিদ্যা, তখন তিনি প্রথমে সেগুলোর আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা আমাদের অন্তরের গভীরে প্রোথিত করেন। আর তাই এ বিশ্বজগতে তোমরা যা-ই কিছু দেখতে পাচ্ছো, এর সবই ওই অভ্যন্তরীণ জগতে প্রথমে বিরাজমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ, তোমরা শিশিরের মাঝে যা দেখতে পাও তা মহাসাগরেও অস্তিত্বশীল, কেননা এই শিশির ওই মহাসাগর হতে এসেছে। একইভাবে এ আসমান ও জমিন এবং অন্যান্য যাবতীয় বিস্ময়কর বস্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রেও প্রাচীন (সত্তা)-দের আত্মাগুলোতে খোদাতা'লা সেগুলোর আকাঙ্ক্ষা প্রথমে প্রোথিত করেন। আর এভাবেই জগতের সৃষ্টি হয়।

দার্শনিক যারা দাবি করেন পৃথিবী চিরন্তন, তাদের (কথা)'কে কীভাবে গুরুত্বসহ বিবেচনা করা যায়? তাদের বক্তব্য স্রেফ এটি বোঝায় যে দুনিয়া

কখনোই কালের অধীনে সৃষ্ট হয়নি; আর তাদের এই দাবি প্রমাণ করা একদম অসম্ভব। কিন্তু যাঁরা বলেন যে এটি কালের অধীনে সৃষ্ট হয়েছে, তাঁরা আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া/দরবেশ (রহ:); তাঁরা এই বিশ্বজগতের চেয়েও প্রাচীন সময়কালের। খোদাতা'লা এ বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা তাঁদের আত্মার মাঝে প্রোথিত করেছিলেন, আর এর পর-ই কেবল বিশ্বজগৎ দৃশ্যমান হয়। ফলে এই বিশ্বজগতকে যে কালের অধীনে সৃষ্টি করা হয়েছিল তাঁরা তা জানেন বাস্তবতা হিসেবে এবং তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে তা বর্ণনা-ও করে থাকেন।

উদাহরণস্বরূপ, আমাদের মধ্যে যারা এই ঘরটিকে এর নির্মাণের সময় প্রত্যক্ষ করেছিলাম, আমরা জানি এটির অস্তিত্ব ছিল না কিছু বছর আগ পর্যন্ত-ও। অতঃপর এই ঘরে যদি জীবজন্তু জন্মগ্রহণ করে, যেমন বিচ্ছু, ইঁদুর, সাপ ও অন্যান্য প্রাণি, তাহলে তাদের কাছে এই বাড়িটি ইতোমধ্যেই দণ্ডায়মান প্রতীয়মান হবে। তারা যদি বলে, "এই গৃহটি চিরন্তন," তাহলে তা আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ বলে গণ্য-ই হবে না; কেননা আমরা দেখেছি কখন ওই বাড়িটি তৈরি করা হয়েছিল। উই পোকা ও পিঁপড়ে যেগুলো দেয়াল ও কাঠের দরজা-জানালায় বেড়ে ওঠেছে, সেগুলো অন্য কিছু সম্পর্কে জানে না, ঠিক যেমনটি জানে না এই দুনিয়ার বসতঘরে বেড়ে ওঠা মানুষ। এখানেই তারা পল্লবিত হয়, আর এখানেই তারা মৃত্যুবরণ করবে অন্য কোনো কিছু না জেনে। তারা যদি বলে এই পৃথিবী চিরন্তন, তবে সেটি এই পৃথিবীর জন্মেরও কোটি কোটি বছর আগ হতে অস্তিত্বশীল আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া/দরবেশ (রহ:)-এর কাছে কোনো প্রমাণ নয়। কেন বছর নিয়ে কথা বলা? এটি কিছু সংখ্যক বছরের বিষয় নয়। এতো অসীম এবং গণনারও অতীত। তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন এই বিশ্বজগতের অস্তিত্বশীল হওয়ার ঘটনা, ঠিক যেমনি তোমরা দেখেছো এই বাড়িটি প্রথম যখন তৈরি করা হয়।

## উপদেশ বাণী - ৩৮

মহানবী (দ:) একবার তাঁর সাহাবা (রা:)-বৃন্দকে সাথে নিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় কয়েকজন কুফফার (অবিশ্বাসী) তাঁকে জনসমক্ষে অভিযুক্ত



করা আরম্ভ করে এবং তাঁকে জ্ঞানদান করার চেষ্টাও করে। তিনি (জবাবে) বলেন, "তোমরা তো একমত যে কেবল একজন-ই এই জগতে ওহী গ্রহণ করছেন। ওহী তাঁরই প্রতি অবতীর্ণ হয়, সবার প্রতি কিন্তু নাযেল হয় না। ওই ব্যক্তির কথা ও কাজে নির্দিষ্ট কিছু চিহ্ন ও সঙ্কেত বিদ্যমান, আর তাঁর চেহারা ও (শরীরের) প্রতিটি অংশেই সেই প্রমাণ ও চিহ্ন দৃশ্যমান। যেহেতু তোমরা সেসব প্রমাণ দেখেছো, সেহেতু তাঁর দিকেই তোমাদের মুখ ফেরাও এবং তাঁকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, যাতে তিনি তোমাদের রক্ষক বা সাহায্যকারী হতে পারেন।"

রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর যুক্তিতর্কে কুফফার-বর্গ হতবুদ্ধি ও লা-জওয়াব হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা নিজেদের তরবারির ওপর হাত রেখে সাহাবা (রা:)-বৃন্দকে হুমকি ও মনে কষ্ট দেয় এবং অপমান করতে থাকে। মহানবী (দ:) বলেন, "ধৈর্য ধরো, যাতে তারা দাবি করতে না পারে যে তারা আমাদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে। তারা জোরপূর্বক এই ধর্মকে প্রকাশ করতে চাচ্ছে। আল্লাহ এই ধর্মকে অবশ্যই প্রকাশ করবেন।"

কিছুকাল সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) এবাদত-বন্দেগী ও মহানবী (দ:)-এর নাম মোবারক গোপনে উচ্চারণ করতে থাকেন। অতঃপর আয়াত নাযেল হয়, "তোমরাও তরবারি কোষমুক্ত করো এবং যুদ্ধে লিপ্ত হও!"

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে 'উম্মী'বলা হয় এ কারণে নয় যে তিনি লিখতে বা পড়তে অক্ষম ছিলেন, বরঞ্চ তাঁর ক্ষেত্রে লেখাপড়া ও জ্ঞান ছিল সহজাত, (সৃষ্টিকুলের) কারো দ্বারা শেখানো নয়। যিনি চাঁদের চেহারায় অক্ষর এঁকেছেন, তিনি কি লিখতে অক্ষম হতে পারেন? আর বিশ্বজগতে এমন কী-ই বা আছে যা তিনি জানেন না, যেখানে পরিদৃষ্ট হচ্ছে যে সকল মানব-ই তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছেন? আংশিক (জ্ঞানসম্পন্ন) মস্তিষ্ক এমন কী-ই বা জানতে সক্ষম যা বিশ্বজনীন জ্ঞান, অর্থাৎ, খোদাতা'লার ঐশী জ্ঞানের অধিকারে নেই?

আমরা যে বই লিখি এবং ইমারত নির্মাণ করি, এতে নতুনত্বের কিছুই নেই। এগুলো আমরা হতে দেখেছি আগেও, আর ইতিপূর্বে যা হতে দেখেছি, আমরা স্রেফ সেগুলোতে যোগ-ই করছি মাত্র। কিন্তু যাঁরা আপন মহিমায় তথা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এ জগতে নতুন কিছু নিয়ে আসেন, তাঁরা হলেন (খোদাতা'লার) বিশ্বজনীন জ্ঞান (হতে জ্ঞানপ্রাপ্ত)। আমরা শিখতে

সক্ষম এবং আমাদেরকে শেখানোর প্রয়োজন হয়। বিশ্বজনীন জ্ঞানী (মানে ঐশী জ্ঞানী খোদাতা'লা) হচ্ছেন শিক্ষক, আর তাঁর কোনো প্রয়োজন-ই নেই। এমতাবস্থায় আমরা যদি সকল পেশার ব্যাপারে অনুসন্ধান করি, তাহলে দেখা যাবে ওগুলোর সবকিছুরই গোড়ায় বা উৎসে রয়েছে ঐশী প্রত্যাদেশ। আমরা সব কিছুই পয়গম্বর (অ:)-বৃন্দ ও বিশ্বজগৎ-নিয়ন্তার বিশ্বজনীন জ্ঞান হতে শিখেছি।

কাবিল যখন হাবিলকে হত্যা করেছিল এবং কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না, তখন সে একটি দাঁড় কাককে আরেকটি দাঁড় কাক হত্যা করতে দেখে। অতঃপর মাটি খুঁড়ে ওই দাঁড় কাকের মরদেহটি তাতে পুঁতে ফেলতে দেখে এবং সেটির ওপরে মাটি ছিটিয়ে দিতেও দেখে। কাবিল এভাবেই দাঁড় কাকের কাছ থেকে মুর্দাকে দাফন করার উপায় শেখে। একই অবস্থা সমস্ত পেশার ক্ষেত্রেও। যে ব্যক্তি আংশিক বুদ্ধির অধিকারী, তার জ্ঞান শিক্ষা করা প্রয়োজন; আর বিশ্বজনীন জ্ঞানী সত্তা-ই হচ্ছেন সেই উৎস যাঁকে তারা খুঁজছে। আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া (রহ:)-বৃন্দ আংশিক (জ্ঞানসম্পন্ন) মস্তিষ্ককে বিশ্বজনীন জ্ঞানীর জ্ঞানের সাথে সম্মিলিত করেছেন, যার দরুন উভয়-ই এক হয়ে গিয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, পা মস্তিষ্ক হতে শেখে কীভাবে হাঁটতে হয়। হাত হৃদয় বা অন্তর হতে শেখে কীভাবে আলিঙ্গন করতে হয়। চোখ ও কান শেখে কীভাবে দেখতে ও শুনতে হয়। হৃদয় ও মস্তিষ্কের যদি অস্তিত্ব না থাকতো, তাহলে শরীর কীভাবে ক্রিয়াশীল হতে পারতো?

মস্তিষ্ক ও অন্তরের তুলনায় এই দেহ অসূক্ষ্ম ও অমার্জিত বটে। ওই দুইয়ের সূক্ষ্মতা ও সজীবতা ছাড়া শরীর অর্থহীন ও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে রইতো। অতএব, আংশিক (জ্ঞানসম্পন্ন) মস্তিষ্ক হচ্ছে বিশ্বজনীন জ্ঞানীর হাতে একটি হাতিয়ারস্বরূপ, আর আমরা সেখান থেকেই আমাদের (জীবনের) উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানি ও শিখি এবং তা (মানে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য) খুঁজে পাই।

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) বলেন: "আপনার (অর্থাৎ, মওলানা রূমী রহমতুল্লাহে আলাইহের) নিয়্যতের মাঝে আমাদেরকে স্মরণে রাখবেন। নিয়্যত হচ্ছে যে কোনো বিষয়ের মূল। কোনো কথাবার্তা যদি না থাকে, না থাকুক। কথাবার্তা হলো শাখা।"



মওলানা রূমী (রহ:) উত্তরে বলেন: হ্যাঁ, নিয়্যত আকার-আকৃতির এ জগতে প্রবেশের আগে প্রথমে অভ্যন্তরীণ জগতে (অর্থাৎ, মনোজগতে) অস্তিত্ব পায়। অতএব, আকার-আকৃতির যদি কোনো মানে না থাকে, তাহলে এ জগতের উদ্দেশ্য-ই বা কী? তোমরা যদি খুবানি (শক্ত খোসাবিশিষ্ট) ফলের স্রেফ শাঁসটুকু (মাটিতে) রোপণ করো, তাহলে কিছুই উৎপন্ন হবে না। কিন্তু যদি ওর খোসাসহ রোপণ করো, তবে তা বেড়ে গাছে পরিণত হবে। এ থেকে আমরা জানি, ওই আকৃতিরও একটি কাজ আছে। হ্যাঁ, প্রার্থনা অন্তরের গভীরের একটি বিষয়: "অন্তরের উপস্থিতি ব্যতিরেকে কোনো প্রার্থনা-ই নেই।" তবুও প্রার্থনাকে আকৃতিতে পরিণত করা একান্ত আবশ্যক। বাহ্যিক কথা (মানে দুআ'), রুকূ ও সেজদা দ্বারা তোমরা ফায়দা লাভ করো এবং তোমাদের আকাঙ্ক্ষাও অর্জন করো।

নামায/প্রার্থনার বাহ্যিক আকার অস্থায়ী, কিন্তু অন্তরের গভীরের উচ্ছ্বাস কখনোই নিঃশেষ হয় না। কেননা বিশ্বজগতের আত্মা অসীম এক সাগর, অপরপক্ষে দেহ এক সীমাবদ্ধ সৈকত। তাই বিরামহীন প্রার্থনা (সাধনা) স্রেফ আত্মারই অধিকারে, কিন্তু ওই অন্তঃস্থ প্রার্থনার অবশ্যই বহিঃপ্রকাশ ঘটতে হবে। নিয়্যত ও আকৃতি যতোক্ষণ পর্যন্ত না পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে, ততোক্ষণ কোনো সন্তান জন্ম হবার নয়।

তোমরা যে বলো কথাবার্তা হচ্ছে শাখা, এটি তো স্রেফ একটি আপেক্ষিক শব্দ। শাখা যতোক্ষণ পর্যন্ত না অস্তিত্ব পাচ্ছে, ততোক্ষণ 'শেকড়' কীভাবে তার অর্থ লাভ করবে? অতএব, এই শাখাটি হতেই শেকড়ের অর্থ বেরিয়েছে। শাখাটির অস্তিত্ব না থাকলে এটি (শেকড়) কখনো নাম-ই পেতো না। তোমরা যখন নারী সম্পর্কে উল্লেখ করো, তখন সেখানে পুরুষের উল্লেখ-ও এসে যেতে বাধ্য। তোমরা যখন কোনো শিক্ষকের (মানে শায়খের/পীরের) কথা উল্লেখ করো, তখন সেখানে শিষ্যের (মানে মুরীদের) অস্তিত্ব-ও এসে যায়। আর তোমরা যখন মহারাজার (মানে খোদাতা'লার) কথা উল্লেখ করো, তখন সেখানে প্রজা সাধারণেরও (মানে সৃষ্টিকুলেরও) অস্তিত্ব এসে যায়।

## উপদেশ বাণী - ৩৯

সূফী-দরবেশমণ্ডলীর প্রতি খেদমত করার ও তাঁদের সমাজে প্রবেশের আগে হুসামউদ্দীন আরযানজানী ছিলেন এক মহা তার্কিক ব্যক্তি। তিনি যেখানে যেতেন, সেখানেই তুমুল যুক্তিতর্কে জড়াতেন এবং বিতর্কিত-ও হতেন। তিনি খুব ভালো বিতর্ক করতে পারতেন এবং ছিলেন সুবক্তা-ও। কিন্তু একবার যখন সূফী-দরবেশবৃন্দের সঙ্গ গ্রহণ করেন, এরপর তাঁর হৃদয়-মন পুরোপুরিভাবে বিতর্কবিরোধী হয়ে ওঠে।

"কেহ খোদার পার্শ্বে করিতে চাহিলে উপবেশন,
খোদাপ্রেমিকদিগের সান্নিধ্যে তাহাদের লইতে হইবে আসন।" [ভাবানুবাদ]

এসব বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান/বিদ্যাচর্চা সূফী-দরবেশবৃন্দের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার তুলনায় একটি খেলা মাত্র, আর সেটি জীবনের অপচয়-ও।

কামনা-বাসনাহীনতার এ পথটি-ই তোমাদের আকাঙ্ক্ষা অর্জনের পথ। তোমরা যা কিছুর জন্যে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করেছিলে, তা এ পথ ধরেই তোমাদের কাছে আসবে; তা (শত্রু) সৈন্য-সামন্তের ধ্বংস ও শত্রুর ওপর বিজয় লাভ এবং রাজ্য জয় ও মানুষকে বশ্যতা স্বীকার করানো-ই হোক, কিংবা হোক তোমাদের সমসাময়িকদের পেছনে ফেলে উচ্চতায় ওঠা বা বাগ্মিতা অর্জন। তোমরা যখন গরিবির পথ পছন্দ করবে, তখন-ই এসব জিনিস তোমাদের কাছে আসবে। অন্য সেসব পথের তুলনায় এই পথে ভ্রমণকারী কেউই কখনো (না পাওয়ার) অভিযোগ উত্থাপন করতে পারেননি, যেসব পথ লাখের মধ্য হতে মাত্র একটি লক্ষ্যে পৌঁছে; আর এমন কী সেটিও সব সময় সুখ-শান্তি খুঁজে পায় না। কেননা প্রতিটি কামনারই ওই লক্ষ্যে পৌঁছুনোর বহু অলি-গলি (পথ) রয়েছে। এটি এক দীর্ঘ ও কষ্টকর যাত্রা, যা'তে রয়েছে খানাখন্দ ও বাধা, আর ওই আঁকা-বাঁকা পথের শেষে তোমাদের আকাঙ্ক্ষা অর্জন না হওয়ারও রয়েছে সমূহ সম্ভাবনা।

তবে একবার তোমরা গরিবির জগতে প্রবেশ ও তা অনুশীলন করলে আল্লাহতা'লা তোমাদের কল্পনারও অতীত সব রাজ্য ও জগৎ তোমাদেরকে মঞ্জুর করবেন; আর তোমরা প্রথমে যার জন্যে প্রতীক্ষারত ছিলে, সে সম্পর্কে খুবই লজ্জা অনুভব করবে। তোমরা আফসোস করবে



এই বলে, "এরকম বাস্তবতা অস্তিত্বশীল থাকা অবস্থায় আমি কীভাবে ওই বোকামিপূর্ণ অভিলাষের পিছু নিয়েছিলাম?" কিন্তু খোদাতা'লা বলেন, "তুমি যদি ওই কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠতে, আর সেগুলোর আসল চেহারা/প্রকৃতি দেখে সেগুলো হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে, তাহলে সবই উত্তম হতো। তথাপি এখন যখন সেগুলো তোমার চিন্তা-ভাবনায় প্রবেশ করেছে এবং তুমি আমারই খাতিরে সেগুলোকে বর্জন করেছো, এমতাবস্থায় আমার করুণাও অসীম আর তাই আমি সেগুলোকে তোমার জন্যে (সহজে) অর্জনযোগ্য করে দিচ্ছি।"

হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। তিনি লক্ষ্য অর্জন ও বিখ্যাত হওয়ার আগে আরবীয়দের বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জল ভাষণের দিকে লক্ষ্য করতেন এবং কামনা করতেন যেন তিনিও এরকম সুন্দর বাচনভঙ্গি অর্জন করতে সক্ষম হন। কিন্তু একবার যখন অদৃশ্য বিশ্বজগতকে তাঁর সামনে প্রকাশ করা হয়, আর তিনিও খোদাতা'লায় মাস্ত্ (তথা দিওয়ানা) হন, তখন তিনি ওই কামনা-বাসনার পুরোপুরি বিরোধী হয়ে যান। আল্লাহ ঘোষণা করেন, "আপনি যে মার্জিতভাব ও বাগ্মিতার তালাশ করেছিলেন, আমি তা আপনাকে দান করেছি।" মহানবী (দ:) জিজ্ঞেস করেন, "হে প্রভু, আমার জন্যে এসবের কী ফায়দা? আমি তো এগুলোর প্রতি উদাসীন এবং এগুলোর আকাঙ্ক্ষী-ও নই।" আল্লাহ উত্তর দেন, "এ নিয়ে ভাববেন না। আপনার মৌলিক আকাঙ্ক্ষারই বাস্তবায়ন ঘটবে, আর আপনার ঔদাসিন্য-ও অবশিষ্ট থাকবে, যাতে কামনা-বাসনা আপনার ক্ষতি করতে না পারে।" আল্লাহ পাক তাঁকে এমন-ই ভাষণশক্তি দান করেন যে তাঁর সময়কাল হতে অদ্যাবধি সমগ্র জগৎ তা ব্যাখ্যা করতে বিশাল বিশাল বই লিখেছে এবং আজো লিখছে, কিন্তু তাও দুনিয়ার মানুষেরা মহানবী (দ:)-এর ওই বাণীতে নিহিত গূঢ় রহস্য পুরোপুরি উপলব্ধি করতে অক্ষম রয়েছে। খোদাতা'লা আরো ঘোষণা করেন, "আপনার সাহাবী (সাথী)-বৃন্দ দুর্বলতাহেতু ও নিজেদের প্রাণনাশের ভয়ে আপনার নাম মোবারক গোপনে উচ্চারণ করে থাকেন। কিন্তু আমি আপনার মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্র প্রকাশ ও প্রচার করবো, যাতে নারী-পুরুষ সকলেই পৃথিবীর সব অঞ্চলের উঁচু উঁচু মিনারায় দিনে পাঁচবার মিষ্টি স্বরভেদ সহকারে তা

উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারেন। আপনার মোবারক নাম পূবে ও পশ্চিমে প্রসিদ্ধি লাভ করবে।"

এই পথে যে কেউ নিজের জীবন বাজি রেখে এগোলে একই অবস্থা হবে। তাঁদের জন্যে ধর্মীয় কিংবা পার্থিব সব লক্ষ্য-ই অর্জন করা এর দরুন সম্ভবপর হয়ে ওঠে। কারোরই কখনো এব্যাপারে অভিযোগ করার কারণ দেখা দেয়নি।

আউলিয়া-দরবেশবৃন্দের কথাবার্তা হচ্ছে আসল মুদ্রা; অন্যদের কথাবার্তা স্রেফ তারই নকল বৈ কিছু নয়। নকল হচ্ছে আসল মুদ্রারই একটি শাখা। এটি (মানে নকল) একটি পায়ের আকৃতি অনুযায়ী খোদাইকৃত কাঠ, যেটি কোনো আসল পায়ের মাপ হতে চুরি করে নেয়া এবং ওই মাপ অনুসারে বানানো। পায়ের অস্তিত্ব না থাকলে তার নকল কীভাবে হতে পারতো? অতএব, কিছু ভাষণ বা বাণী আসল মুদ্রা, আর কিছু হলো নকল। এগুলো একে অপরের সাথে মিলে যায়। শুধু পার্থক্যকরণ (ক্ষমতা)-ই এর ফারাক্ব বুঝতে সক্ষম। এই অপরিহার্য দৃষ্টিশক্তি তথা উপলব্ধি ক্ষমতা-ই হচ্ছে আসল/প্রকৃত ঈমান (বিশ্বাস)।

তোমরা কি দেখো নি কীভাবে পয়গম্বর মূসা (আ:) তাঁর হাতের লাঠি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন এবং সেটি সাপে রূপান্তরিত হয়েছিল, আর জাদুকরবর্গের লাঠি ও দড়ি-ও সাপে রূপান্তরিত হয়েছিল; কিন্তু ফেরাউন (বাদশাহ) এই দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্য বোঝার অন্তর্দৃষ্টি হতে ছিল বঞ্চিত। অথচ পয়গম্বর মূসা (আ:) ছিলেন সত্য ও জাদুর মধ্যকার পার্থক্য বোঝার (ঐশী) অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। এ পার্থক্যকরণ দ্বারাই পয়গম্বর মূসা (আ:) ঈমানদারে পরিণত হন। অতএব, ঈমান/বিশ্বাস যে পার্থক্যকরণ, তা আমরা অনুধাবন করতে পারি।

আমাদের বিচার-বিবেচনার শেকড় বা মূল হচ্ছে ঐশী প্রত্যাদেশ। কিন্তু নানা চিন্তা, অনুভূতি ও মরণশীল প্রাণির কামনা-বাসনার সাথে মেশার কারণে ওই মৌলিক প্রশংসনীয় গুণ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এখন আমাদের বিচার-বিবেচনা কীভাবে ঐশী প্রত্যাদেশের সূক্ষ্মতার সাথে সাযুজ্য বা সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে?



এটি (ইরানদেশের সিমনানে অবস্থিত) তুরুত নগরীর দিকে প্রবাহিত (নদীর) পানির মতো। দেখো, ওর উৎসস্থলে পানি কতো পরিষ্কার ও স্বচ্ছ! কিন্তু সেটি যখন শহরে প্রবেশ করে এবং এর বাসিন্দাদের বাগান, বসতি ও ঘর-বাড়ি অতিক্রম করতে থাকে, তখন কতো মানুষ যে ওই পানি দ্বারা হাত-মুখ, পা ও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং নিজেদের জামাকাপড় ও কার্পেট ধোয়, আর সকল মানুষের মূত্র ও ঘোড়া-খচ্চরের মল তাতে গিয়ে মেশে, তার কোনো ইয়ত্তা-ই নেই। শহরের অপর দিক দিয়ে এই পানি বেরিয়ে যাওয়ার সময় তার প্রতি লক্ষ্য করো! পানি তো একই, যেটি ধুলোকে কাদায় পরিণত করে, তেষ্টা মেটায়, মাঠ-প্রান্তরকে সবুজে করে রূপান্তর; অথচ পার্থক্যকরণ (ক্ষমতা) পরিদৃষ্ট করে যে ওই পানি দূষিত এবং ওর মৌলিক নির্মলতা সেটি হারিয়েছে।

যে পানি কখনো দূষিত হয় না, আমাদের সেটিরই প্রয়োজন; সেই পানি যা দুনিয়ার অশুচিতা ধুয়ে পরিষ্কার করতে পারে, অথচ তাতে কোনো ময়লার চিহ্ন-ও থাকে না। এটি এর স্বচ্ছতা ও নির্মলতাকে ধরে রাখতে পারে এবং কখনোই ময়লা হয় না। এটি-ই সত্যের জলধারা।

অতএব, ঈমানদারি হচ্ছে পার্থক্যকরণ (ক্ষমতা), যেটি সত্যকে মিথ্যে হতে পৃথক করে, আর আসল মুদ্রাকে আলাদা করে নকলটি হতে। যাদের ওই অপরিহার্য (ঐশী) অন্তর্দৃষ্টি আছে তাদের জন্যে (আমার) এসব কথা (উপদেশ) মূল্যবান হবে, কিন্তু যারা এই পার্থক্য করার অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন নয়, তাদের জন্যে এগুলো হবে ফায়দাহীন। যারা উপলব্ধি করতে অক্ষম তাদের কাছে এ (উপদেশ) বাণী গিয়ে পৌঁছুলে, তা ছোট ছোট শিশুদের হাতে মহামূল্যবান মানিক-পাথর দেয়ার মতোই হবে, যেসব শিশু সেগুলোর মূল্য সম্পর্কে জানে না। পরবর্তী সময়ে তোমরা তাদেরকে আপেল সাধলে তারা সেগুলোকে ওই দামী মণিমুক্তার সাথে বিনিময় করবে; কেননা তারা তো জানে না (সেগুলোর মূল্য)।

শৈশবে (শায়খ) আবূ এয়াযীদকে তাঁর বাবা ফেক্বাহ তথা ধর্মশাস্ত্রীয় আইন-কানুন শিক্ষার উদ্দেশ্যে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। তাঁকে তাঁর শিক্ষকের সামনে নেয়া হলে তিনি (আবূ এয়াযীদ) জিজ্ঞেস করেন, "এটি কি খোদাতা'লার বিধিবিধান?" তাঁরা উত্তর দেন, "এটি ইমাম আবূ হানীফা (রহ:)-এর ফেক্বাহ।" তিনি বলেন, "আমি আল্লাহর বিধান

চাই।" তাঁকে ব্যাকরণ শিক্ষকের কাছে নেয়া হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, "এটি কি খোদার বিধিবিধান?" শিক্ষক উত্তর দেন, "এটি (বিদ্বান) সিবাওয়াইহ'র ব্যাকরণ।" আবূ এয়াযীদ বলেন, "আমি এটি চাই না।" তাঁর বাবা যেখানেই তাঁকে নেন, তিনি এভাবে কথা বলেন। এমতাবস্থায় তাঁর বাবা আর না পেরে তাঁকে শেষমেশ নিজের মতো ছেড়ে দেন। পরবর্তীকালে তিনি আপন অন্বেষণে বাগদাদ শরীফে আসেন; আর যখনি তিনি সেখানে শায়খ জুনায়দ বাগদাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে)-কে দেখতে পান, অমনি চিৎকার করে বলেন, "এই তো আল্লাহতা'লার (শাস্ত্রীয়) বিধান!" [অনুবাদকের নোট: এ কথার মানে এই নয় যে ইমাম আবূ হানীফা (রহ:)-এর মাযহাব ভুল বা আল্লাহর পথের ওপর নয়। মাযহাব হচ্ছে ঐশী বিধিবিধানের অনুশীলন পদ্ধতি, আর এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে কুরবাতে এলাহী তথা আল্লাহতা'লার নৈকট্যপ্রাপ্তির অসীলা। যা ইমাম আবূ হানীফা (রহ:)-এর কথা থেকেই আরো পরিষ্কার হবে। তিনি তাঁর জীবন সায়াহ্নে এসে তাসাউফ-তরীকতের ইমাম জা'ফর সাদিক্ব (রহমতুল্লাহে আলাইহে)'র খেদমতে দুই বছর অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এই দুই বছর না হলে আমি হালাক তথা লয়প্রাপ্ত হতাম।" আমাদের প্রশ্ন হলো, ফেক্বাহ-শাস্ত্র হতে এমন কী উন্নত বিদ্যাচর্চার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, যা না হলে হযরত ইমাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হতেন? বস্তুতঃ হযরত আবূ এয়াযীদ (রহ:) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।]

কোনো মেষশাবক তার আপন মাকে কীভাবে চিনতে না পারে, যেখানে সে তারই দুধপান করে বড় হয়েছে? অতএব, আকার-আকৃতিকে ভুলে যাও।

এক সময় নির্দিষ্ট কোনো শায়খ ছিলেন, যিনি তাঁর মুরীদানকে হাত জোড় করে খেদমতে দাঁড় করিয়ে রাখতেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "এয়া শায়খ, আপনি কেন এই দীক্ষিতদের শ্রেণিকে বসতে দেন না?" এটি তো আউলিয়া-দরবেশমণ্ডলীর রীতিনীতি নয়, বরং রাজা-বাদশাহদের আচরিত প্রথা।" শায়খ উত্তর দেন, "না, খামোশ হও! তোমরা এর পুরো ফায়দা পেতে হলে এ পন্থাকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। যদিও শ্রদ্ধা অন্তরের গভীরে নিহিত, তথাপিও বহির্ভাগ হচ্ছে অভ্যন্তরভাগের মুখচিত্র, ঠিক যেমনটি গ্রন্থের নামপত্রের উল্টোদিকে স্থাপিত চিত্র।"



কোনো গ্রন্থের নামপত্রের উল্টোদিকে স্থাপিত চিত্র দেখে মানুষেরা জানতে পারেন এতে কী কী বিষয় রয়েছে। বাহ্যিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকার দরুন বোঝা যায় তাদের অন্তস্তলে কতোখানি সম্মান বিদ্যমান, আর খোদার প্রতি তাদের ভক্তিও এতে দৃশ্যমান হয়।

## উপদেশ বাণী - ৪০

রাজ্যের সুলতানের খাদেম (তথা সেবক) জওহার প্রশ্ন করেন, "আমাদের বলা হয়েছে যে মুসলমানবৃন্দের ধর্মীয় বিশ্বাসের (অনুশীলনী) আমাদের সারা জীবনে (দিনে) পাঁচবার করে পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করতে হবে। আমরা ওর কথা (মানে মর্মবাণী) না বুঝলে কী ঘটবে? কিংবা সঠিকভাবে সেগুলো মুখস্থ না করলে (আমাদের প্রতি ফায়সালা) কী হবে? ইন্তেক্বালের পরে আমাদের কী প্রশ্ন করা হবে, যখন দেখা যাবে যে আমরা এমন কী আমাদেরকে শেখানো প্রশ্নগুলোও ভুলে গিয়েছি?"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: আপনি যা শিখেছেন তা যদি ভুলে যান, তাহলে অবশ্যই আপনি বিদ্যমান সমস্ত নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিশ্রুতির বাধ্যবাধকতা হতে এমনভাবে মুক্ত হয়ে যাবেন, যার দরুন সেসব প্রশ্ন যেগুলো আপনি শেখেননি সেগুলোর জন্যে উপযোগী হবেন।

এক্ষণে আপনি আমার কথা শুনছেন। আমি যা বলি, তার কিছু অংশ আপনি মানছেন, কেননা ইতিপূর্বে আপনি অনুরূপ বিষয়াদি সম্পর্কে শুনেছেন; কিন্তু (আমার) কিছু কথা আপনি অর্ধেক মানেন; আর অন্য বিষয়গুলোর ব্যাপারে আপনি ইতস্তত করেন। কেউই আপনার অভ্যন্তরে চলমান এই প্রত্যাখ্যান বা গ্রহণ অথবা বিতর্ক শুনতে পান না। যদিও আপনি শুনছেন, তবুও আপনার অন্তস্তল থেকে কোনো শব্দ বা কণ্ঠস্বর আপনার কানে আসছে না। (এমতাবস্থায়) আপনার অভ্যন্তরে খুঁজলে আপনি কোনো বাচনের হাতিয়ার পাবেন না।

এই যে আপনি আমার কাছে এসেছেন, এটি খোদ একটি কণ্ঠ বা জিহ্বাবিহীন (অর্থাৎ, নির্বাক) প্রশ্ন, যেমন নাকি "আমাকে কোনো পথ দেখান, আর আপনি যা দেখিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করুন।" আপনার সাথে আমার এই যে বৈঠক, কী নীরবতায়, কী কথা বলায়, আপনার গোপন

প্রশ্নগুলোর প্রতি এটি একটি উত্তর। আপনি যখন বাদশাহর খেদমতরত থাকেন, সেটি বাদশাহের প্রতি পেশকৃত একটি প্রশ্ন এবং একটি উত্তরও বটে। প্রতিদিন-ই রাজা তাঁর সেবকদের প্রতি নির্বচনীয় প্রশ্ন করে চলেছেন: "তোমরা কীভাবে দাঁড়াও? কীভাবে খাও? কীভাবে তাকাও (মানে দেখো)?" কারো যদি নিজের অভ্যন্তরে বিরক্তির চাহনি থাকে, তাহলে অনিবার্যভাবে তার উত্তর বেরোবে তির্যক এবং সোজা উত্তর-ও দিতে পারবে না। একইভাবে, যে ব্যক্তি তোতলা সে যতোই সহজভাবে কথা বলতে চেষ্টা করুক না কেন, তা সে পারবে না। যে স্বর্ণকার সোনাকে কোনো পাথরের সাথে ঘষে থাকে, সে স্বর্ণটিকে প্রশ্ন করে, আর স্বর্ণটি উত্তর দেয়, "এটি আমি এবং আমি খাঁটি।" অথবা, "আমি খাদবিশিষ্ট।"

"ধাতু গলানোর পাত্র জানে তোমাকে পরীক্ষা করার শেষে,
তুমি খাঁটি সোনা না স্রেফ তামা, সোনার মোড়কে ঠেঁসে।" [ভাবানুবাদ]

খিদে হলো প্রকৃতিরই একটি জিজ্ঞাসা: "দেহের বসতঘরে একটি ফাটল ধরেছে। একটি ইট দাও। প্লাস্টারের কাদা/সিমেন্ট দাও।" আহার একটি উত্তর: "গ্রহণ করো।" না খাওয়া-ও কিন্তু একটি উত্তর: "পরবর্তী সময়ের জন্যে অপেক্ষা করো। ইট এখনো শুকোয়নি।" ডাক্তার এসে আমাদের নাড়ি পরীক্ষা করেন; ধমনীর স্পন্দন এর উত্তর। মূত্র পরীক্ষা একটি অব্যক্ত প্রশ্ন ও উত্তর। বীজ মাটিতে ছোঁড়া একটি প্রশ্ন: "তুমি কি ফলন দেবে?" গাছের বৃদ্ধি তার মৌন উত্তর। যেহেতু উত্তরটি নির্বাক, সেহেতু প্রশ্নটি-ও বাকহীন হওয়া চাই।

কোনো এক রাজা একই ব্যক্তির কাছ থেকে তিনটি আরজি-পত্র পেয়ে সেগুলো পড়েন, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দেননি। ওই প্রজা এরপর একটি অভিযোগপত্র লেখেন এই বলে, "মহারাজ, এ যাবৎ আমি তিনটি আবেদনপত্র দাখিল করেছি। আপনি একবার অন্তত বলুন যে আমার আরজি গৃহীত হয়েছে, না প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।" রাজা মহাশয় ওই চিঠির পেছনে লেখেন, "তুমি কি জানো না যে কোনো উত্তর দিতে অস্বীকার করা নিজেই একটি উত্তর, আর কোনো নির্বোধের প্রতি উত্তর হচ্ছে নিশ্চুপ থাকা?"



কোনো গাছের বৃদ্ধি না হওয়া সেটির উত্তর প্রদানে অস্বীকৃতি ছাড়া কিছু নয়, আর তা নিজেই একটি উত্তর-ও। মানুষের প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালন-ই একটি প্রশ্ন বটে। তাদের জীবনে যা ঘটে, দুঃখজনক হোক বা আনন্দময় ঘটনা হোক, তা-ও একটি উত্তর। তারা কোনো সুখকর উত্তর শুনলে নিজেদের (অন্তরের) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন আবার একই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপনের দ্বারা করা হয়। সুখকর নয় এমন উত্তর শুনলে তারা দ্রুত আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান এবং ওই ধরনের প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপন করেন না।

"শুধু যখন আমার ক্ষমতা তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তখনই তারা বিনত হয়েছিল! কিন্তু তাদের অন্তরগুলো ছিল কঠিন।" [সরাসরি অনুবাদ]

আরেক কথায়, তারা বুঝতে পারেনি যে তাদের প্রাপ্ত উত্তরটি তাদেরই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন হতে এসেছিল।

"এবং তারা যা করছিল, শয়তান তাদের কাছে সেটিকে ন্যায্য ও সঠিক হিসেবে প্রতীয়মান করেছিলো।" [সরাসরি অনুবাদ]

এর মানে তারা তাদের প্রশ্নের উত্তর দেখতে পেয়েছিল ঠিক, কিন্তু তারা বলেছিল, "এই বিশ্রী উত্তরটি আমাদের ন্যায্য প্রশ্নের জন্যে যথাযথ নয়।" তারা উপলব্ধি করতে পারেনি যে, ধুঁয়া বের হয় জ্বালানি হতে, আগুন থেকে নয়। জ্বালানি যতো শুকনো হবে, আগুন হবে ততোই পরিষ্কার। তোমরা বাগানের দায়িত্ব কোনো মালির প্রতি অর্পণ করলে এবং তাতে অপছন্দনীয় কোনো দুর্গন্ধ পেলে, মালিকে সন্দেহ করো, বাগানকে নয়।

এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে, "তোমার মাকে তুমি কেন হত্যা করেছো?" ওই ব্যক্তি উত্তর দেয়, "আমি তাকে এক অপরিচিত লোকের সাথে ঘুমোতে দেখেছি।" প্রথম ব্যক্তিটি এমতাবস্থায় বলে, "ওই অপরিচিত লোকটিকেই বরঞ্চ তোমার হত্যা করা উচিত ছিল।" অতঃপর দ্বিতীয়জন বলে, "তাহলে তো প্রতিদিন-ই আমায় কাউকে না কাউকে খুন করতে হবে।"

কাজেই, যা কিছু তোমাদের জীবনে ঘটে, তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন করো; তাহলে আর তোমাদেরকে প্রতিদিন কারো সাথে লড়তে হবে না। অন্যরা যদি বলে, "সব কিছুই আল্লাহর কাছ থেকে (আগত)",

এমতাবস্থায় আমরা জবাবে বলি: তাহলে কারো নিজেকে ভর্ৎসনা/তিরস্কার করা এবং দুনিয়াকে সেটির নিজের মতো ছেড়ে দেয়াও আল্লাহর তরফ হতে (আশীর্বাদস্বরূপ) প্রেরিত।

এটি অনেকটি সেই ছেলেটির কাহিনির মতো, যে গাছকে ঝাঁকিয়ে তা হতে খুবানি পেড়ে খেতো। ফলের বাগানের মালিক তাকে পাকড়াও করে প্রশ্ন করেন, "তুমি কি খোদাতা'লার শাস্তির ভয়ে ভীত নও?" ছেলেটি উত্তর দেয়, "আমি কেন ডরাবো? গাছটি খোদাতা'লার মালিকানাধীন, আর আমি তাঁরই খেদমতগার। খোদার গোলাম খোদার (মালিকানাধীন) ফল খেয়েছে!" বাগানের মালিক বলেন, "অপেক্ষা করো আমি তোমাকে কী উত্তর দেই তা দেখার জন্যে। (বাগানের অধীনস্থ কর্মচারিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন) একটি দড়ি আনো, আর তাকে এই গাছের সাথে বাঁধো; অতঃপর এমন উত্তম-মধ্যম দাও যাতে উত্তরটি পরিষ্কার হয়!" ওই ছেলে তখন বলে, "আপনি কি খোদাতা'লার শাস্তিকে ভয় পান না?" বাগানের মালিক উত্তর দেন, "আমি কেন ভীত হবো?" তুমি খোদার চাকর, আর এটি খোদার লাঠি। আমি তো খোদার লাঠি দিয়েই খোদার চাকরকে ধোলাই দিচ্ছি!"

এ কাহিনির নীতিকথা হলো, এই জগতটি একটি প্রতিধ্বনির মতোই। তোমরা ভালো হোক, মন্দ হোক, যা-ই বলো, তারই প্রতিধ্বনি পাহাড় হতে শুনতে পাও। যদি তোমরা মনে করো, "আমি সুন্দরভাবে বলেছি, কিন্তু পর্বত বিশ্রী উত্তর দিয়েছে", তাহলে এটি সম্ভব নয়। নাইটেংগেল (যাযাবর গায়ক) পাখি যখন পাহাড়ে গান গায়, তখন কি পর্বত হতে দাঁড় কাকের বা গাধার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি ঘটে? নিশ্চিত জেনে রেখো তবে, তোমরা গাধার মতোই কথা বলেছো!

"মিষ্টস্বরে কথা বলো যবে গিরিপথ করছো অতিক্রম,
কেন সংঘটন করছো গর্ধভের মতো চিৎকারের ভ্রম?
উজ্জ্বল নীল আকাশে সেই সুর হয় প্রতিধ্বনিত,
যা তোমারই আপন মিষ্টি কণ্ঠস্বর হতে হয় নিঃসৃত।"



## উপদেশ বাণী - ৪১

আমরা মানুষেরা হলাম পানির ওপরে (ভাসমান) পাত্রের মতো। এই পাত্র যেদিকে ধাবিত হয় তা তার (নিজস্ব) নিয়ন্ত্রণে নয়, বরং পানির নিয়ন্ত্রণে।

কেউ একজন (দরবারী মজলিশে) বলেন: "এটি একটি সার্বিক বিবৃতি। কিন্তু কিছু মানুষ জানেন তাঁরা পানির ওপরে ভাসছেন, অপরদিকে কিছু মানুষ তা জানেন না।"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: "এটি সার্বিক বিবৃতি হলে "মো'মেনের ক্বলব্ (তথা হৃদয়) পরম করুণাময়ের দুই আঙ্গুলের মাঝে", এই সুনির্দিষ্ট বক্তব্যের কোনো মানে হতো না। এ কথাও বলা হয়, "পরম করুণাময় কুরআন মজীদ শিক্ষা দিয়েছেন।" এটি কোনো সার্বিক বিবৃতি হতে পারে না। খোদাতা'লা সকল প্রকারের জ্ঞান-ই শিক্ষা দিয়েছেন, তাহলে আল-কুরআনের প্রতি এই বিশেষ উল্লেখ কেন?

একইভাবে, (পাক কালামে) উল্লেখিত হয়েছে, "আল্লাহতা'লা আসমানসমূহ ও জমিন (পৃথিবী) সৃষ্টি করেছেন।" কেন সুনির্দিষ্টভাবে আসমানসমূহ ও জমিনের উল্লেখ, যেখানে তিনি-ই সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন? এ কথা সত্য যে সব পাত্র-ই ঐশী চূড়ান্ত ইচ্ছা ও খোদায়ী ক্ষমতাসদৃশ পানির ওপর ভেসে বেড়ায়, কিন্তু আল্লাহকে "ওহে গোবর ও মনুষ্য বর্জ্যের স্রষ্টা" বলে উল্লেখ করা (চরম) শিষ্টাচারবর্জিত। এর পরিবর্তে আমরা বলি, "হে আসমানসমূহের স্রষ্টা", এবং "হে বুদ্ধিবৃত্তি/মেধার স্রষ্টা।" অতএব, এই পার্থক্যকরণ সার্বিক হলেও (উন্নত) পছন্দ ও মূল্যের (বা মূল্যায়নের) ইঙ্গিতবহ।

এর চূড়ান্ত ফলাফল এই যে পানির ওপরে পাত্রসমূহ ভেসে বেড়ায় ঠিকই, আর ওই পানি কোনো পাত্রকে বহন করে নিয়ে যায় এমনভাবে, যার দরুন অন্যান্য পাত্র সেটির দিকে (পুলকিত নেত্রে) চেয়ে থাকে। পানি অপর কোনো পাত্রকে বহন করতে গেলে তৎক্ষণাৎ প্রতিটি পাত্র তা হতে দূরে সরে যায়, আর সেটিকে দেখে লজ্জাবোধ করে। পানি-ই তাদেরকে দূরে সরে যেতে অনুপ্রেরণা দেয় এবং তাদের মধ্যে প্রোথিত করে দূরে সরার শক্তি এ কথা মুখে উচ্চারণ করে, "হে আল্লাহ, আমাদেরকে আরো

দূরে সরিয়ে নিন।" কিন্তু প্রথমোক্ত পাত্রের ক্ষেত্রে তারা বলে, "হে আল্লাহ, এই পাত্রের আরো কাছে নিয়ে চলুন আমাদের।"

যে ব্যক্তি মনে করে এটি সার্বিক পরিস্থিতি, সে বলে, "উভয় পাত্রই পানি দ্বারা সমানভাবে নিয়ন্ত্রিত।" আমরা জবাবে বলি, "তোমরা যদি পানিতে স্রেফ এই (প্রথমোক্ত) পাত্রের মাধুর্য, সৌন্দর্য ও মৃদুমন্দ গতিতে ঘুরে বেড়ানো দেখতে পেতে, তাহলে এ ধরনের বিচলনকে সাধারণ বলে আখ্যা দেয়ার কোনো আকাঙ্ক্ষা-ই তোমাদের মাঝে আর বিরাজ করতো না।" একইভাবে, কোনো প্রেমিকেরই মুখে এ কথা ফুটতে পারে না, "আমার প্রেমাস্পদ ও আমি এমন কাজে পরস্পর সহযোগী এবং ভাগীদার এমন নাপাকির, যা পচনশীল শরীরের নির্দিষ্ট একটি স্থানকে দুইজন মানুষের ভাগাভাগির ফলশ্রুতিতে ঘটে থাকে।" প্রেমাস্পদের প্রতি এ রকম শীতল/নিরুত্তাপ বিবরণ কীভাবে কেউ দিতে পারে?

তোমরা যেহেতু সার্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোই কেবল চিনতে সক্ষম, আর আমাদের (সূফী/দরবেশবৃন্দের) বিশেষ সৌন্দর্য দর্শনে অক্ষম, সেহেতু তোমাদের সাথে যুক্তিতর্ক করা সঠিক নয়; কেননা আমাদের কথাবার্তা সৌন্দর্যে মেশানো এবং যারা সুন্দরকে ভালোবাসে না, তাদের কাছে সুন্দরকে প্রকাশ করা ভ্রান্তি বৈ কিছু নয়।

এ জ্ঞান সুপ্তশক্তির (মানে আধ্যাত্মিকতার), যুক্তি-তর্কের নয়। গোলাপ ও বিভিন্ন ফলের ফুল হেমন্তকালে ফোটে না। কেননা তাতে হেমন্তের মুখোমুখি হওয়া ও তার সাথে প্রতিযোগিতা করা হয়। হেমন্তের মুখোমুখি হওয়া গোলাপের প্রকৃতিবিরোধী। সূর্য নিজ কর্ম সম্পাদন করলে গোলাপ যথাসময়ে আপন মৌসূমে ফোটে। নচেৎ সেটি নিজ শির গুটিয়ে বোঁটার ভেতরে অবসর যাপন করে। হেমন্ত তাকে বলে, "তুমি নির্বীজ না হলে আমার মুখোমুখি হও!" গোলাপ উত্তর দেয়, "তোমার সামনে আমি নির্বীজ ও ভীতু। যা ইচ্ছে বলো গিয়ে!"

"হে সত্যবাদী পুণ্যাত্মাবৃন্দের অধিপতি,
আমায় কীভাবে বলা যায় কপট ব্যক্তি?
জীবিতদের সাথে আমি জিন্দা সত্যি,
আর মৃতদের সাথে যেন তাদেরই প্রতিকৃতি।" [ভাবানুবাদ]



দন্তবিহীন ও টিকটিকির পিঠের মতো ভাঁজবিশিষ্ট মুখাবয়বের অধিকারিনী কোনো বিগত-যৌবনা বয়স্কা নারী যদি তোমার কাছে এসে বলে, "তুমি সুপুরুষ ও প্রকৃত জওয়ান হলে তাকিয়ে দেখো, আমি তোমার সামনে উপস্থিত! দৃষ্টি ফেরাও অশ্বটি ও তার ওপর উপবিষ্ট সুন্দরীর প্রতি। উন্মুক্ত প্রান্তরকে অবলোকন করো। পৌরুষ প্রদর্শন করো, যদি সত্যি তুমি পুরুষ হয়ে থাকো!" এমতাবস্থায় তুমি বলো, "আল্লাহতা'লা হোন আমার আশ্রয়স্থল! আমি কোনো পুরুষ নই। আমার সম্পর্কে লোকে যা তোমায় বলেছে তার সবই মিথ্যে। তুমি যদি হও সখি, তাহলে কাপুরুষ হওয়া-ই সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়!"

কোনো বিচ্ছু এসে তোমার পায়ে নিজ কাঁটা উঁচিয়ে বলে, "আমি শুনেছি তুমি (সদা) হাস্যোচ্ছল ও সুখি ব্যক্তি। এক্ষণে হাসো, যাতে আমি তোমার হাসির আওয়াজ শুনতে পাই।" এ ধরনের ক্ষেত্রে তুমি বলো, "তুমি যখন এখানে উপস্থিত হয়েছো, এ সময় আমি হাসিশূন্য। লোকে যা বলেছে তা মিথ্যে। আমার হাসবার আকাঙ্ক্ষার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এই প্রত্যাশা যে তুমি এখান থেকে দূর হয়ে যাবে!"

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) মওলানা রূমী (রহ:)-কে বলেন: "আপনি এক মুহূর্ত আগে যে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন, এতে (আধ্যাত্মিকতার) পরমানন্দ তিরোহিত হয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন না, যাতে (আধ্যাত্মিকতার) পরমানন্দ দূর না হয়।"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: এই পরমানন্দ দীর্ঘশ্বাস না ফেল্লেও কখনো কখনো তিরোহিত হয়। নতুবা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করতেন না, "পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ছিলেন (দুঃখজ্ঞাপক) দীর্ঘশ্বাস ফেলা ব্যক্তিত্ব; এক করুণাশীল সত্তা।"

আর খোদাতা'লার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনসূচক কোনো কাজ-ও তাহলে সঠিক হতো না; কেননা আনুগত্যের সকল প্রদর্শনী-ই হচ্ছে (আধ্যাত্মিক) পরমানন্দ।

তুমি এ কথা বলেছো যাতে (আধ্যাত্মিক) পরমানন্দের ধারা অব্যাহত থাকে। কেউ সেই পরমানন্দের উদ্রেক করলে তুমি তোমার অভিজ্ঞতা

সঞ্চয়কে বজায় রাখার খাতিরে তাঁর দেখ-ভাল করে থাকো। এটি যেন কোনো ঘুমন্ত নারীকে চিৎকার করে বলা, "ওঠো! (নতুন) দিন সমাগত। কাফেলাও রওয়ানা দিয়েছে।" অন্যরা বলে, "চিৎকার করো না। এ নারী পরমানন্দে মগ্ন। তুমি তার পরমানন্দ দূর করে দেবে।" তুমি জবাবে বলো, "নিদ্রার পরমানন্দ হচ্ছে ধ্বংস, আর এই জাগ্রতাবস্থার পরমানন্দ হচ্ছে জন্মলাভ ও বেড়ে ওঠা।" তারা বলে, "তুমি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছো, কেননা এ চিৎকার-চেঁচামেচি বিরক্তিকর।" তুমি উত্তর দাও, "এই আওয়াজ ঘুমন্ত নারীকে চিন্তা করতে বাধ্য করবে। নিদ্রাগত থেকে কীভাবে সে তা করতে সক্ষম হবে?"

অতএব, উচ্চস্বরে আহ্বান দুই ধরনের। যদি উচ্চস্বরে আহ্বানকারী ব্যক্তিবৃন্দ জ্ঞানে অধিক সমৃদ্ধ হন, তবে তাঁদের সে আহ্বান চিন্তার জগতকে আরো সমৃদ্ধ করবে। যেহেতু তাঁরা (মানে সূফী-দরবেশমণ্ডলী) হলেন (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান ও জাগ্রতাবস্থার প্রতিভূ, সেহেতু তাঁরা যখন অন্যদেরকে তাদের নিদ্রাবস্থা হতে জাগ্রত করেন, তখন তাঁরা নিদ্রাচ্ছন্ন মানুষদেরকে তাদের আপন আপন ভুবন প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে উচ্চতর মক্বামে বা পর্যায়ে উন্নীত করেন। কিন্তু জাগ্রতকারী ব্যক্তিবর্গ যদি (আধ্যাত্মিক) সচেতনতায় নিম্ন পর্যায়ের হয় এবং অন্যদেরকে ঘুম থেকে জাগায়, তাহলে ঘুমন্তদের দৃষ্টি নিচের দিকেই টেনে নামানো হয়। উচ্চস্বরে আহ্বানকারীর জ্ঞান নিম্নতর পর্যায়ে হওয়ার দরুন অনিবার্যভাবে আহ্বানকৃত ব্যক্তিদের দৃষ্টি/চাহনি-ও নিম্নতর জগতের দিকে পতিত হয়।

## উপদেশ বাণী - ৪২

যে সকল মানুষ বিদ্যা শিক্ষায় আগ্রহী, তারা মনে করেন যে আমাদের (ধর্মীয়) সভাগুলোতে বিশ্বস্ততার সাথে অংশগ্রহণ করলে তারা (ইতিপূর্বে) যা শিখেছেন সবই ভুলে যাবেন এবং হারিয়ে ফেলবেন। পক্ষান্তরে, তারা যখন এখানে আসেন, তাদের জ্ঞান/বিদ্যা রূহ তথা আত্মাপ্রাপ্ত হয়। কেননা সকল জ্ঞান যখন আত্মাপ্রাপ্ত হয়, তখন তা খালি দেহে প্রাণের সঞ্চার হওয়ার মতোই। জ্ঞানের উৎসস্থল এই অক্ষর ও ভাষাসমূহের



জগতেরও অতীত। এটি ওই জগৎ হতে আমাদের কাছে আগমন করে, যেথায় বাচন কোনো শব্দ বা চিহ্নবিহীন।

"আর মূসার সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেন।" [সরাসরি অনুবাদ]

নিশ্চয় আল্লাহতা'লা অক্ষর ও শব্দ কিংবা কণ্ঠ ও জিহ্বা দ্বারা আলাপ করেননি। অক্ষরসমূহ কণ্ঠ ও ঠোঁটের উচ্চারিত আওয়াজ (শর্তস্বরূপ) দাবি করে থাকে। কিন্তু ঠোঁট, মুখ ও কণ্ঠ হতে আল্লাহতা'লা বহু উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন। অতএব, পয়গম্বরবৃন্দ (আ:) ওই জগতে আল্লাহর সাথে এমন কোনো উপায়ে কালাম তথা বাক্যালাপে রত হন, যেটি আংশিক জ্ঞানসম্পন্ন মস্তিষ্ক কল্পনা বা অনুধাবন করতে অক্ষম। তথাপিও আম্বিয়া (আ:)-মণ্ডলী ওই অক্ষরবিহীন জগৎ হতে এই অক্ষরের জগতে নেমে আসেন, আর এই (জগতের) শিশুদের খাতিরে শিশু বনে যান। এ কারণে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমাকে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।"

যদিও এ জগতের সাধারণ মানুষ পয়গম্বর (আ:)-বৃন্দের আধ্যাত্মিক হাল বা অবস্থায় পৌঁছুতে পারে না, তবুও এই (পার্থিব) জগৎ আউলিয়া-দরবেশবৃন্দ হতেই শক্তি সঞ্চয় করে, আর তাঁদের সান্নিধ্যেই বেড়ে ওঠে এবং স্বস্তি পায়। ঠিক যেমনটি কোনো শিশু তার মাকে বিস্তারিত না চিনে ও না জেনে মায়ের সান্নিধ্যে স্বস্তি খুঁজে পায় এবং শক্তি সঞ্চয় করে; আর গাছের ফল-ও সেটির ডাল দ্বারা পুষ্ট হয়ে পাকে এবং মিষ্ট স্বাদপ্রাপ্ত হয়, অথচ গাছ সম্পর্কে ফলটি কিছুই জানে না। একইভাবে, মহান আউলিয়া-দরবেশমণ্ডলীকে তাঁদের অক্ষর ও বাচনসমূহ সহকারে মানুষেরা যদিও না চেনে বা না জানে, তথাপিও তারা দরবেশবৃন্দের কাছ থেকে শক্তিপ্রাপ্ত এবং হৃষ্টপুষ্ট হয়।

রূহ তথা আত্মার অভ্যন্তরে প্রোথিত রয়েছে যুক্তিরও অতীত অক্ষর ও শব্দ - যা এক বিশাল বিশ্বজগৎ। কিন্তু তাকিয়ে দেখো কতোজন ওইসব মতিভ্রষ্ট গুরুকে খুঁজে বের করে, যারা নানা জঘন্য দাবি করে থাকে। মানুষেরা ভাবে, "এ সকল গুরু যা বলেন, তা হয়তো ঠিক। এ ধরনের বস্তু হয়তো অস্তিত্বশীল, এমন কী যদি তারা এক্ষেত্রে ভ্রান্ত-ও হয়ে থাকেন। সব কিছু তো আর যুক্তি-বিবেচনা দ্বারা জানা যায় না।" কিন্তু এ কথার মানে এই নয় যে প্রতিটি জিনিস-ই যুক্তি-বিবেচনার ঊর্ধ্বে। "সকল

বাদাম-ই গোল, কিন্তু প্রতিটি গোল বস্তু-ই বাদাম নয়" - এ কথাটি তার চিহ্ন বা প্রমাণ।

যদিও কোনো সূফী/দরবেশের এমন হালত বা অবস্থা আছে যা কথা বা লেখনীতে প্রকাশ করা যায় না, তবুও সূফী/দরবেশের উপস্থিতিতে যুক্তি-বিবেচনা বাড়ে ও উন্নত হয়। এটি ওই সব মতিভ্রষ্ট গুরুর কাছে পাওয়া যায় না, যাদের চারপাশে সর্বসাধারণ জড়ো হয়ে থাকে। যারাই ওই ভণ্ডদের কাছে যায়, তারা নিজেদের অবস্থার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না, আর ওই ধরনের পথপ্রদর্শন দ্বারা কেউই কামেলীয়াত তথা পূর্ণতা অর্জন করে না। মানুষেরা হয়তো ভাবতে পারে যে তারা কামেলীয়াত খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু আমরা যাকে কামেলীয়াত বলি, এটি তো সেটি নয়। এ যেন কোনো শিশুর তার মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য কারো কাছে ক্ষণিকের জন্যে স্বস্তি/সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া। এটিকে আমরা স্বস্তি বলি না, কেননা শিশুটি স্রেফ একটি ভুল করেছে।

চিকিৎসকেরা বলেন, যা কিছু শারীরিক বা মানসিক ধাতসম্মত এবং সন্তুষ্টি বিধান করে, তা-ই শক্তি দেয় আর রক্তকে পরিষ্কার করে। তবে এটি তখন-ই কেবল সত্য যখন কেউ নিরোগ থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, অধিক পিত্তরসে আক্রান্ত ব্যক্তি টক খাবার পছন্দ করেন, আর চিনিকে অপছন্দ করেন; কেননা সেগুলোর স্বাদ বদলে গিয়েছে তার নিজেরই ব্যাধিজনিত শারীরিক দুর্বলতা বা ঘাটতির কারণে। অতএব, কারো কাছে সত্যিকার স্বাস্থ্যসম্মত জিনিস হচ্ছে তা-ই, যা তার অসুস্থ হওয়ার আগে স্বাস্থ্যসম্মত ছিল। যেমন - কোনো নারীর হাত ভাঙ্গার পর সেটি তিনি শিকলিতে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখেন, যার দরুন পুরোটুকুই বাঁকা হয়ে যায়। অথচ তার শল্যচিকিৎসকের পক্ষে হাড়গুলোকে সোজা করতেই হবে এবং পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতেই হবে। কিন্তু এটি ওই নারীর জন্যে সুখকর নয়। তিনি এতে ব্যথা পাচ্ছেন। বাঁকা হাড়-ই তার কাছে এক্ষেত্রে বেশি গ্রহণযোগ্য। এমতাবস্থায় শল্যবিদ বলেন, "প্রথমে আপনার হাত সোজা ছিল এবং আপনি তাতে স্বস্তি পাচ্ছিলেন। হাত ভাঙ্গার পরে আপনি ব্যথা অনুভব করছিলেন এবং আপনার ভোগান্তি হচ্ছিল। এখন ওই হাত আপনার কাছে বেশি আরামদায়ক হলেও এই আরাম মিথ্যে এবং অর্থহীন।"



নির্মল আত্মার জগতের সত্তাবৃন্দের কাছে খোদাতা'লার যিকর ও ধ্যানমগ্নতা অধিক পছন্দনীয়, ঠিক ফেরেশতাদের মতোই। তবে শরীরের সাথে সংশ্লিষ্টতার সূত্রে যদি তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন, আর (এর দরুন) টকে যাওয়া খাবার তাঁদের কাছে বেশি পছন্দনীয় হয়, তাহলে আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া (রহ:) যাঁরা চিকিৎসক, তাঁরা বলেন, "তোমরা প্রকৃতপক্ষে যা চাও, এটি সেটি নয়। তোমাদের এই পছন্দ একটি মিথ্যে। তোমাদের আসল আকাঙ্ক্ষা অন্য কিছু, যা তোমরা বিস্মৃত হয়েছো। তোমাদের মৌলিক ও সুস্থ (আত্মিক) ধাতের সাথে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা-ই তোমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে কামনা করো। কিন্তু যেহেতু এই অসুস্থতা এক্ষণে আকর্ষণীয় বলে মনে হচ্ছে, সেহেতু তোমরা সত্যকে চিনতে পারছো না।"

একবার কোনো এক সূফী জনৈক ব্যাকরণবিদের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। ব্যাকরণবিদ (তাঁকে) বলেন, "একটি শব্দকে তিনটির কোনো একটি হতে হবে: হয় বিশেষ্য, নতুবা ক্রিয়া, নয়তো অপ্রধান পদ।" ওই সূফী আপন জুব্বা ছিঁড়ে উচ্চস্বরে বলেন, "আফসোস! আমার জীবনের বিশটি বছরের সাধনা ও তালাশ হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। কেননা আমি এই আশায় পরিশ্রম করেছি যে এই শব্দের পরে আরেকটি শব্দ আছে। এক্ষণে তুমি আমার আশা-ভরসার ইতি টেনেছো।" যদিও ওই সূফী ইতোমধ্যেই তাঁর অন্বেষণকৃত (খোদায়ী) 'কালাম' (বাণী) অর্জন করেছিলেন [মানে ভেদের রহস্য জেনেছিলেন], তবুও তিনি এ কথা বলেছিলেন ব্যাকরণবিদের (অনুসন্ধিৎসা) জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেই।

অতিথিদের সংখ্যা যতো বেশি হয়, ততোই তারা ঘরকে বড় করে এবং অধিক আসবাবপত্র নিয়ে আসে, আর অধিক খাবারও রান্না করে। এ কারণেই ছোট শিশুদের আকৃতি ক্ষুদ্র, আর তাদের চিন্তাভাবনা যেগুলো তাদের অতিথি, সেগুলোও তাদের দেহরূপী বসতঘরের জন্যে যথাযথ। তারা দুধ ও তাদের সেবিকাদের ছাড়া কিছুই চেনে না, জানে না। কিন্তু তারা যখন বয়সে বেড়ে ওঠে, তখন অতিথিরা, মানে তাদের চিন্তাগুলোও বৃদ্ধি পায়; আর তাদের বিচার-বিবেচনা, উপলব্ধি ও পার্থক্যকরণ ক্ষমতার ঘরও সম্প্রসারিত হয়। ভালোবাসার আবেগের অতিথিবর্গ যখন আগমন করে, তখন ওই ঘর তাদের জন্যে আর পর্যাপ্ত হয় না। তারা সেটি ভেঙ্গে নতুন ঘর নির্মাণ করে।

খোদাতা'লা পর্দা (দ্বারা নিজের ঘরকে) ঢেকে রেখেছেন এবং তাঁর গুপ্তদূত ও সৈন্যবাহিনীকে তাঁর ঘরে ধারণ করা সম্ভব-ও নয়। অধিকন্তু, খোদার পর্দা তাঁর (ঘরের) দরজাকে লুকোতেও পারে না। অশেষ সংখ্যক অতিথির জন্যে স্থানের সংকুলান করতে তাই একটি অনন্ত-অসীম মক্বামের প্রয়োজন। খোদাতা'লার পর্দাগুলো যখন ঝুলানো হয়, তখন সেগুলো আলো ছড়ায় এবং সকল ছায়া দূর করে দেয়, যার দরুন গোপন রহস্যগুলো প্রকাশ পায়। এটি বর্তমান পৃথিবীর পর্দার ঠিক উল্টো, যেটি আরো ছায়া যোগ করে থাকে।

"মুখে বলা যায় না এমন সব অন্যায়ের আমি শিকার,
কেউই শুনবে না কান্না বা ওজর আমার,
যেমনটি কেঁদে থাকে মোমবাতি জারজার,
কেউ জানে না অগ্নির নৈকট্য-ই কি কান্নার কারণ তার,
না মধুর মিষ্টের আকাঙ্ক্ষায় হারানো মোম মৌ-মক্ষিকার।" [ভাবানুবাদ]

এই গোটা বিশ্বজগৎ তাকদীর তথা নিয়তির হাতে বন্দী, আর ভাগ্য বন্দী সৌন্দর্যের হাতে। সৌন্দর্য প্রকাশ করে থাকে, গোপন করে না।

আল্লাহ পাকের কিছু নির্দিষ্ট বান্দা আছেন যাঁরা এমন পুরুষ, কোনো পর্দাকারিনী নারীকে যখন তাঁরা দেখেন তৎক্ষণাৎ তাকে আদেশ করেন, "তোমার পর্দা অপসারণ করো যাতে আমরা তোমার মুখমণ্ডল দেখতে পাই এবং তুমি কে তা জানতে পারি। তুমি পর্দার আড়ালে অতিক্রান্ত হওয়ার সময় আমরা বিক্ষিপ্তচিত্ত হই এই ভেবে, 'আমাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছে এ কেমন মানুষ?' আমরা তো ওই ধরনের লোক নই যারা তোমার প্রতি আকৃষ্ট এবং তোমারই দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, যখন-ই তারা তোমার চেহারা দেখতে পায়। খোদাতা'লা আমাদেরকে নিষ্পাপ করেছেন এবং ওই ধরনের মোহ হতে মুক্ত করেছেন আজ দীর্ঘদিন। আমরা একেবারেই নিঃশঙ্ক। তুমি আমাদের বিরক্ত করতে পারবে না এবং প্রলুব্ধ-ও করবে না। কিন্তু তোমাকে না দেখতে পেয়েই আমরা বিক্ষিপ্তচিত্ত হই এই ভেবে, 'কে এই ব্যক্তি'?"

এ সকল পুণ্যাত্মা নফসানী খায়েশের (মানে কামনা-বাসনার) অধীন লোকদের মতো নন। অন্যান্য লোকেরা সুন্দর মুখগুলো দেখলে সেগুলোর বন্দিত্ব বরণ করে এবং এতে তাদের চিত্তবিক্ষেপ-ও ঘটে থাকে। তাই



এসব সুন্দরীদের জন্যে নিজেদেরকে আড়াল করাই শ্রেয়তর, যাতে ওই জাতীয় পুরুষদের প্রলুব্ধ করতে না হয়। কিন্তু সূফী/দরবেশবৃন্দের বেলায় তাদের চেহারা দেখানোই শ্রেয়তর, যাতে খোদাতা'লার বান্দাদের মনোযোগ নষ্ট না হয়।

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) বলেন: "খাওয়ারিযম অঞ্চলে কেউই প্রেমে পড়েন না, কেননা সেখানে অনেক সুন্দরী নারীর আবাস। কেউ কোনো সুন্দরী নারীকে দেখে আসক্ত হওয়ামাত্র-ই তার চেয়েও সুন্দরী আরেক নারীর দেখা পান, আর প্রথম জনের কথা ভুলে যান।"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: খাওয়ারিযমের সুন্দরী ললনাদের কোনো প্রেমিক না থাকলে অবশ্যঅবশ্য খোদ খাওয়ারিযম এলাকার প্রতি মহব্বতকারীরা রয়েছেন, যারা ওই রাজ্যে এতোজন সুন্দরী বাসিন্দাকে দেখে (রাজ্যটিকেই) ভালোবেসে ফেলেছেন। কিন্তু আমি যে 'খাওয়ারিযমের' কথা বলছি, তা হচ্ছে ফকিরি, যেখানে অসংখ্য আধ্যাত্মিক ও ভেদের রহস্যপূর্ণ আকার-আকৃতি তাদের চেহারা প্রদর্শন করে থাকে। তোমরা যেটির দিকেই তাকাও এবং শান্তি খুঁজে পাও, সেটি আরো সুন্দর একটির দিকে পরিচালিত করে, যার দরুন তোমরা পূর্ববর্তীটির কথা ভুলে যাও। এভাবে অনন্তকাল তোমরা এগিয়ে চলো। অতএব, আমাদেরকে ফকিরির দিওয়ানা হতে হবে, যেখানে ওই প্রকৃত সৌন্দর্যের দেখা পাওয়া যায়।

## উপদেশ বাণী - ৪৩

আমার মুরীদ সাইফ আল-বুখারী মিসরে গিয়েছে। প্রত্যেকেই আয়না পছন্দ করেন, আর (তাতে) আপন আপন বৈশিষ্ট্যাবলী ও অর্জনসমূহের প্রতিচ্ছায়া/প্রতিফলন দেখতে ভালোবাসেন; কিন্তু আমার ওই মুরীদ নিজের চেহারার আসল প্রকৃতি সম্পর্কে বে-খবর। সে মনে করে এই শারীরিক পর্দা হচ্ছে একটি মুখমণ্ডল, আর এই পর্দার আরশি-ই হচ্ছে তার চেহারার দর্পণ। তোমার চেহারা উন্মুক্ত করো, যাতে তুমি নিশ্চিত হতে পারো যে আমি-ই হলাম তোমার প্রকৃত সত্তার দর্পণ।

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) বলে: "আমি এ বাস্তবতা সম্পর্কে নিশ্চিত জানি যে আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া (রহ:)-মণ্ডলী সবাই ভুল একটি অনুমানের শিকার। এতে স্রেফ ভান করা ছাড়া কিছু নিহিত নেই।"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: তুমি কি এ কথা যথেচ্ছভাবে বলে থাকো? নাকি কথা বলার আগে তুমি এ বিষয়টি খতিয়ে দেখেছো? যদি দেখে থাকো, তাহলে তুমি যে এই ছল দেখতে পেয়েছো তা নিজেই এক দৃকশক্তি, আর তা (বাস্তবে) তাঁদের (আম্বিয়া/আউলিয়ার) দর্শনশক্তিরই একটি প্রমাণ বটে। নিশ্চয় এ ধরনের পরিজ্ঞাত থাকা অস্তিত্বশীল বস্তুগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ও মহৎ কিছু। আম্বিয়া (আ:)-বৃন্দের আনীত ঐশীবাণীর প্রমাণ হচ্ছে এই দর্শনশক্তির প্রতি তাঁদের নিজেদেরই কৃত দাবি, যেটি তুমি স্বয়ং স্বীকার করে নিয়েছো। এ রকম (ঐশী) দর্শনক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে (খোদার প্রতি) মহা আকাঙ্ক্ষা ও অন্বেষণের মাধ্যমেই। তোমার এ বক্তব্য অন্বেষণকারী, আকাঙ্ক্ষা ও দর্শনশক্তির অস্তিত্বের প্রমাণবহ ছাড়া কিছু নয়। অতএব, খোদার সাথে তাঁর তালাশকারীদের সম্পর্ক এমনই এক বিষয়, যেখানে প্রেমের সকল দাবি-পরিত্যাগী শুধু প্রেমেরই প্রমাণ দেয়।

লোকে বলে, "ওই গড্ডালিকা প্রবাহ এক জড়ধীর মুরীদ/শিষ্য, আর তারা বোকা মানুষটিকে সম্মান করে থাকে।" আমি বলি, "ওই 'বুদ্ধু' শায়খ পাথর কিংবা মূর্তির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।" যারা প্রস্তর পূজা করে, তারা সেগুলোকে শ্রদ্ধা করে এবং বড় করে দেখায়। তারা সেগুলোর প্রতি নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা রাখে এবং পেশ করে থাকে তাদের আরজি, চাহিদা ও কান্নাও। পাথর কিন্তু কিছুই জানে না, এর কোনো কিছু অনুভব-ও সেটি করে না। তবু খোদাতা'লা (এ দুনিয়ায়) পাথর ও মূর্তিকে ভক্তি প্রকাশের একটি মাধ্যম করেছেন (কিছু লোকের কাছে)। অথচ পাথর ও মূর্তি এ ব্যাপারে একদম অনবধান।

একইভাবে এসব শিষ্য ওই বোকা শায়খের প্রতিমূর্তির প্রতি মহব্বত-পরায়ণ, আর শায়খ তাদের '(আত্ম-) নির্বাসন', 'মিলন' এবং প্রেম-জীবনের সকল পর্যায় সম্পর্কে একেবারেই বে-খবর।

কোনো অলীক মূর্তির জন্যে বিপথে চালিত ও ভুল নির্দেশিত প্রেম-ভক্তি যদি পরমানন্দ সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে প্রকৃত প্রেমাস্পদের প্রতি



পারস্পরিক ভালোবাসার মতো কোনো কিছু হতে পারে না, যে প্রেমাস্পদ পুরোপুরি অবধান এবং আশেক্বের হাল/অবস্থা সম্পর্কে একদম সজাগ।

অন্ধকারে বালিশকে প্রেমাস্পদ মনে করে জড়িয়ে ধরা লোকের আনন্দ কখনোই জীবিত ও পূর্ণ সচেতন বন্ধুকে আলিঙ্গনকারী ব্যক্তির সুখানুভূতির সাথে তুলনীয় হতে পারে না।

## উপদেশ বাণী - ৪৪

কেউ কোনো (দিকে) যাত্রা আরম্ভ করার সময় মনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা করে থাকে এ মর্মে: "একবার আমি গন্তব্যে পৌঁছুলে সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম হবো এবং আমার বিষয়াদিকেও উন্নত করতে পারবো। আমার কাজ-কারবার নিয়মবদ্ধ হবে, আমার বন্ধুরা খুশি হবে; আর আমার শত্রুদের আমি পরাভূত করবো।" আমাদের মস্তিষ্কে এসব-ই হলো পরিকল্পনা, কিন্তু খোদাতা'লার লক্ষ্য অন্য কিছু। আমরা অনেক পরিকল্পনা আঁটি এবং মনে মনে কতোই না লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করি, অথচ সেগুলোর একটিও আমাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ফলে না। এতদসত্ত্বেও আমরা আমাদের পরিকল্পনা ও পছন্দের ওপর নির্ভর করি।

"নিয়তিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ নিজেদের পরিকল্পনা আঁটে,
কিন্তু খোদার ইচ্ছার সাথে মানুষের পরিকল্পনা নাহি খাটে।" [ভাবানুবাদ]

এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই নারী, যে স্বপ্নে দেখতে পায় কোনো অপরিচিত শহরে পদার্পণ করেছে, আর সেখানে কেউই তাকে চেনে না, সেও কাউকে চেনে না। ওই নারী বৃদ্ধিভ্রষ্ট ও বিষন্ন হয়ে পড়ে, আর আপন মনে বলে, "আমি কেন এ শহরে এলাম, যেখানে আমার এমন কোনো বন্ধু কিংবা পরিচিত জন নেই, যিনি আমার করমর্দন করবেন বা ঠোঁট দ্বারা আমায় চুম্বন করবেন?" ঘুম থেকে জেগে ওই নারী শহরটি ও তার অধিবাসীদের মিলিয়ে যেতে দেখে, আর সে বুঝতে পারে তার সমস্ত দুঃখকষ্ট একেবারেই অনর্থক ছিল। ফলে সে যে অবস্থায় নিজেকে দেখেছিল, তা সে উপেক্ষা করে এ কথা ভেবে যে তার দুশ্চিন্তাগুলো ছিল অর্থহীন। কিন্তু পরবর্তী কোনো সময়ে যখন সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে, তখন সে ওই শহরে হুবহু একই অবস্থায় পুনরায় নিজেকে দেখতে পায়,

আর ওই একই দুঃখকষ্ট ও একাকিত্ব তাকে পেয়ে বসে। সে এ ধরনের একটি শহরে আসার ব্যাপারে অনুতপ্ত হয়, আর ঘুম থেকে (আবারো) জেগে ওঠে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্মৃত হয় এবং তার এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করা যে কতোখানি নির্বুদ্ধিতা ছিল তা-ই ভাবতে থাকে; কেননা এটি তো ছিল স্রেফ একটি স্বপ্ন, যেটি নিয়ে দুঃখ করার কিছুই নেই।

মানুষেরা ঠিক এ রকম। তারা এক লক্ষ বার দেখেছে তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলো শূন্যে হয়েছে পরিণত। তাদের গোপন পরিকল্পনা অনুযায়ী কোনো কিছুই এগোয় না। কিন্তু খোদাতা'লা তাদের চোখের ওপর এক বিস্মৃতির পর্দা ঝুলিয়েছেন, যার দরুন তারা অতীতে যা ঘটেছে তার সবই ভুলে যায়, আর আবারো নিজেদের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা বাস্তবায়নকল্পে পরিকল্পনা আঁটতে থাকে।

"আল্লাহতা'লা লোক সকল ও তাদের অন্তরের মাঝখানে দণ্ডায়মান।"
[সরাসরি অনুবাদ]

সূফী/দরবেশ হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ:) বাদশাহ থাকাকালে একবার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে একটি হরিণ শিকার করার উদ্দেশ্যে সেটির পেছন পেছন ছুটছিলেন, যতোক্ষণ না তিনি তাঁর সৈন্যদের বহু পেছনে ফেলে তাদের থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যান। তাঁর ঘোড়া হয়রান হয়ে পড়ে এবং ঘামতে থাকে, কিন্তু তবুও তিনি হরিণের পিছু ধাওয়া করেন। বিরান মরু-প্রান্তরের বেশ গভীরে পৌঁছুলে হঠাৎ হরিণটি মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় এবং হযরত ইবনে আদহাম (রহ:)-কে বলে, "আপনাকে এ কাজের জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি। আমায় শিকার করার উদ্দেশ্যে আপনাকে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বশীল করা হয়নি। আপনি যদি আমাকে ধরেও ফেলেন, তবুও এতে আপনি কী অর্জন করবেন?"

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ:) এতদশ্রবণে উচ্চস্বরে কেঁদে ওঠেন এবং ঘোড়া থেকে ঝাঁপ দিয়ে নামেন। ওই মরু এলাকায় একজন মেষচারক ছাড়া আর কেউই ছিল না। হযরত ইবরাহীম (রহ:) তাকে বলেন, "আমার এই হীরকখচিত রাজকীয় জুব্বা, অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়াটি গ্রহণ করো এবং আমাকে তোমার মোটা কাপড়ের আলখাল্লাটি দাও। আর কাউকেই বলো না, এমন কী এক বিন্দু আভাস-ও না এ মর্মে যে আমার কী ঘটেছে।" অতঃপর তিনি মোটা কাপড়টি গায়ে দিয়ে আপন পথ



ধরেন। এক্ষণে বিবেচনা করো তাঁর উদ্দেশ্য কী ছিল, আর তাঁর আসল উদ্দেশ্য কিসে পরিণত হয়েছিল! তিনি ধরতে চেয়েছিলেন একটি হরিণ, অথচ আল্লাহ তাঁকেই ওই হরিণের মাধ্যমে ধরে ফেলেন। অতএব, এই পৃথিবীতে আল্লাহতা'লা যেভাবে এরাদা/ইচ্ছা করেন, সেভাবেই সব কিছু যে ঘটে থাকে সেটি (গভীরভাবে) উপলব্ধি করো। তিনি-ই হলেন নকশা (পরিকল্পনাকারী), আর সকল উদ্দেশ্য তাঁর কাছ থেকেই আগমন করে থাকে।

হযরত উমর ফারূক (রা:) মুসলমান হবার আগে তাঁর বোনের বাসায় প্রবেশ করেন। তাঁর বোন ওই সময় উচ্চস্বরে তেলাওয়াত করছিলেন কুরআন মজীদের আয়াত: "তোয়া-হা; আমরা অবতীর্ণ করিনি।"

পবিত্র গ্রন্থ পাঠকালে বোন তাঁর ভাইকে দেখামাত্র-ই কুরআন শরীফটি লুকিয়ে ফেলেন এবং চুপ হয়ে যান। হযরত উমর (রা:) তরবারি উন্মুক্ত করে বলেন, "তুমি কী পড়ছিলে এবং কেন তা লুকিয়েছো তা আমায় বলো, নয়তো এই মুহূর্তে আমি তোমার শিরোচ্ছেদ করবো!" তাঁর বোন তাঁকে ভয় করতেন, জানতেন রাগান্বিত অবস্থায় তাঁর মেজাজ সম্পর্কে; তাই তিনি প্রাণের ভয়ে স্বীকার করেন, "আল্লাহতা'লা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে যে ঐশীবাণী প্রকাশ করেছেন, আমি তা থেকে পাঠ করছিলাম।"

এমতাবস্থায় হযরত উমর (রা:) বলেন, "পড়ো তবে, যাতে আমি শুনতে পাই।" তাঁর বোন তাঁকে সূরা 'তোয়া-হা' পুরোটুকু পাঠ করে শোনান। এতদশ্রবণে হযরত উমর (রা:) রাগান্বিত হয়ে তরবারি নাচিয়ে বলেন, "আমি এক্ষণে তোমায় মারলে আত্মরক্ষা করতে অক্ষম কাউকে হত্যা করা হবে। তাই প্রথমে আমি গিয়ে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর শিরোচ্ছেদ করবো, তারপর তোমার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবো।"

হযরত উমর (রা:) ক্রোধান্বিত অবস্থায় উন্মুক্ত তরবারি হাতে মহানবী (দ:)-এর মসজিদের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। কুরাইশ গোত্রের নেতৃবর্গ তাঁকে যেতে দেখে চিৎকার করে বলেন, "চমৎকার! উমর (রা:) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর পিছু ধাওয়া করছেন। নিশ্চয় এ নতুন ধর্মকে কেউ বাধা দেয়ার থাকলে উমর (রা:)-ই আছেন।"

কারণ হযরত উমর (রা:) এক শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান মানুষ ছিলেন। তিনি কোনো বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে অগ্রসর হলে সেটি ধূলিসাৎ হয়ে যেতো। বস্তুতঃ মহানবী (দ:) বহুবার দোয়া করেন, "এয়া আল্লাহ, আমার এ ধর্মকে আপনি উমর অথবা আবূ জাহেলের মাধ্যমে সাহায্য করুন।" কেননা এই দুজন ওই সময় শক্তি ও বীরত্বের জন্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। পরবর্তীকালে যখন হযরত উমর ফারূক (রা:) মুসলমান হন, তখন তিনি কাঁদতেন এবং বলতেন, "এয়া রাসূলাল্লাহ (দ:)! আমার জন্যে আফসোসের হতো, যদি আপনি আমার নামের আগে আবূ জাহেলের নাম উচ্চারণ করতেন। তখন আমার কী পরিণতি হতো? আমি তো ভ্রান্তিতেই রয়ে যেতাম।"

সংক্ষেপে, হযরত উমর (রা:) উন্মুক্ত তরবারি হাতে রাসূল (দ:)-এর মসজিদের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ইত্যবসরে হযরত জিবরীল (আ:) এসে মহানবী (দ:)-কে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (দ:)! হযরত উমর (রা:) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার জন্যে আসছেন। আপনি তাঁকে (আপন বলে) আপনার বুকে টেনে নিন।" হযরত উমর (রা:) যখন মসজিদের দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি স্পষ্ট দেখতে পান রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর কাছ থেকে একটি নূরানী (জ্যোতির্ময়) তীর উড়ে এসে তাঁরই হৃদয় ভেদ করেছে। তিনি উচ্চস্বরে এক চিৎকার দিয়ে অচেতন হয়ে পড়ে যান। অতঃপর তিনি অনুভব করেন এশক্-মহব্বতের পূর্ণতা তাঁকে গ্রাস করেছে, আর তিনি ওই পরম প্রেমময় অনুভূতির দরুন মহানবী (দ:)-এর মাঝে বিলীন হয়ে যেতে চান এবং আত্মবিলীন হন। তিনি আরয করেন, "এয়া রাসূলাল্লাহ (দ:)! আমাকে আপনার (ধর্মের) ঈমান দান করুন এবং আপনারই আশীর্বাদপূর্ণ বাণী প্রকাশ করুন, যাতে আমি শ্রবণ করতে পারি।" মুসলমান হওয়ার পর তিনি বলেন, "এক্ষণে, আপনার দরবারে উন্মুক্ত তরবারি হাতে আসার (ভ্রান্ত) কাজকে সংশোধন করার উদ্দেশ্যে আপনার প্রতি কাউকে ভুল কিছু বলতে শুনলে আমি তাকে কোনো ছাড়-ই দেবো না। এই তরবারি দ্বারা আমি তার গর্দান থেকে মাথা আলাদা করে ফেলবো।"

মসজিদ থেকে বের হয়ে হযরত উমর (রা:) হঠাৎ তাঁর পিতার মুখোমুখি হন। তাঁর বাবা বলে, "তুমি তো ধর্ম পরিবর্তন করেছো।" এক মুহূর্ত



দেরি না করে তিনি তাঁর পিতার শিরোচ্ছেদ করেন [অনুবাদকের নোট: হযরত উমর (রা:)-এর পিতা খাত্তাব ছিল মহানবী (দ:)-এর কড়া সমালোচক মক্কার কুফফার গোষ্ঠীর সদস্য]; এরপর তিনি রক্তমাখা তরবারি হাতে নিয়ে হাঁটতে থাকেন। কুরাইশ গোত্রীয় নেতৃবর্গ রক্তমাখা তরবারি দেখে হযরত উমর (রা:)-কে বলে, "তুমি ওয়াদা করেছিলে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর শির নিয়ে আসবে। তাঁর শির কোথায়?" হযরত উমর (রা:) বলেন, "আমি তা নিজের সাথে বহন করি!" তাদের কেউ একজন জিজ্ঞেস করে, "তুমি তাঁর শির এনেছো?" তিনি জবাব দেন, "না, ওই শির মোবারক নয়। আমি যে মুণ্ডু এনেছি, তা অপর (মানে বিরোধী) পক্ষের।"

এখন দেখো, হযরত উমর (রা:) কী পরিকল্পনা করেছিলেন আর খোদাতা'লা সে পরিকল্পনার কী পরিণতি দিয়েছেন। অতএব, জেনে রাখো, সকল বিষয়-ই আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছে করেন সেভাবে ঘটে থাকে।

পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম আরয করেন, "হে খোদা! যেহেতু আপনি আমাকে মনোনীত করেছেন (নবী হিসেবে) এবং আপনারই অনুমোদনের জুব্বা দ্বারা আমাকে সম্মানিত করেছেন, সেহেতু আমার সন্তানদেরও (মানে বংশধরদেরও) আপনি এই শ্রেষ্ঠত্ব মঞ্জুর করুন!" আল্লাহতা'লা এরশাদ ফরমান:

"আমার এই ওয়াদা/অঙ্গীকার মন্দকর্ম সংঘটনকারী/পাপীদের কাছে পৌঁছুবে না।" [সরাসরি অনুবাদ]

পয়গম্বর ইবরাহীম (আ:) যখন বুঝতে পারেন যে আল্লাহ পাক আপন মহব্বতপূর্ণ যত্ন পাপী এবং বেয়াদবদের জন্যে নসীব করেন না, তখন তিনি এতে দর-কষাকষির চেষ্টা করেন। তিনি আরয করেন, "এয়া আল্লাহ! যারা ঈমানদার ও পাপী নয়, তাদের ভাগ্যে নসীব করুন আপনার বিধানের অংশবিশেষ।" এমতাবস্থায় আল্লাহতা'লা এরশাদ ফরমান, "আমার বিধান সকল নারী ও পুরুষের জন্যে সার্বিক, আর প্রত্যেকেই এর থেকে একটি অংশ পাবে। এই অতিথিশালা হতে সমগ্র সৃষ্টি তাদের নেয়ামতের ভাগ ভোগ করে থাকে। কিন্তু আমার অনুমোদনের আলখাল্লা এবং আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বদানের মহাসম্মান হচ্ছে মনোনীত ও পছন্দকৃত পুণ্যাত্মাদের জন্যে নির্ধারিত এক বিশেষ উপহার।"

"আমরা গৃহটিকে নির্দিষ্ট করেছি মানুষের জন্যে খোদায়ী অনুগ্রহপ্রাপ্তির একটি স্থান ও আশ্রয়স্থল হিসেবে; 'অতএব, মাক্বামে ইবরাহীম (আ:)-কে তোমরা নিজেদের প্রার্থনার স্থান করে নাও'।" [সরাসরি অনুবাদ]

আক্ষরিক অর্থ গ্রহণকারীরা বলেন, এই 'গৃহ' শব্দটি দ্বারা কা'বা ঘরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা কা'বা শরীফে শিকার করা নিষেধ, আর কারো প্রতি অন্তরে আক্রোশ লালন করাও এখানে নিষেধ। আল্লাহতা'লা তাঁর নিজের জন্যেই ওই গৃহটিকে আলাদা করে নিয়েছেন। এটি একদম সত্য ও গ্রহণযোগ্য বিষয়। তবে এটি তো আল-ক্বুরআনের আক্ষরিক ব্যাখ্যা। সূফী/দরবেশবৃন্দ অবশ্য বলেন যে 'গৃহ'টি হচ্ছে আমাদের অস্তিত্বের অভ্যন্তরীণ অংশ। আরেক কথায় এর অর্থ, "হে খোদা! আমার অন্তঃস্থ সত্তাকে প্রলোভন ও দুনিয়ার মোহ হতে মুক্ত করে দিন; যাবতীয় কামনা-বাসনা ও অলস চিন্তা হতে পরিশুদ্ধ করুন, যাতে কোনো শঙ্কা অনুপ্রবেশ করতে না পারে এবং নিরাপত্তা বিরাজ করে। এটি যেন পুরোপুরিভাবে আপনারই প্রত্যাদেশের কেন্দ্রস্থল হয়।"

কথিত আছে যে, আল্লাহতা'লা আসমান পাহারা দেয়ার জন্যে উল্কাসমূহকে নিয়োজিত করেছেন, যাতে অভিশপ্ত শয়তানেরা ফেরেশতাদের গোপন বিষয়াদি শুনতে না পায়। মা'রেফতের গূঢ়তত্ত্ব বিশারদ (সূফী)-দের কাছে এর মানে হলো, 'এয়া আল্লাহ! আমাদের অন্তঃস্থ গৃহটির দেখ-ভাল করার জন্যে আপনার মহব্বতপূর্ণ যত্নের অভিভাবককে নিয়োজিত করুন, যাতে আমাদের কাছ থেকে শয়তানদের প্রলোভন ও ইন্দ্রিয় কামনা-বাসনার চালবাজি তিনি বিতাড়ন করতে পারেন।"

প্রত্যেকেই এই পথে যাত্রা আরম্ভ করেন নিজ নিজ জায়গা থেকে। ক্বুরআন মজীদ হচ্ছে দ্বিপার্শ্ব-বিশিষ্ট এক জরি। কেউ কেউ এর একটি দিক উপভোগ করেন, আর কেউ কেউ করেন অপর দিকটি। উভয়-ই সত্য, কেননা আল্লাহতা'লা চান সবাই এর থেকে উপকার পান। একইভাবে, কোনো নারীর একজন স্বামী ও একটি শিশু রয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই ওই নারীর সান্নিধ্য আলাদা আলাদাভাবে উপভোগ করে। শিশুটির আনন্দ নিহিত ওই নারীর বুকের দুধের মাঝে; আর স্বামীর আনন্দ তার সাথে সহবাসে। কিছু মানুষ তরীক্বা তথা পথের ক্ষেত্রে নবজাতক শিশু। তারা



আল-ক্বুরআনের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করে এবং ওই দুধ পান করে। কিন্তু যাঁরা পূর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধির বয়সে উপনীত, তাঁরা উপভোগ করেন আরেক ধরনের আনন্দ এবং লাভ করেন আল-ক্বুরআনের অন্তর্নিহিত অর্থের এক ভিন্নতর উপলব্ধি।

পয়গম্বর ইবরাহীম (আ:)-এর মক্বাম ও নামাযের স্থানটি কা'বা শরীফে অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট জায়গা, যেখানে দুই রাকআত নামায পড়তে হবে বলে আক্ষরিক অর্থ গ্রহণকারীরা বর্ণনা করেন। আল্লাহর শপথ, এটি অতি উত্তম একটি ব্যবস্থা। কিন্তু সূফী/দরবেশমণ্ডলীর মতানুযায়ী, পয়গম্বর ইবরাহীম (আ:)-এর মক্বাম হচ্ছে ওই অন্তঃস্থ হাল/অবস্থা, যেথায় আল্লাহর নামে (আধ্যাত্ম) সাধনা ও প্রয়াসের মাধমে এই (উচ্চ) মক্বামে/স্তরে উন্নীত হয়ে তোমাদের উচিত তাঁরই খাতিরে বা ওয়াস্তে নিজেদেরকে (ঐশী প্রেমের) অনলে নিক্ষেপ করা। সেই মক্বামে পুণ্যাত্মাবৃন্দের চোখে আপন সত্তার কোনো স্থান না থাকার দরুন এবং নিজেদের (পরিণতি) নিয়ে কম্পমান না হওয়ার ফলে তাঁরা নিজেদেরকে আল্লাহরই ওয়াস্তে উৎসর্গ করতে পারেন। মক্বামে ইবরাহীম (আ:) স্থানটিতে দুই রাকআত নামায আদায় করা চমৎকার একটি বিষয়, কিন্তু (নামাযের জন্যে) দাঁড়ানো (ক্বেয়াম)-টুকু হোক এই পৃথিবীতেই, আর সেজদা (মস্তক অবনতকরণ) হোক পরবর্তী জগতে।

আসল কা'বা হলো আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া (রহ:)-বৃন্দের অন্তর/হৃদয়সমূহ, যা খোদাতা'লার প্রত্যাদেশের কেন্দ্রস্থল। বাহ্যিক কা'বা তারই একটি শাখা মাত্র। এটি যদি অন্তরের বিষয় না হতো, তাহলে কা'বার কী ফায়দা বা উপকারিতা থাকতো? আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া (রহ:) তাঁদের নিজেদের কামনা-বাসনা ত্যাগ করে আল্লাহরই ইচ্ছার অনুসরণ করেন। খোদাতা'লা যা আদেশ করেন, তাঁরা তা-ই পালন করেন। আল্লাহতা'লা যাকে নিজ করুণা হতে মাহরূম তথা বঞ্চিত করেন, ওই সমস্ত লোক সূফী/দরবেশবৃন্দের প্রতি উদাসীন; না, বরঞ্চ তাদের দৃষ্টিতে ওই পুণ্যাত্মাবৃন্দ হলেন শত্রু।

"আপনারই হাতে (হে খোদা) আমরা আপন অন্তরের রাস করি অর্পণ,
যা আপনি ঘোষণা করেন রন্ধন, আমরা তাকে বলি দগ্ধকরণ।"

আমি সব কিছুই বলি তুলনা দিয়ে। তুলনা এক জিনিস, সমার্থকতা আরেক। আমরা আল্লাহর নূর (জ্যোতি)-কে তুলনার খাতিরে একটি প্রদীপ/হারিকেনের মতো মনে করি, আর আউলিয়া/দরবেশ ওই হারিকেনের (চারপার্শ্বস্থ) কাঁচের মতো। খোদাতা'লার নূরকে কোনো জীব বা স্থান ধারণ করে রাখতে পারে না। অতএব, এটিকে কীভাবে কাঁচের হারিকেনে ধারণ করা সম্ভব? কীভাবে তাঁর নূরের পরিধিকে একটি অন্তর বা হৃদয়ে ধারণ করে রাখা সম্ভব? তথাপিও খুঁজলে তোমরা সেটিকে অন্তরেই পাবে; কোনো বাক্সের মতো নয় যেখানে ওই নূর বসতি করে, বরং তোমরা ক্বলব্ তথা অন্তর হতে ওই নূরকে জ্যোতি ছড়াতে দেখবে। তোমরা যেমন তোমাদের প্রতিফলন আয়নায় দেখতে পাও অথচ তোমাদের ওই প্রতিচ্ছায়া খোদ সেই দর্পণের নয়, তেমনি তোমরা যখন আয়নার দিকে তাকাও তখন তোমরা নিজেদেরই দেখতে পাও।

তুলনার মাধ্যমে সকল সূক্ষ্ম বিষয় বোধগম্য হয়, আর একবার তা বুদ্ধিগ্রাহ্য হলে ইন্দ্রিয়গুলোও অনুভব করতে পারে। তাঁরা (ইসলামী বিদ্বানমণ্ডলী) বলেন, পরবর্তী জগতে বইপত্র উড়বে, কিছু ডান হাতের দিকে, আর কিছু বাম হাতের দিকে। আরো রয়েছেন ফেরেশতামণ্ডলী, আরশ-কুর্সি, বেহেশ্‌ত-দোযখ, মীযান (পাল্লা), (চূড়ান্ত) হিসেব এবং কিতাব; এগুলোর কোনোটি-ই মিসাল বা সাদৃশ্যপূর্ণ বর্ণনা না দেয়া পর্যন্ত স্পষ্ট হয় না। এই জগতে এগুলোর কোনোটিরই অনুরূপ কোনো বস্তু নেই। তথাপিও তুলনার মাধ্যমে এগুলো সম্পর্কে জানা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, সকল মানুষ - কী রাজা, কী মুচি, কী বিচারক, কী দর্জি - রাতে ঘুমিয়ে পড়েন। একবার ঘুমোলে তাঁদের চিন্তা পাখা মেলে, আর কোনো ভাবনা-ই তখন তাঁদের কারো মাঝে আর অবশিষ্ট থাকে না। অতঃপর ভোর হলে ফেরেশতা ইসরাফিলের শিঙ্গার আওয়াজে যেন তাদের শরীরের অণুগুলো জীবন ফিরে পায়, আর প্রত্যেকের ভাবনাগুলোও পরকাল হতে আগত পাকানো কাগজের মতো প্রত্যেকের দিকে কোনো ভ্রান্তি ছাড়াই অধঃশিরে ধাবিত হয়; দর্জির চিন্তা নিজের কাছে ফেরে, আইনজ্ঞের চিন্তাও ফেরে তাঁরই কাছে; কামারের চিন্তা কামারের কাছে, নিপীড়কের চিন্তা নিপীড়কের কাছে, আর ন্যায়বানের চিন্তাও ন্যায়বানের কাছে ফেরে। কেউ কি রাতে দর্জি হিসেবে ঘুমোন আর



সকালে মুচি হিসেবে ঘুম থেকে জাগেন? না! কেননা ওই কাজ তাঁদের নিজ নিজ অধিকারে, তাই তাঁরা আগের মতোই নিজ নিজ পেশায় ফিরে যান। এ দৃষ্টান্ত থেকে তোমরা দেখতে পাও যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপমা পরবর্তী জগতেও বজায় থাকে। এটি অর্থবোধক, কেননা এই জগতেও আমরা একই জিনিস দেখতে পাই।

আমরা যদি এই তুলনা দিতে থাকি, যতোক্ষণ না আমরা এর যোগসূত্রের শেষ অবধি পৌঁছে যাই, ততোক্ষণ আমরা এই জগতেই পরবর্তী জগতের সমস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পারবো। আমরা শুঁকে শুঁকে এই জগতের সবগুলো পরিস্থিতির খোঁজ পেয়ে যাবো, যেগুলোর সাথে পরবর্তী জগতের মিল রয়েছে; আর আমরা দেখতে পাবো যে সকল বস্তু বা বিষয়-ই আল্লাহতা'লার সর্বময় ক্ষমতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। (মানুষের) কতো হাড়গোড়-ই না তাদের কবরে তথা সমাধিতে হয়েছে ক্ষয়প্রাপ্ত, অথচ আনন্দ ও মত্ততার সুখনিদ্রা যাপন এবং বিশ্রাম উপভোগ করছে তারা। এগুলো কোনো অনর্থক উপদেশ বাণী নয় (আমার)। কেননা প্রবাদ আছে, '(কবরের) মাটি যেন তাদের ওপর মিষ্ট আচ্ছাদন দেয়।' যদি মাটির কোনো মিষ্ট-সচেতনতা না থাকতো, তাহলে কেউ এরকম কথা কেন বলতেন?

"আমি প্রার্থনা করি ওই চাঁদমুখি প্রতিমা শত বছর দীর্ঘজীবী হোক,
আমার বিশ্বস্ত হৃদয় কেঁপেছে তারই অশ্রু যখন করেছে চিকচিক,
তার দরজার ধুলোয় পরম সুখে আমারই হৃদয় করেছে মৃত্যু বরণ,
এই প্রার্থনা নিয়ে, 'হে প্রভু, তার ধুলো যেন চিরসুখে করে অবস্থান।"

এক দম্পতি একটি ফরাশে (ম্যাট্রেস-এ) ঘুমোচ্ছে। (স্বপ্নে) নারীটি নিজেকে এক ভোজসভা, গোলাপ বাগান ও বেহেস্তের মাঝখানে আবিষ্কার করে; আর পুরুষটি নিজেকে দেখতে পায় জাহান্নামের পাহারাদার সাপ-বিচ্ছুর মাঝখানে। অথচ তোমরা অনুসন্ধান করলে বেহেশত কিংবা দোযখ কোনোটি-ই দেখতে পাবে না। তাহলে এটি কেন আশ্চর্যের বিষয় হবে যে কারো কারো দেহের অংশ এমন কী সমাধিতেও আনন্দ, বিশ্রাম ও মত্ততার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, অপরদিকে কেউ কেউ ব্যথা, শাস্তি ও নিদারুণ যন্ত্রণা বোধ করে, যদিও তোমরা আনন্দ বা বেদনার

কোনোটিকেই দেখতে পাও না? অতএব, তুলনার মাধ্যমে অদৃশ্য বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে থাকে।

তুলনা এক জিনিস, সমার্থকতা আরেক। মা'রেফতের তত্ত্বজ্ঞানী সূফী-দরবেশবৃন্দ অবসর-বিনোদন, সুখ-শান্তি ও (আধ্যাত্মিক) বিস্তারকে নাম দেন 'ফাগুন'। পক্ষান্তরে, সংকোচন ও দুঃখ-বেদনাকে বলেন 'হেমন্ত'। সুখ-শান্তি ও ফাগুনের মাঝে, দুঃখ-বেদনা ও হেমন্তের মাঝে প্রকৃত সাযুজ্য কী রয়েছে? অথচ এই তুলনা ব্যতিরেকে মনুষ্যবুদ্ধি বা মস্তিষ্ক অর্থ বুঝতে অক্ষম। তাই কুরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে:

"অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি এক সমান? আলো ও অন্ধকার? (জান্নাতের) ছায়া ও (দোযখের) অতিশয় উষ্ণ তাপ?" [সরাসরি অনুবাদ]

এখানে ঈমানদারিকে আলোর সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে, আর কুফর বা অবিশ্বাসকে দেয়া হয়েছে অন্ধকারের সাথে; কিন্তু বিশ্বাসকে বলা যেতো এক আনন্দময় (অন্ধকার) ছায়া এবং অবিশ্বাসকে তুলনা করা যেতো জ্বলন্ত, দয়া-মায়াহীন এমন এক সূর্যের সাথে, যেটি মস্তিষ্ককে সেদ্ধ করে। ঈমানের উজ্জ্বল সূক্ষ্মতার সাথে এই পৃথিবীর আলোর কী সাযুজ্য বিদ্যমান? কিংবা অবিশ্বাসের ঘুটঘুট অন্ধকারের সাথে আমাদের জ্ঞাত রাতের কী সাদৃশ্য বিরাজমান?

তোমরা কি এ ব্যক্তিকে দেখেছো, আমরা কথা বলার সময় যিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন? ওই তন্দ্রা অমনোযোগিতার কোনো আলামত নয়, বরঞ্চ তা নিরাপত্তারই চিহ্ন। এ যেনো এক অন্ধকার রাতে কোনো দুর্গম ও বিপজ্জনক রাস্তা ধরে সফররত কাফেলার মতো, যারা এই শঙ্কা দ্বারা পরিচালিত হয়, পাছে কোনো বিপদ তাদের ওপর এসে পতিত হয়। কিন্তু যখনই তারা কোনো কুকুর বা মোরগের গলার আওয়াজ কানে শুনতে পায় এবং কোনো গ্রামের সন্ধান পায়, তৎক্ষণাৎ তারা নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। তারা পা ছেড়ে দিয়ে সুখ-নিদ্রাগত হয়। অথচ রাস্তায়, যেখানে কোনো শব্দ বা মৃদুগুঞ্জন-ও তাদের বিরক্ত করতো না, তারা সেখানে ভয়ে ঘুমোতে পারতো না। পক্ষান্তরে, গ্রামে তারা নিরাপত্তা পায়, আর কুকুরের ঘেউ ঘেউ ও কাকের কা কা ডাক সত্ত্বেও তারা সুখ খুঁজে পায় এবং ঘুমিয়ে পড়ে।



আমাদের (এ উপদেশ) বাণীও সমাজ ও নিরাপত্তা হতে আগত। বস্তুতঃ এসব বাণী আম্বিয়া (আলাইহিম আস্ সালাম) ও আউলিয়া (রহমতুল্লাহে আলাইহিম)-মণ্ডলীরই পবিত্র কথা। যখন আত্মা ওই সকল পরিচিত বন্ধুর বাণী শুনতে পায়, তখন সেটি নিরাপদ বোধ করে এবং যে কোনো ভয়-ভীতি হতেও মুক্তি পায়। কেননা এসব বাণীতে মাখানো হয়েছে আশা ও পরম সুখের এক সুগন্ধ।

এ যেনো ওই আঁধার রাতের মুসাফিরবর্গের মতো, যারা ভাবেন প্রতিটি মুহূর্তে তস্করের দল বুঝি তাদের কাফেলার সাথে মিশে গিয়েছে; তাই তারা তাদের সহযাত্রীদের কথাবার্তা শুনতে এবং তাদের কথাবার্তার দ্বারা তাদেরকে চিনতে চান। একবার তাদের বন্ধুদের কথা বলতে শুনতে পেলে তারা নিরাপদ বোধ করেন। একই ব্যাপার আপনার ক্ষেত্রেও সত্য (খোদাতা'লাকে সম্বোধন করেছেন মওলানা রূমী)। যেহেতু আপনার সত্তা (অতি) সূক্ষ্ম, সেহেতু আমাদের জন্যে চাহনি যথেষ্ট নয়; কিন্তু যদি আপনি কথা বলেন, তাহলে আমরা এরপর আমাদের আত্মাগুলোর সুপরিচিত বন্ধুর কথা শুনতে পাবো এবং নিরাপদ বোধ করবো, আর শান্তিতেও অবস্থান করবো। অতএব, (মেহেরবানি করে) কথা বলুন!

কোনো নির্দিষ্ট ইঁদুর যেটি গম ক্ষেতে বসবাস করে, সেটি ছোট হওয়ার দরুন দৃশ্যমান নয়; কিন্তু যখন সেটি আওয়াজ করে, তখন মানুষেরা ওই আওয়াজের দ্বারা সেটিকে চিনতে পারে। মানুষেরা এই জগতের শস্যক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে নিমগ্ন, আর আপনার (মানে খোদাতা'লার) সত্তা অতি সূক্ষ্ম হওয়ায় দৃশ্যমান নয়। অতএব, (মেহেরবানি করে) কথা বলুন, যাতে তারা আপনাকে চিনতে পারে।

আমরা যখন কোনো নির্দিষ্ট স্থান দেখার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, তখন আমাদের অন্তর/হৃদয় সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে প্রথমে সেখানে যায়। এরপর আমাদের হৃদয় প্রত্যাবর্তন করে এবং আমাদের শরীরকেও টেনে নিয়ে যায় সেখানে। বস্তুতঃ এ জগতের অন্তর/হৃদয়-(রূপী) আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া (রহ:)-বৃন্দের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে জগতের সমস্ত নারী ও পুরুষ দেহেরই মতো। হৃদয়ের এই সত্তামণ্ডলী তাঁদের পেশী ও চর্মের মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুলো ছেড়ে প্রথমে পরলোকে যাত্রা করেন। তাঁরা ওই জগতের গভীরতা ও উচ্চতা

জরিপ করেন, আর সকল পর্যায় অতিক্রম করেন, যতোক্ষণ না তাঁরা পথটি চেনেন। অতঃপর তাঁরা (এ জগতে) ফিরে আসেন এবং মানবজাতিকে আহ্বান করেন এ কথা বলে, "মৌলিক জগতের দিকে এসো! কেননা আমাদেরই আবিষ্কৃত বাগানের তুলনায় এই দুনিয়া হচ্ছে বিবর্ণ ও শূন্যতায় ভরা এক ধ্বংসাবশেষ।"

এ থেকে তোমাদের বোঝা উচিত যে অন্তর/হৃদয় সব সময়েই এর প্রেমাস্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর পর্যায়গুলো অতিক্রমেরও কোনো প্রয়োজন এর নেই; নেই কোনো প্রয়োজন রাহাজানদের ভয় করার, কিংবা খচ্চরের পালানেরও। এসবের সাথে বাঁধা পড়েছে স্রেফ হতভাগ্য শরীরই।

আমি আমার অন্তর/হৃদয়কে শুধাই: "তুমি যে নামের আশীর্বাদ (জপতপ) করো তাঁর সেবা হতে তুমি কেন নিষিদ্ধ?" মোর অন্তর উত্তর দেয়, "তুমি আলামত চিনতে হয়েছো অশুদ্ধ, আমি প্রতিনিয়ত রয়েছি তাঁরই সেবায় দায়বদ্ধ, তুমি-ই বিচ্যুতির শেকলাবদ্ধ।" [ভাবানুবাদ]

যেখানেই থাকো, যা-ই ঘটুক না কেন, সর্বদা আশেক্ব - আবেগাপ্লুত আশেক্ব (প্রেমিক) হতে সর্বাত্মক প্রয়াস পাবে। একবার প্রেম তোমাদের মালিকানাধীন সম্পত্তি হয়ে গেলে তোমরা চির-প্রেমিক হবে, কবরে, হাশরে, নশরে কিংবা বেহেশতে - চির, চিরকালের তরে। তোমরা গমের চাষ করলে তা অবশ্যই ফলবে, গমের মওজূদ গোলাঘর পূর্ণ করবে, গমের রুটি দ্বারা চুলোও ভরে যাবে।

মজনূন যখন লায়লাকে একখানা পত্র লেখার ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন তিনি হাতে একটি কলম নিয়ে লেখেন:

"তব নাম মোর জিহ্বায় উচ্চারিত,
তব প্রতিচ্ছায়া মোর দৃষ্টির আওতাভুক্ত,
তব স্মৃতি মোর সমগ্র অন্তরে পরিব্যাপ্ত,
কোথায় তবে লিখবো মোর ভাবনা যতো।" [ভাবানুবাদ]

(হে খোদা) আপনার প্রতিচ্ছায়া আমারই দৃষ্টির আওতায় রয়েছে, আপনার পবিত্র নাম মোবারক আমার জিহ্বা ছেড়ে যায় না, আপনার স্মৃতি (যিকর) দ্বারা আমারই আত্মার গভীর রয়েছে পরিবৃত। এমতাবস্থায় কোথায় লিখি,



যখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনি রয়েছেন এখানে, এ সবগুলো স্থানেই? কলম ভেঙ্গেছে, আর কাগজও গিয়েছে ছিঁড়ে।

এ ধরনের বাস্তবতায় পরিপূর্ণ অনেক অন্তর, কিন্তু তারা কথায় তা প্রকাশ করতে অক্ষম। এটি আশ্চর্যজনক কিছু নয়, আর ওই ভালোবাসায় কোনো সীমাবদ্ধতা-ও নয়। পক্ষান্তরে, বিষয়টির মূল হচ্ছে অন্তর, আকুলতা ও আবেগ। কোনো শিশু দুধ ভালোবাসে, আর তা হতে সে শক্তি ও সামর্থ্য সঞ্চয় করে; তথাপি শিশুটি দুধ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম, অথবা বর্ণনা দিতেও অপারগ এ কথা বলে: "দুধ পানে আমি যে কী মজা পাই, আর সেটি ব্যতিরেকে আমি যে কতো দুর্বল ও পীড়িত।" এটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে শিশুটির কোনো ভাষা নেই। তবুও শিশুটি দুধ কামনা করে। অপরদিকে, অধিকাংশ পূর্ণ বয়স্ক মানুষ যদিও দুধকে হাজারো পন্থায় বর্ণনা করতে পারেন, তথাপিও তারা শিশু থাকতে যেভাবে দুধে মজা পেয়েছিলেন সেরকম আনন্দ তারা তাতে পাবেন না।

## উপদেশ বাণী - ৪৫

মওলানা রূমী (রহ:) জিজ্ঞেস করেন: ওই যুবকের নাম কী?
কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) উত্তর দেন: "সাইফুদ্দীন" (ধর্ম/ঈমানের তরবারি)।

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: কেউই একটি তরবারিকে পরীক্ষা করতে পারবেন না যতোক্ষণ তা কোষবদ্ধ অবস্থায় আছে। নিশ্চয় ঈমান বা ধর্মের তরবারি হচ্ছে সেটি, যেটি তরীক্বা তথা পথকে সুরক্ষা দেয় এবং শক্তিশালী করে, খোদাতা'লার প্রতি আপন সাধনা ও কর্মপ্রচেষ্টা উৎসর্গ করে, ভুলভ্রান্তি হতে যথার্থতাকে (সবার সামনে) প্রকাশ করে, আর মিথ্যে হতে সত্যকে পৃথক করে থাকে। কিন্তু সর্বপ্রথমে নিজেদেরকে সংশোধন করতে হবে এবং নিজেদের চারিত্রিক উন্নতি সাধন করতে হবে; মহানবী (দ:) যেমনটি এরশাদ ফরমান: "তোমার নিজেকে দিয়েই আরম্ভ করো।"

অতএব, তাঁরা সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা নিজেদের প্রতি আরোপ করেন এ কথা বলে, "নিশ্চয় আমিও তো মানুষ। আমার আছে হাত, পা, কান, চোখ ও মুখ এবং উপলব্ধিক্ষমতা/সমঝদারি। আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া

(রহ:) যাঁরা খোদার আশীর্বাদ অর্জন করেছেন এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছেন, তাঁরা আমারই মতো যুক্তি-বিবেচনা, জিহ্বা, হাত ও পা-বিশিষ্ট। তাঁদেরকে কেন হেদায়াত তথা পথ দেখানো হয়েছে? তাঁদের জন্যে যে দরজা খোলা ছিল, তা আমার জন্যে বন্ধ কেন?" এ ধরনের ব্যক্তি রাত-দিন নিজেদের সংশোধন করেন এবং এতে সংগ্রাম করেন এ কথা বলে, "আমি কী করেছি যার দরুন (আল্লাহর কাছে) গৃহীত (মক্বূল) হতে পারিনি?" এভাবে তাঁরা নিরন্তর সাধনা করেন যতোক্ষণ না তাঁরা খোদার তরবারি (সাইফুল্লাহ) ও হক্ক তথা (খোদায়ী) সত্যের জিহ্বাতে পরিণত হন।

উদাহরণস্বরূপ, দশজন মানুষ একটি গৃহে প্রবেশ করতে চান। নয়জন সে পথপ্রাপ্ত হন, কিন্তু একজন বাইরে থেকে যান এবং তাকে প্রবেশের অনুমতিও দেয়া হয় না। নিশ্চয় এই ব্যক্তি আত্মবিশ্লেষণ ও বিলাপ করেন এই বলে, "আমি কী করেছি যার কারণে তাঁরা আমাকে বাইরে রেখেছেন? আমি কোন্ বদ অভ্যেস ও আচরণের দোষে দুষ্ট?" ওই ব্যক্তি সমস্ত দোষ নিজের প্রতি আরোপ করেন এবং নিজের ত্রুটি ও শিষ্টাচারের অভাব বুঝতে পারেন। মানুষের কখনোই একথা বলা উচিত নয়, "খোদা আমার প্রতি এরকম করেছেন, আমি কী-ই বা করতে পারি? এটি আল্লাহরই ইচ্ছা। আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে আমাকে পথ দেখানো হতো।" এ জাতীয় কথা খোদার প্রতি নাফরমানি এবং তাঁর বিরুদ্ধে তরবারি বের করারই সামিল। এমতাবস্থায় ওই ধরনের লোক খোদার বিরুদ্ধে তরবারি হবে, খোদার তরবারি হবে না।

আল্লাহ পাক পরিবার, আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের বহু ঊর্ধ্বে। কুরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে, "না তাঁর কোনো সন্তান আছে এবং না তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন।" তোমরা এ কথা বলতে পারবে না যে যাঁরা তাঁর নৈকট্যের রাস্তা পেয়েছেন, তাঁরা তাঁরই অতি নিকটাত্মীয়, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আরো আপন জন। কেউই আল্লাহতা'লার মুখাপেক্ষিতা ছাড়া তাঁর নিকটবর্তী হননি।

**পংক্তি:**

"আল্লাহতা'লা স্বয়ংসম্পূর্ণ,
তোমাদেরই যতো দৈন্য।"



ভক্তি ও আত্মসমর্পণ ছাড়া খোদাতা'লার নৈকট্য কখনোই অর্জন করা যায় না। তিনি হচ্ছেন দাতাদের দাতা, সেরা দাতা। তিনি সাগরের বুক মুক্তাপূর্ণ করেছেন, গোলাপের অঙ্গাবরণকে কাঁটা দ্বারা সুশোভিত করেছেন, এক মুঠো ধুলোয় জীবন ও আত্মা মঞ্জুর করেছেন; এসব করেছেন কোনো নজির ও কোনো পছন্দ ছাড়াই। সমগ্র সৃষ্টি-জগৎ তাদের হিস্যা তাঁর কাছ থেকে পেয়ে থাকে।

যখন মানুষেরা কোনো দাতা ব্যক্তি সম্পর্কে শোনেন, যিনি মূল্যবান উপহার সামগ্রী দান ও সাহায্য-সহযোগিতা করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা অমন একজন সম্পদ দানকারীর দর্শনার্থী হতে চান এই আশায় যে তারাও ওই দান-সদকাহর ভাগিদার হতে পারবেন। যেহেতু খোদাতা'লার করুণা ও অনুগ্রহ সারা বিশ্বজগতে এতো সুপ্রসিদ্ধ, সেহেতু তোমরা তাঁর কাছে যাচঞা করো না কেন? কেন তোমরা তাঁর কাছে সম্মানের আলখেল্লা কিংবা দামী উপহার চাও না? বরঞ্চ তোমরা অলস বসে আছো আর মুখে বলছো, "তিনি যদি চান তবে আমাকে দেবেন।" অতঃপর তোমরা আর তাঁর কাছে কখনোই কোনো কিছু প্রার্থনা করো না।

যুক্তি-বিবেচনা ও উপলব্ধিবিহীন কোনো কুকুর খিদে পেলে তোমাদের কাছে আসে এবং লেজ নেড়ে জানান দেয়, "আমায় খাবার দিন। আমি আপনার কাছে রাখা খাবার দেখে ক্ষুধার্ত বোধ করছি। অনুগ্রহ করে কিছু খেতে দিন।" একটি কুকুর অতোটুকু জানে। তোমরা কি কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট? কুকুর তো তৃপ্ত নয় ছাইয়ের ওপর ঘুমিয়ে এ কথা বলতে, "তিনি চাইলে কিছু খাবার আমার দিকে ছুঁড়ে দেবেন।" বরঞ্চ সেটি লেজ নেড়ে যাচঞা করে। তোমাদেরও লেজ নেড়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিত, কেননা এরকম মহানতম দাতার উপস্থিতিতে যাচঞা করা এক চমৎকার আকাঙ্ক্ষারই অভিব্যক্তি। তোমরা অভাবগ্রস্ত হলে অমন এক দাতা হতে চাও, যিনি কৃপণ নন এবং যিনি মহা সম্পদের অধিপতি।

খোদাতা'লা সর্বদা তোমাদের সন্নিকটে আছেন। প্রতিটি চিন্তা ও ধারণা যা তোমাদের মস্তিষ্কে উদিত হয়, তাতে রয়েছেন খোদা; কেননা ওই ধারণা ও ভাবনার অস্তিত্ব দিয়েছেন তিনি স্বয়ং। অথচ এতো কাছে থাকা সত্ত্বেও তোমরা তাঁকে দেখতে পাও না। এতে এমন আশ্চর্যের কী আছে? তোমরা প্রতিটি কর্ম যে সংঘটন করো, যুক্তি-বিবেচনা তোমাদের পথপ্রদর্শন করে

এবং তা তোমাদের কর্মেরও সূত্রপাত করে। কিন্তু তোমরা এই বিচার-বিবেচনা ক্ষমতাকে দেখতে পাও না। তোমরা এর প্রভাব দেখতে পাও, কিন্তু এর সত্তাকে দেখতে পাও না। উদাহরণস্বরূপ, কেউ হাম্মামখানায় (উষ্ণতাপবিশিষ্ট গোসলখানায়) গিয়েছেন। ওই গোসলখানার যেখানেই তিনি যান না কেন, তিনি আগুনের তাপ অনুভব করবেন - যদিও আগুনকে সরাসরি দেখতে পাবেন না। গোসলখানা ছেড়ে বের হলেই কেবল তিনি আসল আগুন ও তার শিখা দেখতে পাবেন। এ থেকে সবাই জানতে পারেন যে হাম্মামখানার ওই তাপ আগুন হতে নির্গত হয়।

মানুষও এক বিশাল হাম্মামখানার মতো, যার অভ্যন্তরে বসত করে বিচার-বিবেচনা, রূহানী তথা আত্মাগত ও নফসানী তথা একগুঁয়ে ও নিকৃষ্ট আপন (জীব)-সত্তার উত্তাপ। কিন্তু একবার তোমরা এই (দুনিয়ার) হাম্মামখানা ত্যাগ করে পরবর্তী জগতে প্রবেশ করলে প্রকৃত সত্তাগুলোকে দেখতে পাবে। তখন-ই তোমরা জানতে পারবে যে বুদ্ধিমত্তা আগমন করে যুক্তি-বিবেচনার প্রভা হতে, ভুল ও মিথ্যে ধারণা/বিশ্বাস এবং ভণ্ডামি নিঃসৃত হয় নিকৃষ্ট আপন সত্তা হতে, আর খোদ জীবনের প্রেরণা-ই হচ্ছে রূহ/আত্মার ফলশ্রুতিতে। তোমরা পরবর্তী জগতে এই তিনের সবগুলো সত্তাকেই স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে, কিন্তু যতোক্ষণ তোমরা এই হাম্মামখানায় অবস্থান করবে, ততোক্ষণ এগুলো অদৃশ্যই থেকে যাবে। তোমরা শুধু এগুলোর প্রভাবের অভিজ্ঞতা-ই সঞ্চয় করতে পারবে।

আমরা যখন সামারকান্দ অঞ্চলে ছিলাম, তখন খাওয়ারিযম শাহ ওই রাজ্যে অবরোধ দেন এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীসহ আক্রমণ করেন। আমাদের থেকে বেশি দূরে নয় এমন এক জায়গায় বসবাস করতো এক অতি সুন্দরী যুবতী; সে এতো অপরূপা ছিল যে গোটা শহরে কেউই তার সমকক্ষ ছিল না। আমি তাকে প্রার্থনা করতে শুনি এই বলে, "হে খোদা, আমি জানি আপনি কখনোই আমাকে পাপীদের হাতে তুলে দেয়ার অনুমতি দেবেন না। আমি জানি, আপনি কখনোই সে অনুমতি দেবেন না। আমি আপনার ওপর আস্থা রাখি, হে খোদা।"

সামারকন্দ শহরটি ধ্বংসসাধনপূর্বক লুঠপাট হলে এর সব অধিবাসী, এমন কী ওই নারীর দাসীরাও বন্দি হয়। কিন্তু তাকে অক্ষত ছেড়ে দেয়া হয়। তার মাত্রাহীন সৌন্দর্য সত্ত্বেও কোনো পুরুষ-ই তার প্রতি কুদৃষ্টি দেয়নি।



এ থেকে জেনে রেখো, যে কেউ আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পিত হলে সে ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে। আল্লাহর উপস্থিতিতে মানুষের কোনো আর্জি-ই কখনো উপেক্ষিত হয় না। অতএব, খোদাতা'লার কাছেই যাচঞা করো, আর তোমাদের যা যা প্রয়োজন তা তাঁর কাছে চাও; কেননা তোমাদের আর্জি বৃথা যাবে না।

"তোমরা আমায় ডাকো, আমি তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেবো।"

[সরাসরি অনুবাদ]

কোনো নির্দিষ্ট এক দরবেশ তাঁর ছেলেকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে তার যা কিছু প্রয়োজন হয়, সে যেন 'আল্লাহর কাছে যাচঞা করে।' অতঃপর বহু বছর অতিক্রান্ত হয়। একদিন ওই সন্তান একা বাসায় থাকাকালে ক্ষুধার্ত হয়। তার স্বভাব অনুযায়ী সে বলে, "(হে খোদা) আমি কিছু খাবার চাই, খিদে পেয়েছে।" অকস্মাৎ তরি-তরকারির একটি পাত্র আবির্ভূত হয়, আর ওই সন্তান পেট পুরে তা গ্রহণ করে। তার পিতা-মাতা বাসায় ফিরলে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার কি খিদে পায়নি?" শিশুটি উত্তর দেয়, "আমি স্রেফ খাবার চেয়েছি এবং খেয়েছি।" তার বাবা তখন বলেন, "আল্লাহরই জন্যে সমস্ত প্রশংসা। তাঁর প্রতি তোমার বিশ্বাস ও আস্থা অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়েছে!"

হযরত মরিয়ম (আ:) জন্মগ্রহণ করলে তাঁর মা ওয়াদা করেন যে তিনি তাঁকে 'খোদার ঘরে' সমর্পণ করবেন এবং তাঁর দেখাশুনা করবেন না। তিনি মরিয়ম (আ:)-কে উপাসনালয়ে রেখে আসেন। পয়গম্বর যাকারিয়্যা (আলাইহিস সালাম) শিশুটির যত্ন নেয়ার পক্ষে নিজ দাবি উত্থাপন করেন, কিন্তু অন্যরাও তা (দেখাশুনা) করতে চান। এমতাবস্থায় তাঁদের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। ওই যুগে প্রচলিত (বিরোধ মীমাংসার) একটি রীতি ছিল এই যে, বিরোধে জড়িত প্রত্যেক পক্ষকে পানিতে একখানি কাঠি ছুঁড়তে হতো - যার কাঠি সবচেয়ে দীর্ঘ সময় জলে ভেসে থাকতো, তিনি-ই জয়ী বলে বিবেচিত হতেন। ঘটনাচক্রে পয়গম্বর যাকারিয়্যা (আ:)-এর ছুঁড়া কাঠি জয়ী হয়। ফলে তারা সবাই একমত হন যে হযরত মরিয়মের (আ:) যত্নের অধিকার তাঁরই কাছে সংরক্ষিত। অতএব, প্রতি দিন পয়গম্বর যাকারিয়্যা (আ:) শিশুটির কাছে খাবার নিয়ে আসতেন, কিন্তু তিনি তাঁর আনা খাবারের হুবহু অনুরূপ খাবার ওই

বাচ্চার পাশে দেখতে পেতেন। তাই তিনি তাঁকে বলেন, "ওহে মরিয়ম, আমি তোমার দায়িত্ব নিয়েছি। তাহলে এই খাবার আসছে কোত্থেকে?" হযরত মরিয়ম (আ:) উত্তরে বলেন, "আমি যখন খাবারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি, তৎক্ষণাৎ আল্লাহর কাছে তা প্রার্থনা করি, আর তিনি তা আমার কাছে প্রেরণ করেন। তাঁর নেআমত/আশীর্বাদ ও দয়া অসীম। যে কেউ তাঁর ওপর নির্ভর করলে তাদের আস্থা বৃথা যাবে না।"

পয়গম্বর যাকারিয়্যা (আ:) এতদ্দর্শনে খোদার দরবারে আরয করেন, "হে আল্লাহ! যেহেতু আপনি এই শিশুর চাহিদা পূরণ করছেন, সেহেতু অনুগ্রহ করে আমার আর্জিও মঞ্জুর করুন। আমায় এক পুত্র সন্তান দান করুন, যে হবে আপনারই বন্ধু; আমার উৎসাহ প্রদান ছাড়াই যে আপনার সাথে (আপনারই) পথে হাঁটবে, এবং আপনারই তাবেদারীতে থাকবে নিমগ্ন।" (এই দুআ'র পরিপ্রেক্ষিতে) আল্লাহ পাক পয়গম্বর ইয়াহইয়া (আ:)-কে (পয়গম্বর যাকারিয়্যার ঔরসে) পয়দা করেন, যদিও তাঁর বাবা ছিলেন ওই সময় বয়সের ভারে ন্যুব্জ ও দুর্বল, আর তাঁর মা অতিশয় বৃদ্ধা এবং যৌবনকাল হতেই নিঃসন্তান বন্ধ্যা নারী। তথাপিও তিনি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে সন্তান জন্ম দেন।

তোমরা কি দেখো না এসব বিষয় আর কিছু নয়, আল্লাহতা'লারই অসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশের একটি উপলক্ষ মাত্র? সব কিছুই তাঁর কাছ থেকে আগত এবং তাঁর (চূড়ান্ত) ইচ্ছাই (সর্বদা) পূর্ণ হবে। ঈমানদার ব্যক্তি জানেন এই দেয়ালের পেছনে সেই মহান সত্তা বিরাজমান, যিনি আমাদের জীবনের এক-এক করে সব বিষয়েই অবগত, আর যিনি আমাদের দেখছেন যদিও আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু যেসব লোক বলে, "না, এটি একটি কাহিনি," তারা (কখনো) বিশ্বাস করতে পারবে না। এমন এক দিন আসবে যখন তারা তাদের ভ্রান্তি বুঝতে পারবে।

ধরো তুমি 'রবাব' (মধ্যযুগে প্রচলিত তিন তারের ছড়বিশিষ্ট বাজনা) বাজাচ্ছো। এমন কী তুমি যদি কাউকে না-ও দেখতে পাও, কিন্তু জানো যে এই দেয়ালের পেছনে মানুষেরা তা শুনছেন, তাহলে তুমি ওই বাজনা বাজাতেই থাকবে ; কেননা তুমি যে রবাব-বাদক। বস্তুতঃ নামায-দুআ'র উদ্দেশ্য সারা দিনমান স্রেফ ক্বেয়াম (দাঁড়ানো), রূকূ (নত) ও সেজদা (প্রণিপাত) নয়, কেননা (খোদার সাথে) আত্মিক মিলনের ওই মুহূর্তগুলো



যা তোমাদের মনকে নামায-দুআ'কালে আচ্ছন্ন করে রাখে, তা সব সময়ই তোমাদের সাথে থাকা উচিত। নিদ্রাগত কিংবা জাগ্রত অবস্থায়, লেখা বা পড়ার সময়, যে কোনো মুহূর্তে তোমাদের উচিত নয় আল্লাহর যিকর (স্মরণ) হতে দূরে অবস্থান করা।

কথা বলা ও নিশ্চুপ থাকা, খাওয়া ও ঘুমোনো, রাগ ও ক্ষমাশীল হওয়া, এসব গুণ একটি জল-কল তথা জলচক্রের ঘূর্ণনের মতো হওয়া উচিত। অবশ্যই ওই কল পানির কারণে আবর্তমান, আর সেটি তা জানে, কেননা সেটি পানি ছাড়াও নড়তে চেষ্টা করেছিল। যে কল ধারণা করে যে তার ঘূর্ণনের উৎস সে নিজেই, সে বাস্তবিকই নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার (চূড়ান্ত) প্রতীক।

এই ঘূরপাক একটি সরু জায়গার মধ্যে সংঘটিত হয়, কেননা এটি এই বস্তুগত জগতেরই প্রকৃতি। তাই খোদাতা'লার কাছে তোমরা আরয করো, "হে আল্লাহ, আমাকে এমন একটি (রাস্তার বাঁক/মোড়) ঘুরতে দিন যেটি আধ্যাত্মিক, কেননা সকল চাহিদা-ই আপনার দ্বারা পূরণ হয়ে থাকে।" এভাবে তোমাদের অভাব ও চাহিদা তাঁর সামনে অবিরত পেশ করতে থাকো, আর কখনোই তাঁর যিকর হতে বিস্মৃত হবে না, যেহেতু আল্লাহর যিকর হচ্ছে আত্মার পাখির শক্তি, পালক ও ডানা।

আল্লাহতা'লার যিকরের মাধ্যমে অল্প অল্প করে অন্তঃস্থ হৃদয় আলোকিত হয় এবং বাহ্যিক জগৎ হতেও বিচ্ছিন্ন হয়। কোনো পাখি যেমন আকাশ-চূড়ায় উড়ার চেষ্টা করে, যদিও কখনো অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে না, তবুও সেটি প্রতিটি মুহূর্তে পৃথিবী হতে সুদূরে উড্ডীন হয় এবং অন্যান্য পাখিকে ছাড়িয়ে উঁচুতে ওঠে। কিংবা ধরা যাক, কিছু কস্তুরি একটি বয়ামে আছে। কিন্তু ওই বয়ামের মুখ সরু হওয়ায় ভেতরে হাত ঢুকিয়েও তোমরা কস্তুরি তুলতে অপারগ। তবুও তোমাদের হাত সুগন্ধে ভরপুর হয়ে যায় এবং তোমাদের নাক-ও তা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। ঠিক একই অবস্থা আল্লাহর যিকরের বেলায়ও; যদিও তোমরা এই মুহূর্তে আল্লাহর সত্তা মোবারককে (মানে তাঁর সান্নিধ্য) না পাও, তথাপিও এর ছাপ তোমাদের ওপর পড়ে, আর এরই ফলে তোমরা সেসব মহা ফায়দা লাভ করো যা ওই ছাপের সাথে সংশ্লিষ্ট/সম্পৃক্ত।

## উপদেশ বাণী - ৪৬

শায়খ ইবরাহীম একজন মহান দরবেশ। আমরা যখনই তাঁকে দেখি, তৎক্ষণাৎ আমাদের প্রিয় বন্ধুদের কথা স্মরণ হয়ে যায়। আমাদের পীর ও মোর্শেদ হযরত শামস (তাবরেয) রহমতুল্লাহে আলাইহে সব সময় তাঁকে আদর করে সম্বোধন করতেন 'আমাদের শায়খ ইবরাহীম।'

খোদায়ী দান এক জিনিস, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা/সাধনা আরেক। পয়গম্বর (আ:)-বৃন্দ তাঁদের নুবুওয়্যত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অর্জন করেননি; তাঁরা ওই নেআমত ঐশী করুণা দ্বারা অর্জন করেছেন। তবুও খোদাতা'লা তাঁদেরকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা/সাধনা ও পুণ্যময়/নেককার জীবন যাপন করতে দেখতে চেয়েছেন। এটি ছিল সাধারণ মানুষের ওয়াস্তে বা খাতিরে, যাতে তারা আম্বিয়া (আ:)-বৃন্দের ও তাঁদের কথার ওপর নির্ভর করতে পারেন, আস্থা রাখতে পারেন। সাধারণ মানুষের চাহনি অন্তরের অন্তস্তল ভেদ করতে অপারগ; তারা শুধু বাহ্যিক আবরণটুকুই দেখতে পান। তথাপি ওইসব বাহ্যিক আবরণকে অনুসরণ করে, (পয়গম্বরবৃন্দের) ওই সকল (বাহ্যিক) আকার-আকৃতির প্রতি বর্ষিত খোদায়ী আশীর্বাদের মাধ্যমে মানুষেরা অভ্যন্তর তথা আত্মিক/আধ্যাত্মিক রাস্তা প্রাপ্ত হন।

এমন কী ফেরাউন-ও দান-সদকাহ এবং মহৎ কাজের ব্যক্তিগত প্রয়াস পেয়েছিল। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ অনুপস্থিত ছিল, সেহেতু তার উদারতা ও বদান্যতা আড়ালেই থেকে যায়। কোনো দুর্গ রক্ষার দায়িত্বরত সামরিক অধিপতির মতো, যিনি তার জাতির প্রতি দয়াশীল ও উদার হওয়া সত্ত্বেও তার পরিকল্পনায় মহারাজের (মানে খোদাতা'লার) প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করেন এবং বিদ্রোহী হন, তার সমস্ত দয়া-মায়াই মূল্যহীন ও জৌলুসবিহীন হয়ে পড়ে।

এ সত্ত্বেও ফেরাউনের প্রতি আল্লাহতা'লার কৃপা আমাদের পক্ষে পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করা উচিত নয়। খোদার অনুগ্রহ হয়তো গোপন হতে পারে, যার কারণে ফেরাউনকে কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে প্রত্যাখ্যান করা হয়। কেননা কোনো মহারাজ একই সাথে বদলা নেয়ার অভিপ্রায় ও করুণা উভয়-ই অন্তরে লালন করেন। তিনি মহাসম্মানের আলখেল্লা যেমন মঞ্জুর করেন, তেমনি কয়েদখানার শাস্তিও পাশাপাশি আরোপ করেন।



সূফী/দরবেশবৃন্দ তাই ফেরাউনের প্রতি আল্লাহতা'লার অনুগ্রহকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন না। আক্ষরিক অর্থগ্রহণকারীরা অবশ্য ফেরাউনকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যাত বলে বিবেচনা করেন, আর এটি (ইসলামের) যাহেরী তথা বাহ্যিক শিক্ষার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের খাতিরে ভালো এক ব্যবস্থা।

কোনো বাদশাহ যখন কাউকে ফাঁসিকাষ্ঠে পাঠান, তিনি তখন তাকে সমবেত মানুষের উপস্থিতিতে উঁচু এক স্থানে ঝুলান। তিনি ঘরের ভেতরে সবার চোখের আড়ালে নিচু একটি পেরেকের সাহায্যেও তাকে ফাঁসি দিতে পারতেন, কিন্তু মানুষের জন্যে তা দেখা এবং সতর্ক হওয়া জরুরি। বাদশাহের আদেশ কার্যকর ও বলবৎ দৃশ্যমান হওয়া চাই। তবে প্রতিটি ফাঁসিকাষ্ঠ তো কাঠের (নির্মিত) নয়। উচ্চ-পদবী ও পার্থিব ধন-দৌলতও এক ধরনের ফাঁসিকাষ্ঠ, আর তা অত্যন্ত উঁচু-ও।

আল্লাহতা'লা যখন কাউকে শাস্তি দিতে চান, তখন তিনি তাদের প্রতি দুনিয়ার উচ্চ-পদবী ও সাম্রাজ্য মঞ্জুর করেন, ঠিক যেমনটি করেছিলেন ফেরাউন, নমরুদ ও বাকি সবার ক্ষেত্রে। ওইসব উঁচু পদ হলো ফাঁসিকাষ্ঠের মতো, যেখান থেকে আল্লাহতা'লা লোকদেরকে ঝুলিয়ে থাকেন অন্যদের তা দেখার ও বোঝার খাতিরে।

কেননা আল্লাহতা'লা এরশাদ করেন, "আমি ছিলাম রহস্যের গুপ্তভাণ্ডার, অতঃপর নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করলাম।" এর অর্থ হলো, "আমি সমগ্র বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছি আমারই হাক্কীকৃত (তথা বাস্তবতা) প্রকাশের জন্যে, কখনো করুণার মাধ্যমে, আবার কখনো বা কঠোরতা দ্বারা।" খোদাতা'লা এমন ধরনের বাদশাহ নন যাঁর জন্যে একটি কণ্ঠস্বরই যথেষ্ট। দুনিয়ার প্রতিটি অণুকণাও যদি আল্লাহর ঘোষক হতো, তবুও তারা তাঁরই হাক্কীকৃত তথা সত্যতা/বাস্তবতা যথাযথভাবে ঘোষণা করতে অক্ষম হতো।

অতএব, মানুষেরা দিন-রাত নিরন্তর আল্লাহতা'লাকে প্রকাশ করে চলেছেন, কেউ বুঝে, আবার কেউ বা না বুঝে। উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহর ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ নিশ্চিত। উদাহরণস্বরূপ, কোনো যুবরাজ কাউকে প্রহারের নির্দেশ দিয়েছেন, আর ওই ব্যক্তি ব্যথায় চিৎকার করছেন। অথচ

(সেখানে উপস্থিত) প্রত্যেকেই দেখতে পাচ্ছেন প্রহারকারী ও প্রহৃত দু জনই যুবরাজের কর্তৃত্বের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছু নন।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্বীকার করেন, তিনি অবিরত আল্লাহকেই প্রকাশ করে চলেছেন, আর যে ব্যক্তি তাঁকে অস্বীকার করেন, তিনিও আল্লাহকে প্রকাশ করে চলেছেন। একটি বিষয় বা বস্তু কীভাবে প্রদর্শিত/প্রকাশিত হতে পারে ওর বিপরীত বা প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যতিরেকে? তাছাড়া, এটি (মানে বৈপরীত্য ব্যতিরেকে) একেবারেই নিরানন্দ ও বিষাদময় হবে। তাই কেউ বিতর্ক পছন্দ করলে কোনো সভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে থাকেন; কিন্তু তাতে কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত বা যুক্তি উপস্থাপিত না হলে তিনি এর জবাবে কী-ই বা বলতে পারেন? আর ওর মধ্যে কী-ই বা মজা থাকতে পারে? কেননা, কোনো ঘোষণা তখন-ই কেবল অর্থবহ হয়, যখন সেটি নিজেই নাকচের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে, এই বিশ্বজগৎ খোদাতা'লার (অস্তিত্বের) একটি ঘোষণা বটে। কোনো প্রস্তাবকারী ও সেটির বিরোধিতাকারী ছাড়া এই ঘোষণাটি বিবর্ণ ও নিষ্প্রাণ প্রতীয়মান হবে।

"ঈমানদারবৃন্দ যেনো একখানি আত্মার মতো।" [সরাসরি অনুবাদ]

সূফী-দরবেশমণ্ডলী যেনো একটি শরীরেই গ্রন্থিত। তাঁদের মধ্যে কেউ ব্যথিত হলে বাকি সবাই পীড়িত হন। চোখ ত্যাগ করে দৃষ্টিশক্তি, কান তার শ্রবণশক্তি, জিহ্বা তার বাকশক্তি - এগুলোর সবই ওই এক দেহে মিলিত হয়। প্রকৃত বন্ধুত্ব হচ্ছে আপন বন্ধুর জন্যে আত্মোৎসর্গ করা; আমাদেরই বন্ধুর খাতিরে বিপদে ঝাঁপ দেয়া। কেননা সবাই এক ও অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে অগ্রসরমান; সবাই এক ও অভিন্ন সাগরে নিমজ্জিত। এটি-ই ঈমানদারির প্রভাব, খোদাতা'লার প্রতি সমর্পিত হওয়ার ফলাফল। সূফী/দরবেশবৃন্দ নিজেদের আত্মা দ্বারা যে বোঝা বহন করেন, তার তুলনায় তাঁদের শরীর দ্বারা বহনকৃত বোঝার মূল্য-ই বা কতোখানি?

একবার কোনো ঈমানদার আল্লাহ পাকের প্রতি সমর্পিত হলে তিনি কেন পীড়া ও বিপদ, হাত ও পায়ের দিকে মনোযোগ দেবেন? ঈমানদার-বৃন্দের যাত্রা যদি হয় খোদার দিকে, তাহলে তাঁদের হাত-পায়ের কী প্রয়োজন? আল্লাহতা'লা তোমাদেরকে হাত-পা দিয়েছেন এই পৃথিবীতে ভ্রমণের জন্যে। কিন্তু যিনি হাত-পায়ের স্রষ্টা, তাঁর দিকেই যখন সফর, তখন



তোমরা আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেই বা কী এসে যায়? কিংবা ফেরাউনের জাদুকরদের মতো পেটের ওপর ভর দিয়ে মাটিতে হামাগুড়ি দিলেই বা কী পার্থক্য হয়? সেটি আবার দুঃখের কী কারণ হতে পারে?

"চুমুকের জন্যে বিষ উত্তম,
যবে পেয়ালা পূর্ণ করে প্রিয় সুন্দরীতম,
শুনতে মধুর হয় তিক্ত কথা,
যবে অতি প্রিয় হয় ওর বক্তা।
আনন্দপূর্ণ আমার প্রেম,
নিয়ে আমার জ্ঞাত বুদ্ধি - নরম,
এর তীক্ষ্ণতা অতি অভিরাম,
যবে ঘর্ষিত হয় আহত হৃদয়ে মম,
আর এটি খোদা-ই জানেন সর্বোত্তম।" [ভাবানুবাদ]

## উপদেশ বাণী - ৪৭

খোদাতা'লা ভালো ও মন্দ উভয়ই এরাদা (ইচ্ছে) করেন, কিন্তু তিনি শুধু ভালোকেই আশীর্বাদধন্য করেন। তাঁর ঐশী বিধান আদেশ ও নিষেধ দুটোই জারি করে, কিন্তু আজ্ঞা স্রেফ তখন-ই বহাল হয় যখন সেটি প্রকৃতিগত তথা সহজাত কামনা-বাসনার বিরোধী হয়। কেউ যদি বলেন, "ওহে ক্ষুধার্ত জন, মিষ্ট স্বাদের আহার ও চিনি গ্রহণ করো," তাহলে তা কোনো আদেশ নয়, বরং হিতসাধন। নিষেধাজ্ঞা-ও একই উপায়ে বহাল হয়। কেউই একথা বলেন না, "পাথর খেয়ো না, কাঁটা ভক্ষণ কোরো না," কেননা যেখানে কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, সেখানে নিষেধ করারও জরুরাত/প্রয়োজনীয়তা নেই।

অতএব, মন্দের বিরুদ্ধে (ঐশী) আদেশ-নিষেধ উপকারী বা কল্যাণকর হওয়ার জন্যে লোকদেরকে মন্দ কামনা করতে হবে। আর (এরকম) মন্দের আকাঙ্ক্ষী লোকদের অস্তিত্বের এরাদা তথা ইচ্ছে করার মানে মন্দকে এরাদা করা। কিন্তু খোদাতা'লা মন্দকে অনুমোদন করেন না, নতুবা তিনি ভালো/হিতের আজ্ঞা করতেন না। এটি অনেকটি শিক্ষকতা করেন এমন ব্যক্তিদের মতো; তাঁরা আশা করেন যেনো তাঁদের শিক্ষার্থীরা

অজ্ঞ হয়। কেননা তাঁদের শিক্ষার্থীদের শেখার প্রয়োজন না থাকলে তাঁরা শিক্ষাদান করতে পারেন না। কোনো জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা হলো ওই জিনিসের প্রয়োজনীয়তার প্রতি আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু কোনো শিক্ষক-ই তাঁর শিক্ষার্থীদের মূর্খতাকে অনুমোদন করেন না; নয়তো কেনই বা তাঁরা শিক্ষাদান করবেন?

একই অবস্থা ডাক্তারদের বেলায়ও। তাঁরা রোগ-ব্যাধির অস্তিত্ব চান, কেননা মানুষ অসুস্থ না হলে তাঁরা তাঁদের ডাক্তারি দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবেন না। কিন্তু তাঁরা অসুখ-বিসুখকে অনুমোদন করেন না, নতুবা তাঁরা কখনোই রোগের চিকিৎসা করতেন না। অনুরূপভাবে, বেইকার তথা রুটি প্রস্তুতকারীরাও মানুষদেরকে ক্ষুধার্ত দেখতে চান, যাতে তারা তাদের ব্যবসার পসার এবং জীবিকা অর্জন করতে পারেন। কিন্তু তারা খিদেকে অনুমোদন করেন না, নচেৎ তারা তাদের রুটি-ই বিক্রি করতেন না।

এ কারণেই সেনাপতিবৃন্দ ও অশ্বারোহী বাহিনী তাঁদের রাজার বিরোধী কোনো শত্রুর অস্তিত্ব কামনা করেন। নয়তো কীভাবে তাঁরা তাঁদের শৌর্য-বীর্য ও রাজার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করবেন? রাজা মহাশয় তাঁদেরকে কখনো সমবেত/জড়ো-ই করবেন না, যেহেতু এর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। কিন্তু তাঁরা রাজার শত্রুদেরকে অনুমোদন করেন না, নতুবা তাঁরা যুদ্ধ করতেন না। সুতরাং আমাদের অন্তঃস্থ মন্দ কামনা-বাসনাকে আমাদের সম্মান করা উচিত; কেননা আল্লাহতা'লা কৃতজ্ঞদের এবং তাঁর ঐশী বিধান মান্যকারীদের ভালোবাসেন; আর আমাদের মাঝে ওইসব (মন্দ) আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব ছাড়া এর কোনো মানেই হয় না। তথাপি ওই মন্দ প্রবণতাগুলোর প্রতি আমাদের অনুমোদন থাকা উচিত নয়; বরঞ্চ সেগুলোর প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্যে আমাদেরকে কঠিন সাধনায় রত হওয়া উচিত।

অতএব, আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহতা'লা একদিকে মন্দের এরাদা/ইচ্ছে করেন, আবার অন্যদিকে তিনি তা এরাদা করেন না। আমাদের (মানে সূফী/দরবেশবৃন্দের) বিরোধীরা বলেন, "আল্লাহ মন্দ কোনো কিছুই কোনোভাবে এরাদা করেন না।" কিন্তু এটি তো একদম অসম্ভব ব্যাপার। তিনি কীভাবে এমন বস্তু এরাদা করতে পারেন, যেটির প্রতি আকাঙ্ক্ষা-ই এরাদা করেননি? আল্লাহর সৃষ্ট (মন্দ) চাহিদাগুলোর



মধ্যে মানুষের এই একগুঁয়ে প্রকৃতি-ই এধরনের নির্বুদ্ধিতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা রাখে, যেমনটি আমাদের বিরোধীরা বলে (মানে করে) থাকেন; আর এতে তারা মানুষকে সত্য থেকে দূরে সরিয়েও দেন। এরকম লোকদের জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা হচ্ছে এই বস্তুগত জগতে অস্তিত্বশীল যাবতীয় মন্দ বিষয়। খোদাতা'লা কি সেগুলো এরাদা করেননি? তবে তিনি যদি সেগুলো অনুমোদন করতেন, তাহলে তিনি সেগুলোর বিরুদ্ধে (ঐশী) আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা জারি করতেন না। এতে প্রমাণিত হয় যে মন্দকে এরাদা করা হয়েছে আরো বৃহত্তর বা মহত্তর কোনো উদ্দেশ্যের খাতিরেই।

কিন্তু তবু বিরোধীরা বলেন, "খোদা স্রেফ উত্তম বস্তু এরাদা করেন, আর এধরনের ভালো বস্তুর মধ্যে মন্দ পরিহার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অতএব, আল্লাহতা'লা স্রেফ মন্দকে এড়িয়ে চলা কামনা করেন।" কিন্তু মন্দকে এড়ানো তো সম্ভব নয়, যদি তার অস্তিত্ব-ই না থাকে। অথবা বিরোধীরা বলেন, "আল্লাহ শুধু বিশ্বাস/ঈমানদারি এরাদা করেন," কিন্তু বিশ্বাস বা ঈমানদারি অস্তিত্বশীল হতে পারে না, যদি না এর আগে অবিশ্বাস থাকে। অতএব, অবিশ্বাস হলো বিশ্বাসের পূর্বশর্ত। তাই মন্দের ইচ্ছে করা কেবল তখন-ই মন্দ, যখন তা নিজের খাতিরেই ইচ্ছে করা হয়। কিন্তু যখন তা কোনো উত্তম বস্তুর খাতিরে ইচ্ছে করা হয়, তখন তা উত্তম।

আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "বদলাস্বরূপ তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে।" নিশ্চয় বদলা একটি মন্দ, যা খোদার সৃষ্টিকুলের বিরুদ্ধে একটি আঘাত। কিন্তু এটি আংশিক একটি মন্দ, যেখানে ভবিষ্যত হত্যাকাণ্ডের চাহিদা হতে মানুষকে রক্ষা করা একটি সর্বাঙ্গীণ ভালাই। সবার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে আংশিক মন্দ সৃষ্টি করা ভুল নয়, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছেকে আংশিকভাবে ছেড়ে দিয়ে মন্দকে সফল হতে দেয়া অবশ্যই একটি ভ্রান্তি। এটি অনেকটি সেই মায়ের মতো ঘটনা, যিনি শাস্তির মাঝে বিরাজিত আংশিক মন্দের কারণে তার শিশুকে বকা দিতে চান না; কিন্তু বাবা জানেন তাকে শাস্তি দিতেই হবে যাতে ওই মন্দের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ এড়ানো যায়, আর মন্দকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা সম্ভব হয়।

আল্লাহতা'লা হলেন পরম দয়াময়, ক্ষমাশীল ও বদলা নেয়ার বেলায় ভয়ঙ্কর। তিনি কি এসব নাম (মোবারক) তাঁর ক্ষেত্রে সত্য হওয়া উচিত

বলে এরাদা করেছেন? উত্তর অবশ্যই হ্যাঁ হবে, কেননা পাপের অস্তিত্ব ছাড়া তিনি পরম ক্ষমাশীল ও দয়াময় হতে পারেন না। অতএব, তিনি আমাদেরকে ক্ষমাশীল হতে ও (সবার সাথে) শান্তি স্থাপন করতে আদেশ করেন, কিন্তু ক্রোধ ও যুদ্ধের অস্তিত্ব ছাড়া এই আদেশের কোনো অর্থ-ই হয় না।

এটি আমাদের দ্বারা সম্পদ অর্জন ও আহরণের প্রতি সদর আল-ইসলামের আজ্ঞাসূচক বক্তব্যের মতোই, কেননা কুরআন মজীদে বিবৃত হয়েছে, "এবং আল্লাহর রাস্তায় (অর্থ) ব্যয় করো।" যেহেতু কারো কাছে অর্থ না থাকলে তা ব্যয় করা অসম্ভব, সেহেতু এটি অর্থসম্পদ আহরণেরও একটি আজ্ঞা বটে। এটি কারো দ্বারা 'ঘুম থেকে ওঠো এবং নামায পড়ো" কথাগুলো বলে আহ্বান করার মতোই ব্যাপার। অযূ ও নামাযের পূর্ববর্তী সমস্ত রীতিনীতি সেরে নেয়ার বেলায়ও এ আহ্বান প্রযোজ্য।

## উপদেশ বাণী - ৪৮

খোদাতা'লা যাঁদের ভালোবাসেন, তাঁদের তিনি ক্লেশ দেন। তাঁরা তা ধৈর্যসহ সহ্য করলে তিনি তাঁদের পছন্দ করেন। তাঁরা কৃতজ্ঞ হলে তিনি তাঁদের নির্বাচন করেন। কিছু কিছু নারী-পুরুষ খোদাতা'লার ক্রুদ্ধতার জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ, আর কিছু কিছু কৃতজ্ঞ তাঁরই দয়া/অনুগ্রহের প্রতি। দুটোই উত্তম, কেননা কৃতজ্ঞতা সকল উপলক্ষেই রোগের প্রতিষেধক, যা (ঐশী) ক্রোধকে (ঐশী) করুণায় পরিণত করে। জ্ঞানী ও কামেল/মুকাম্মেল (পূর্ণতাপ্রাপ্ত) বান্দা (মহান প্রভুর) কঠোরতার সময়েও সর্বসমক্ষে ও একান্তে কৃতজ্ঞ থাকেন; কেননা কৃতজ্ঞতার কণ্ঠস্বরের সাথে আগমন করে আরো উৎসর্গ করার অনুপ্রেরণা। খোদাতা'লা যদি তাঁদেরকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরেও প্রেরণ করেন, কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে আল্লাহর উদ্দেশ্য-ই বাস্তবায়িত হয়।

বাহ্যিক অভিযোগ হচ্ছে খোদাতা'লার কাছে অন্তরের বিলাপেরই প্রতিফলন। হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি হাসি, যখন হনন করি।" এর অর্থ হলো, "আক্রমণকারীদের মুখের ওপর আমার হাসি তাদের ক্রোধ ও হিংসা-



বিদ্বেষকে হনন করে।" অতএব, এক্ষেত্রে হাসিও নালিশের স্থলে কৃতজ্ঞতা বটে।

বর্ণিত আছে যে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর মধ্যে কোনো একজনের প্রতিবেশী ছিলেন জনৈক ইহুদী। এই ইসরাঈলী একটি ওপরের তলার কক্ষে বসবাস করতেন, যেটি থেকে সব ধরনের ময়লা-আবর্জনা, তাঁর শিশুদের মূত্রত্যাগ, কাপড় ধোয়া পানি ইত্যাদি ওই মুসলমানের নিচের তলার বসতঘরে পড়তো। তবু ওই মুসলমান সর্বদা ইহুদীকে ধন্যবাদ জানাতেন এবং আপন পরিবার-সদস্যদেরও একই কাজ করতে বলতেন। আট বছর এভাবে চলার পর ওই মুসলমান সাহাবী (রা:) ইন্তেক্বাল করেন। এমতাবস্থায় ওই ইসরাঈলী ব্যক্তি পরলোকগত সাহাবী (রা:)-এর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাতে তাঁর ঘরে গেলে সমস্ত ময়লা-আবর্জনা দেখতে পান এবং তা যে তার ওপরের তলা থেকে এসেছে তা-ও বুঝতে পারেন। ওই ইহুদী বিগত বছরগুলোতে যা যা ঘটেছে, তার সবই উপলব্ধি করেন এবং শোকাহত হন। তিনি সাহাবী (রা:)-এর পরিবার-সদস্যদের বলেন, "আপনারা কেন আমায় বলেননি? কেন আমায় সর্বদা ধন্যবাদ দিয়েছেন?" তাঁরা উত্তর দেন, "আমাদের পিতা আমাদের সবসময়-ই কৃতজ্ঞ থাকতে বলতেন, আর আমরা কখনো অকৃতজ্ঞ হলে আমাদেরকে ভর্ৎসনা করতেন।" এ ঘটনায় ওই ইহুদী ঈমানদার হয়ে যান।

"পুণ্যবান নর ও নারীর উদাহরণ,
আত্মিক মহত্ত্বের শোভা করে বর্ধন,
যেমনটি কবির সুরেলা মিলবিশিষ্ট চরণ,
উৎসাহিত করে শরাবের বিতরণ।।" [ভাবানুবাদ]

[বঙ্গানুবাদকের নোট: এখানে 'শরাব' বলতে খোদায়ী ইশক্বের শরাব বোঝানো হয়েছে, মদ্যপান নয়]

এই কারণেই সর্বশক্তিমান ও পরম ক্ষমাশীল আল্লাহতা'লা তাঁর আম্বিয়া (আ:) ও আউলিয়া (রহ:)-বৃন্দকে তাঁর প্রতি তাঁদের খেদমতের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এখন, দুধ পানের জন্যে কৃতজ্ঞতা হচ্ছে একটি আশীর্বাদ, কিন্তু বুকের দুধ পানকারীদের জন্যে কৃতজ্ঞতা একটি খোদায়ী

নেআমত। যদিও বুকের দুধ পূর্ণ, তবু তা পান না করলে প্রবাহিত হবে না।

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) জিজ্ঞেস করেন: "কৃতজ্ঞতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কী জিনিস?"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: অসংযত লোভ-লালসা। কেননা মানুষের যতোই থাক না কেন, লোভ আরো চায়। যেহেতু তাদের অন্তর যে জিনিস চায় তার চেয়ে কম পায়, সেহেতু তারা কৃতজ্ঞ হতে পারে না। কিন্তু মানুষ নিজেদের দোষত্রুটি সম্পর্কে অনবধান; আর তারা দেখতে পায় না সেই খুঁতটিকে, যেটি তাদের কর্ম-প্রয়াসের গায়ে দাগ ফেলে থাকে।

লোভ-লালসা অনেকটুকু কাঁচা মাংস খাওয়ার মতোই; অবধারিতভাবে এটি তোমাদের অসুস্থ করবে। একবার আমরা পচা কিছু খেয়েছি বুঝতে পারলে পেট পরিষ্কার তথা রেচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। খোদাতা'লাও তাঁর জ্ঞান-প্রজ্ঞাবলে আমাদেরকে অকৃতজ্ঞতার মাধ্যমে ভোগান্তি দেন, যাতে ওই দূষিত অহমিকা হতে আমরা মুক্ত হই, আর পাছে ওই একটিমাত্র ব্যাধি এক শটিতে পরিণত না হয়।

"আমি (খোদা) তাদেরকে ভালো ও মন্দ দ্বারা করেছি বিচার,
যাতে তারা ফেরে (আমার দিকে) নিয়ে অন্তর কৃতজ্ঞতার।" [ভাবানুবাদ]

এর মানে হলো, "আমি মানুষের জন্যে এমন সব পন্থায় পরিকল্পনা করে রেখেছি, যা সম্পর্কে তারা জানে না; যেমন তারা যখন আল্লাহতা'লার সাথে আনুষঙ্গিক কারণগুলোকে তাঁরই সহযোগী হিসেবে গণ্য করার বিষয়টিকে অস্বীকার করে।" এ কারণে আবূ এয়াযীদ একবার আরয করেন, "হে প্রভু, আমি কখনোই আপনার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করিনি।" এমতাবস্থায় আল্লাহ তাঁকে বলেন, "ওহে আবূ এয়াযীদ, এমন কী দুধের (মানে দুধ পানের) রাতেও কি নয়? এক রাতে তুমি বলেছিলে 'এই দুধ আমার ক্ষতি করেছে।' অথচ সকল উপকার ও ক্ষতির স্রষ্টা তো হলাম আমি খোদা নিজেই।" আবূ এয়াযীদ আনুষঙ্গিক কারণ/অসীলাগুলোকে খোদা হতে আলাদা করে দেখেছিলেন, আর তাই খোদাতা'লা-ও তাঁকে অনেক কারণে বিশ্বাসী ব্যক্তি হিসেবে দেখিয়েছেন এবং তাঁকে বলেছেন, "আমি-ই তোমার ক্ষতি করেছি - দুধ পানের পরে



এবং আগে। আমি ওই দুধ সৃষ্টি করেছি, যাতে তুমি পাপ সংঘটন করো; আর আমি ওই ক্ষতিকে একটি সংশোধন প্রক্রিয়াস্বরূপ বানিয়েছি যাতে সেটি তোমাকে শিক্ষা দেয় - ঠিক যেমনটি কোনো শিক্ষকের দেয়া শাস্তি।"

কোনো শিক্ষক যখন বলেন, "ফলটি খেয়ো না," তখন যদি শিক্ষার্থীরা তা খায় এবং শিক্ষক তাদের পায়ের পাতায় প্রহার করেন, এমতাবস্থায় শিক্ষার্থীদের এ কথা বলা উচিত হবে না, "আমরা ফলটি খেয়েছি আর এটি আমাদের পায়ে ব্যথা দিয়েছে।" একইভাবে, যে ব্যক্তি একথা অস্বীকার করে যে সকল বস্তু আল্লাহরই সহযোগী (মানে তাঁর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশে সহায়ক), আল্লাহ পাক-ও তার আত্মাকে অনেক কারণে বিশ্বাসের আগাছা থেকে পরিশুদ্ধ করতে অকৃতজ্ঞতার ব্যবহার করে থাকেন। খোদার তরফ থেকে সামান্য দান (বান্দার জন্যে) অনেক।

প্রশংসা করা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাঝে পার্থক্য হলো, ধন্যবাদ আমাদের প্রাপ্ত উপকারের সূত্রে প্রদত্ত হয়। কেউই এ কথা বলেন না, "ওই ব্যক্তির সৌন্দর্য ও সাহসিকতার জন্যে আমি ধন্যবাদ জানাই।" প্রশংসা করা কম ব্যক্তিগত একটি বিষয়।

## উপদেশ বাণী - ৪৯

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: এক ব্যক্তি জামাআতে ইমামতি করছিলো এবং সে কুরআন মজীদ হতে তেলাওয়াত করছিলো, "বেদুঈনবর্গ অবিশ্বাস ও কপটতায় একগুঁয়ে।" ঘটনাচক্রে ওই জামাআতে এক বেদুঈন সরদার উপস্থিত ছিলেন। তিনি ক্বারীর কানে কষে মারেন এক চড়। অতঃপর দ্বিতীয় রাকআতে ওই ইমাম কুরআন মজীদ হতে ভিন্ন এক আয়াত পাঠ করে যা ব্যক্ত করে, "কিছু বেদুঈন আল্লাহ ও শেষ বিচার দিবসে বিশ্বাস করে।" ওই বেদুঈন সরদার তখন চড়া গলায় বলেন, "বেশ! ওই থাপ্পড় তোমাকে আরো ভদ্র আচরণ শিখিয়েছে!"

প্রতিটি মুহূর্তে আমরা অদৃশ্য জগৎ হতে চপেটাঘাত প্রাপ্ত হই। আমাদের পরিকল্পনা যা-ই হোক না কেন, একটি চড় খেলেই আমরা আরেক রাস্তা ধরি। প্রবাদ আছে - "আমাদের নেই নিজস্ব কোনো ক্ষমতা, স্রেফ

গ্রাসকরণ ও বমন প্রথা।" 'গ্রাসকরণ' অর্থ নিচের জগতে (ধরণীতলে) নেমে আসা এবং এর অংশে পরিণত হওয়া। আর 'বমন' মানে অন্তর হতে মিথ্যেকে বের করে দেয়া। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ আহার গ্রহণ করার পর পেটের পীড়ায় পীড়িত হলে বমি করে। ওই বিষ বের না করলে তা তাদেরই অংশ হয়ে যেতো।

মুরীদ তার শায়খের (পীর ও মুর্শীদের) অন্তরে স্থান পাওয়ার জন্যে নাচে এবং (তাঁর) খেদমত করে থাকে। শায়খের অপছন্দনীয় মুরীদের যে কোনো কাজ তাঁর (শায়খের) অন্তর থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়, ঠিক যেমনিভাবে আমরা খাদ্য গ্রহণ করার পর বমি করি। বাজে খাবার আমরা প্রত্যাখ্যান না করলে তা যেমন আমাদের অংশ হয়ে যায়, তেমনি ওই মুরীদের মন্দ আচরণও সময়ের সাথে সাথে শায়খের একটি অংশ হয়ে যায়, যদি না শায়খ তাদের (মুরীদানের) অন্তর থেকে ওই ধরনের কর্মকাণ্ড ছুঁড়ে ফেলে দেন।

"খোদাতা'লার প্রেম জগতে হয়েছে ঘোষিত,
আর প্রতিটি অন্তরকেই বিশৃঙ্খলায় করা হয়েছে নিক্ষিপ্ত,
ওই অন্তরগুলোকে জ্বালিয়ে করা হয়েছে ভস্মিভূত,
অতঃপর তাদের ছাইকে উদাসীন হাওয়া করেছে পদদলিত।"

ওই উদাসীন হাওয়ায় ওসব অন্তরের অণুকণা নাচছে এবং গাইছে। তারা তা না করলে আমরা তাদের গান শুনতে পাচ্ছি কীভাবে? আর কে-ই বা প্রতিটি ক্ষণে তাদের কাহিনি আবার নতুন করে আমাদের শোনাচ্ছে? অধিকন্তু, এসব অন্তর যদি একথা বুঝতেই না পারে যে খোদ তাদের জীবন কাহিনিটি জ্বলে পুড়ে ছাই হওয়া এবং হাওয়া কর্তৃক পদদলিত হওয়া ছাড়া কিছু নয়, তাহলে তারা জ্বলে পুড়ে ছাই হওয়ার জন্যে এতো আগ্রহী কেন? পক্ষান্তরে, দুনিয়ার কামাগ্নিতে ভস্মিভূত অন্তরগুলো হতে তোমরা কি কোনো আওয়াজ শুনতে পাও? অথবা কোনো দ্যুতি ছড়াতে দেখো?

কবি উরওয়া ইবনে আযিনা লেখেন, "আমি জানি খোদাতা'লা আমাদের দৈনন্দিন রুটির সংস্থান করেন। তাহলে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করে কী ফায়দা? বাস্তবিকই, আমি যখন অর্থ-কড়ি, খাদ্য-বস্ত্র ও কামনা-বাসনার কথা ভুলে যাই, তখন আমার দৈনিক (বরাদ্দকৃত) অংশ



আমার কাছে আসে। কিন্ত যখন আমি ওইসব আকাঙ্ক্ষার পেছনে ছুটি, তখন সেগুলো কেবল আমার জন্যে বেদনা বহন করে আনে এবং আমাকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করে। আমার জায়গা যেখানে, সেখানে ধৈর্যসহ আমি বসে থাকলে আমার চাহিদাগুলো দুঃখকষ্ট ও মর্মপীড়া ছাড়াই পূরণ হয়। কেননা, সত্যিসত্যি আমার দৈনিক জোগান-ও আমাকে খুঁজে বেড়ায় এবং (তার দিকে) আমায় টানে। আমায় যখন সেটি টানতে পারে না, তখন নিজেই আমার কাছে চলে আসে, ঠিক যেমনটি আমি যখন সেটিকে আকর্ষণ করতে পারি না, তখন সেটির কাছে যাই।"

এসব কথার মর্মার্থ হলো: (ভবিষ্যতে) আগমনকারী জগতের (মানে আখেরাতের) প্রতি নিবিষ্ট হও, যাতে ওই (পরবর্তী) জগৎ তোমার পিছু নেয়। 'বসে থাকার' মানে হলো, এই দুনিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরবর্তী জগতের বিষয়াবলীতে নিবিষ্ট হওয়া। যাঁরা অপর জগতের খাতিরে ছুটেন, তাঁরা প্রকৃতই উপবিষ্ট হয়েছেন। আর তারা যদি বর্তমান এই জগতের খাতিরে উপবিষ্ট হন, তাহলে তারা দৌড়োচ্ছেন। মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান: "কেউ তার সকল ভাবনাকে একটিমাত্র ভাবনায় সীমাবদ্ধ করতে পারলে আল্লাহতা'লাও তার সকল চাহিদা পূরণ করে দেন।" কেউ যদি দশটি চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে তাকে শুধু অপর জগতের স্রেফ ওই ভাবনাটি নিয়ে ব্যাপৃত হতে বলো; (দেখবে) খোদাতা'লা কোনো আয়াস ছাড়াই বাকি নয়টির জট খুলে দিয়েছেন।

পয়গম্বর (আ:)-বৃন্দ প্রসিদ্ধি ও প্রাত্যহিক রুটির কথা চিন্তা করেননি। তাঁদের একমাত্র ভাবনা ছিলো আল্লাহতা'লার রেযামন্দি হাসিল, তাঁরই অনুমোদন লাভ; অথচ এ সত্ত্বেও তাঁরা প্রাত্যহিক রুটি ও সুখ্যাতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যে ব্যক্তি খোদার রেযামন্দি তালাশ করেন, তিনি আম্বিয়া (আ:)-বৃন্দের চাদরের নিচে (মানে ছায়াতলে) অবস্থান করতে সক্ষম হন - ইহ ও পরকাল উভয় জগতেই তা লাভ করেন।

"তাঁরা সঙ্গ লাভ করেন সেই পুণ্যাত্মাদের যাঁরা খোদার আশীর্বাদধন্য,
আম্বিয়া, সঠিক রাস্তাপ্রাপ্ত আউলিয়া ও বেহেশ্‌ত যেসব অতিথির জন্য।"
[ভাবানুবাদ]

'আমি তাদের সাথে উপবেশন করি যারা আমাকে স্মরণ করেন।' যদি খোদাতা'লা তাঁদের সাথে না বসতেন, তাহলে খোদাতা'লাকে চাওয়া

তাঁদের অন্তরে প্রবিষ্ট হতো না। গোলাপের খুশবুর অস্তিত্ব গোলাপ ছাড়া বিরাজ করতে পারে না। কস্তুরীর সুগন্ধের অস্তিত্ব-ও কস্তুরী ছাড়া বিরাজ করতে পারে না।

এসব কথার কোনো অন্ত নেই। এগুলো নিঃশেষিত হলেও অন্যান্য কথার মতো এগুলো নয়।

"হে বন্ধু, রাত ফুরিয়ে হয়েছে ভোর,
তবু যে কাহিনি শেষ হয়নি মোর।" [ভাবানুবাদ]

এই জগতের রাত্রি ও অন্ধকার দূর হয়ে যায় যবে এসব কথার জ্যোতি স্পষ্টতর হয়ে ফুটে ওঠে। যদিও এখন পয়গম্বর (আ:)-বৃন্দের হায়াতে জিন্দেগীর রাত নেমেছে (মানে বেসাল শরীফ হয়েছে), তবুও তাঁদের বাণী তিরোহিত হয়নি, নিঃশেষিত-ও হয়নি - আর তা কখনো হবেও না।

মানুষেরা মজনূন সম্পর্কে বলতেন, "তিনি লায়লাকে ভালোবাসেন, এতে আশ্চর্যের কী আছে? তাঁরা তো এক সাথে শিশু ছিলেন এবং একই বিদ্যালয়ে পড়তে যেতেন।" মজনূন বলেন, "তাঁরা নির্বোধ। কোন্ সুন্দরী নারী কাঙ্ক্ষিত নন?"

এমন কোনো পুরুষ কি আছেন যাঁর হৃদয় কোনো সুন্দরী রমনীর দ্বারা আন্দোলিত হয় না? আমাদের অন্তরকে ভালোবাসা খোরাক যোগায়, ঠিক যেমনটি মা-বাবা ও ভাই-বোনকে দেখার খুশি, শিশুদের সান্নিধ্যের সুখ, কামভাবের আনন্দ - এসব কিসিমের আনন্দের শেকড় ভালোবাসার মাঝেই প্রোথিত। মজনূন ছিলেন সকল প্রেমিকের এক (উজ্জ্বল) নমুনা, যেমনটি ব্যাকরণে অন্যান্য বাক্য উদ্ধৃত।

"মিষ্টি বা রোস্টের ভোজনে হও মত্ত,
সবচে পছন্দের শরাব পানে নও নিবৃত্ত,
তোমার ঠোঁটে কিসের স্বাদ ওই?
স্বপ্নাবিষ্টের চুমুক দেয়া পানীয় নিশ্চয়ই!
কিন্তু কাল যবে নিদ্রা হতে হবে জাগ্রত,
মহা তেষ্টায় প্রাণ হবে ওষ্ঠাগত,
সামান্যই ফায়দা দেবে ওই তীব্র খরা,
যা তুমি অর্জন করেছো নিতে ওই নিদ্রা।" [ভাবানুবাদ]



এই জগতের আনন্দ-ফুর্তি ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষের খাদ্য গ্রহণের মতোই। তারা দুনিয়াবী চাহিদা মেটাতে ছুটে এমনভাবে যেনো তারা স্বপ্নে কোনো কিছুর তালাশে রয়েছে। তারা তা খুঁজে পেলেও যখন জাগ্রত হবে, তখন তা কী ফায়দা-ই বা বয়ে আনবে, যদি তারা নিদ্রাকালীন সময়ে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে? তথাপিও তারা ঘুমে থাকা অবস্থায় যা কিছুর জন্যে আরয করে, তা তাদের মঞ্জুর করা হয়। কেননা, "মঞ্জুরি বরাদ্দ হয় আর্জি অনুপাতে।"

## উপদেশ বাণী - ৫০

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) বলেন: "আমরা মানবের অবস্থার সকল দিক এক এক করে অধ্যয়ন বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, আর এক্ষেত্রে মানব প্রকৃতির বা মানুষের নরম ও গরম মেজাজের এক চুল পরিমাণও আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তবু আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি মানবের কোন্ বৈশিষ্ট্যটুকু মৃত্যুকে জয় করে টিকে থাকে।"

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: এই জ্ঞান যদি স্রেফ অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করে শেখা যেতো, তাহলে এই সাধনা ও চেষ্টার কোনো প্রয়োজন-ই পড়তো না; আর এটি জানার জন্যে কেউ-ই নিজেকে এতো কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের মুখোমুখি করতো না। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ সমুদ্রে গমন করে, কিন্তু নোনা পানি, হাঙর ও বিভিন্ন মাছ ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না। তারা শুধায়, "অন্যরা যে মুক্তোর কথা বলাবলি করে তা কোথায়? হয়তো মুক্তো বলতে কিছুই নেই।" আহা, স্রেফ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মুক্তো কীভাবে পাওয়া যেতে পারে? এমন কী যদি তারা এক কাপ এক কাপ করে সারা সমুদ্রের পানিকে এক লক্ষবার মাপতেও চেষ্টা করে, তথাপিও মুক্তো খুঁজে পাবে না। ওই মুক্তো খুঁজতে প্রয়োজন একজন ডুবুরির, আর তাও আবার সাধারণ কোনো ডুবুরি নয়, বরং এমন এক ডুবুরি যিনি সৌভাগ্যবান (নেআমতপ্রাপ্ত/আশীর্বাদধন্য) ও কর্মতৎপর।

মনুষ্যকুলের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলা মহাসাগরের জলকে একটি কাপের দ্বারা মাপার মতোই হাতিয়ার। মুক্তোটি পাওয়ার জন্যে ভিন্ন কিছুর প্রয়োজন। এমন অনেক মানুষ আছে যারা প্রতিটি দক্ষতার, বা প্রদর্শনের মতো

সম্পদ-সম্পত্তির ও সুন্দর চেহারার আশীর্বাদ দ্বারা ধন্য, অথচ এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ গুণটি-ই তাদের নেই। আবার অন্য এমন মানুষও আছেন যাঁরা বাহ্যিকভাবে দেখতে বিধ্বস্ত, যাঁদের নেই কোনো সুন্দর চেহারা বা চমৎকার বাচনভঙ্গি, অথচ তাঁদের মাঝেই বিরাজমান ওই অবিনশ্বর উপাদান বা বৈশিষ্ট্য। ওই উপাদানটি দ্বারাই আমাদেরকে উচ্চমর্যাদায় আসীন ও সম্মানিত করা হয়েছে, আর অন্যান্য সকল সৃষ্টির মাঝে করা হয়েছে সেরা। চিতা বাঘ, কুমির ও সিংহের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দক্ষতা ও সামর্থ্য বিদ্যমান, কিন্তু এসব বৈশিষ্ট্য বা গুণ টেকে না। মানুষ যখন অপরিহার্য উপাদানটি খুঁজে পান, তখন তাঁরা নিজেদের চিরস্থায়ী বাস্তবতার গোপন রহস্য সম্পর্কে জানতে সক্ষম হন।

মানবজাতির যাবতীয় অর্জন কোনো আয়নার পেছনে অবস্থিত মণি-মাণিক্যের মতোই। দর্পণের মুখমণ্ডলে কিন্তু কোনো রত্ন নেই; উপরন্তু এটির হওয়া চাই একদম স্বচ্ছ। যার চেহারা কদাকার, সে আগ্রহভরে (ওর পেছনে অবস্থিত) হীরে-জহরত খোঁজে থাকে; কেননা আরশির স্বচ্ছ কাঁচে প্রতিটি আঁধারের গুপ্ত রহস্য ভেসে ওঠে।

পয়গম্বর ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম)-এর জনৈক বন্ধু কোনো এক দূরের যাত্রা হতে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি আমার জন্যে কী উপহার এনেছো?" ওই বন্ধু উত্তরে বলেন, "এমন কী আছে যা আপনার মালিকানাধীন নয়? আপনার কী জিনিসের প্রয়োজন হতে পারে? যেহেতু আপনার চেয়ে সুন্দর আর কেউই নেই, সেহেতু আমি একটি আয়না এনেছি যাতে আপনি প্রতিটি মুহূর্তে আপনার চেহারা মোবারকের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারেন।"

আল্লাহতা'লার মালিকানাধীন নয় এমন কী জিনিস আছে? তাঁর কী জিনিসের প্রয়োজন? অতএব, তাঁর সামনে একেবারে স্বচ্ছ একটি অন্তর নিয়ে এসো, যাতে তিনি তাঁরই আপন পূর্ণতা তাতে দর্শন করতে পারেন। "আল্লাহতা'লা তোমাদের চেহারা/আকার-আকৃতি দেখেন না, কর্ম-ও দেখেন না, বরঞ্চ তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর"। [আয়াতে করীমার সরাসরি অনুবাদ]

তোমরা এমন একটি শহর খুঁজে পেলে যেখানে তোমাদের কাঙ্ক্ষিত সব কিছুই বিরাজমান - সুন্দর চেহারার মানুষ, আনন্দ-ফুর্তি, মানুষেরই ইপ্সিত



যাবতীয় বস্তু এবং সকল ধরনের গহনা/অলঙ্কার; কিন্তু (আফসোস) কোনো মহৎ মানুষের দেখা তোমরা সেখানে পেলে না। এর বদলে বিপরীতটুকু হওয়াই বরং ভালো ছিলো!

ওই শহর হলো খোদ মানুষ। আমাদের মাঝে যদি থাকে এক সহস্রটি প্রতিভা, অথচ না থাকে ওই অত্যাবশ্যক গুণগত উপাদান বা বৈশিষ্ট্য, তাহলে ওই শহরটি ধ্বংসাবশেষ হওয়াই শ্রেয়তর হবে। কিন্তু যখন ওই অতীব গুরুত্বপূর্ণ গুণগত বৈশিষ্ট্য বিরাজমান থাকে, তখন বাহ্যিক আবরণ কোনো ব্যাপার নয়; এমতাবস্থায় আমাদের গোপন অন্তর সুসজ্জিত হবে। প্রতিটি অবস্থাতেই আমাদের অন্তর খোদাতা'লার সাথে একাত্ম, আর আমাদের বাহ্যিক কর্ম আমাদেরই অভ্যন্তরীণ তথা আত্মিক প্রবৃত্তিকে বাধাগ্রস্ত করে না। একইভাবে, কোনো গর্ভবতী মা যদি থাকেন শান্তিতে বা যুদ্ধাবস্থায়, নিদ্রিত বা আহার গ্রহণরত অবস্থায়, তার গর্ভস্থ সন্তান তবুও পুষ্টি পেতে থাকে এবং বেড়ে ওঠে। মানুষ-ও ওই একই গোপন রহস্য ধারণ করে থাকে।

"আমি (খোদা) ওই আস্থার ভার বহনের দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলাম আসমান, জমিন ও পর্বতকে, কিন্তু তারা তা নিতে অস্বীকার করে, আর তারা শঙ্কিত-ও হয়; অথচ মানুষ তা বহন করে। নিশ্চয় তারা পাপী এবং অত্যন্ত নির্বোধ।" [কুরআনের আয়াতের সরাসরি অনুবাদ]

কিন্তু আল্লাহতা'লা আমাদেরকে পাপ ও বোকামির মাঝে ছেড়ে যাননি। আমাদের প্রাকৃতিক/শারীরিক জীবন হতে আগমন করে সাহচর্য, পরিবার-পরিজন এবং এক হাজারটি অনুরূপ বন্ধুত্ব। এই (খোদায়ী) আস্থার ভার যেটি মানুষ বহন করছে, তা যদি বন্ধুত্ব এবং জ্ঞানেরও উৎস হয়, তাহলে তাতে আজব কী বিষয় নিহিত আছে? ইন্তেক্বালের পরে কোনো ব্যক্তি হতে কোন্ জিনিসের উত্থান ঘটে? তাদের গোপন অন্তরের দিকে দেখো। তাদের গোপন অন্তর হচ্ছে একটি গাছের শেকড়ের মতোই; যদিও তা (লোকচক্ষুর) আড়াল, তথাপিও তার প্রভাব দৃশ্যমান হয় (গাছের) পাতায় ও ডালপালায়। একটি বা দুটি ডাল ভাঙ্গলেও শেকড় যদি গোটা থাকে, তবে সেগুলো আবার গজিয়ে উঠবে; কিন্তু শেকড় ক্ষতিগ্রস্ত হলে বৃক্ষশাখা বা পাতা, কোনোটি-ই আর অবশিষ্ট থাকবে না।

গ্রামাঞ্চলের জনৈক খামারি একবার শহরে তার বন্ধুর বাড়িতে কিছু দিনের জন্যে বেড়াতে আসেন। শহরের ওই মানুষ তার বন্ধুটিকে হালুয়া খেতে দেন, যা ওই অতিথি পরিতৃপ্তিসহ গ্রহণ করেন। অতঃপর ওই খামারি বলেন, "হে বন্ধু, রাত-দিন আমি গাজর খাই। এখন যখন আমি হালুয়ার স্বাদ পেয়েছি, তখন গাজর খাওয়ার আনন্দ তিরোহিত হয়েছে। কিন্তু আমি যেখানে বসবাস করি, সেখানে প্রতিদিন হালুয়া আমি পাবো না। আমার করণীয় কী?" কোনো খামারি একবার হালুয়ার স্বাদ পেলে তারা ওর তৈরির স্থানের জন্যে (অন্তরে) তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। শহরের মানুষ তাদের হৃদয় কেড়ে নিয়েছেন। তারা কী-ই বা করতে পারেন? তাদের অন্তরের খোঁজে তারা ফিরে ফিরে আসেন।

কিছু লোক যখন তোমাদের সালাম জানায়, তাদের সালাম থেকে ধোঁয়ার গন্ধ বের হয়। আবার কিছু মানুষ যখন কথা বলেন, তখন সেখানে কস্তুরীর সুগন্ধ দীর্ঘকাল বিরাজ করে। এই পার্থক্য কেবল সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন নাসিকার অধিকারী ব্যক্তিবৃন্দ-ই বুঝতে পারেন।

আমাদেরও নিজেদের বন্ধুদেরকে যাচাই করা উচিত, যাতে পরিণতিতে আমাদের অনুতাপের কোনো কারণ না থাকে। এখানেই বিদ্যমান খোদাতা'লার আরেকটি নিয়ম: "তোমার আপনাকে দিয়ে আরম্ভ করো।" তোমরা যদি বিনয়ী ও খোদার প্রতি খেদমতের দাবি করো, তাহলে এই দাবিকে যাচাই না করে গ্রহণ করো না। মানুষ যখন গোসল করে, তখন তারা কিছু পানি নিজেদের নাকে উঠিয়ে ওর স্বাদ পরীক্ষা করে। স্রেফ পানির দিকে তাকানো-ই যথেষ্ট হয় না; কেননা পানি পরিষ্কার বলে দৃশ্যমান হতে পারে ঠিকই, কিন্তু তার স্বাদ ও গন্ধে তা জীবাণূ দ্বারা সংক্রমিত কি না সে বিষয়টি প্রমাণিত হবে নিশ্চয়। একবার পরীক্ষাটি করা শেষ হলে মানুষ তাদের মুখ ধুয়ে থাকে।

তোমরা অন্তরের গভীরে যা-ই কিছু আড়াল করো না কেন, খোদাতা'লা তোমাদের মাঝে তার বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশ ঘটান। বৃক্ষের শেকড় গোপনে যা-ই কিছু ভক্ষণ করুক না কেন, তার প্রভাব পড়ে সেটির ডালপালায় ও পাতায়।

"তাদের চিহ্ন রয়েছে তাদের মুখমণ্ডলে।" [সরাসরি অনুবাদ]



কুরআন মজীদ আরো ঘোষণা করে: "আমি তাদের মুখমণ্ডলে চিহ্নের ছাপ (এঁকে) দেবো।" [সরাসরি অনুবাদ]

তোমরা যদি কাউকেই নিজেদের চিন্তাগুলো না দেখতে দিতে চাও, তাহলে তোমাদের চেহারায় আকস্মিক প্রবাহিত রক্তিমাভা লুকোবে কীভাবে?

## উপদেশ বাণী - ৫১

মওলানা রূমী (রহ:) কাব্যাকারে বলেন:

"চোখে না দেখলে কীভাবে তোমরা পাবে খুঁজে?
এ সত্য সবার বেলায়, ব্যতিক্রম যাঁরা প্রেমে মজে,
অন্ধ অবস্থায় কেমনে তারা প্রেমাস্পদেরে তল্লাশে,
যতোক্ষণ না তাঁরে খুঁজে পায় তাঁরই সকাশে।" [ভাবানুবাদ]

যে বস্তু এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি, তা-ই হলো মানুষের তালাশের সমষ্টি। রাত-দিনই তারা সেটি খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে খুঁজে পাওয়া ও তা পূরণের পরে যে অন্বেষণ আরম্ভ হয়, তা এক আজব অন্বেষণ বটে - যেটি আমাদের কল্পনা ও উপলব্ধিরও অতীত। পার্থিব তালাশ নতুন কোনো কিছুর জন্যে পরিচালিত হয়, এমন কোনো কিছু যার অভিজ্ঞতা এখনো সঞ্চয় করা হয়নি; অথচ এই অপর তালাশটি আরম্ভ হয় আমরা যা ইতোমধ্যে খুঁজে পেয়েছি এবং তারপর আকাঙ্ক্ষা করেছি, সেখান থেকেই। এটি খোদাতা'লার তালাশ, কেননা খোদাতা'লা-ই এখানে অন্বেষক।

ওহে বন্ধু, তুমি যতোক্ষণ (স্থান-) কালের অধীন সৃষ্ট বস্তুর সন্ধানে তৃষ্ণার্ত থাকবে, ততোক্ষণ তুমি তোমার লক্ষ্য হতে থাকবে বহু দূরে। কিন্তু একবার তোমার অন্বেষণ খোদার তালাশে গিয়ে মিশলে এবং তাঁর অন্বেষণ তোমার নিজের চাওয়ার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করলে (জেনে রেখো), তোমাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এরপরই তুমি প্রকৃতপ্রস্তাবে সন্ধান করতে পারবে।

জনৈক শিক্ষার্থী (দরবারি মজলিশে) বলেন: "কেউ খোদার ওলী (বন্ধু) কি না, অথবা খোদার দীদার (সান্নিধ্য) পেয়েছেন কি না, সে বিষয়টি প্রমাণের কোনো উপায় নেই। কথা, কাজ, অলৌকিক ক্রিয়া (কারামত) বা অন্য কোনো কিছু এর প্রমাণ হতে পারে না। কেননা কথাকে অনুকরণ করা যায়, চর্চার মাধ্যমে। আর কাজ ও অলৌকিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বলা যায়, এমন কিছু মানুষ আছে যারা মানুষের অন্তরের গভীর চিন্তাগুলো বুঝতে পারে এবং জাদু বিদ্যা দ্বারা অনেক বিস্ময়কর জিনিস-ও প্রদর্শন করতে পারে।"

মওলানা রূমী (রহ:) জিজ্ঞেস করেন: তুমি কাউকে (ওলী হিসেবে) বিশ্বাস করো কি না?

ওই শিক্ষার্থী উত্তর দেন: "জ্বি, আল্লাহর কসম, আমি করি। আমি বিশ্বাস করি এবং ভালোবাসি, দুটোই।"

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: ওই ব্যক্তির প্রতি তোমার বিশ্বাস কি প্রমাণ ও নিদর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত? নাকি তুমি স্রেফ চোখ বন্ধ করে তাকে বেছে নিয়েছো?

ওই শিক্ষার্থী বলেন: "আমার বিশ্বাস প্রমাণ ও নিদর্শনবিহীন হওয়া থেকে আল্লাহ যেনো আমায় মাফ করেন।"

মওলানা রূমী (রহ:) অতঃপর বলেন: তাহলে তুমি কেন এ কথা বলছো যে বিশ্বাসে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রমাণ বা নিদর্শন নেই? তুমি তো স্ববিরোধী মত প্রকাশ করেছো।

আরেকজন ব্যক্তি (দরবারি মজলিশে) বলেন: "প্রত্যেক সূফী/দরবেশ ও আরেফ (খোদা-জ্ঞানী)-ই বলেছেন, 'আমি খোদাতা'লার এমন এক সান্নিধ্য বা নৈকট্য এবং আশীর্বাদ লাভ করেছি যা অন্য কেউই ইতিপূর্বে কখনো জানতে পারেননি'।"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: এই বক্তব্য কার - কোনো দরবেশের? নাকি অন্য কারোর? দরবেশ হয়ে থাকলে তাঁরা জানতেন যে প্রত্যেক দরবেশেরই এই বিশ্বাস ছিলো; এমতাবস্থায় কোনো দরবেশ কীভাবে বিশ্বাস করতে পারেন যে তাঁরাই খোদায়ী নেআমত/আশীর্বাদের একমাত্র



গ্রহীতা? তবে এটি দরবেশ ভিন্ন অন্য কারো বক্তব্য হয়ে থাকলে সত্যি বলতে কী, ওই ব্যক্তি-ই হলেন খোদার বন্ধু ও মনোনীত জন; কেননা আল্লাহতা'লা সকল ওলী/দরবেশ হতে এই অভিজ্ঞতা গোপন রেখেছেন, কিন্তু ওই ব্যক্তি হতে গোপন করেননি।

ওই একই ব্যক্তি নিজের কথাকে একটি রূপকের দ্বারা সমর্থন করতে গিয়ে বলেন: "এক ছিলেন রাজা, যাঁর ছিলেন দশজন উপপত্নী। উপপত্নীরা বলেন, 'আমাদের মধ্যে কে রাজা মহাশয়ের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়, তা আমরা জানতে আগ্রহী।' এমতাবস্থায় বাদশাহ ঘোষণা করেন, 'আগামীকাল এই আংটি আমার সবচেয়ে প্রিয়তমার ঘরে থাকবে।' পরের দিন তিনি ওই আংটির অনুরূপ আরো দশটি আংটি বানানোর আদেশ দেন, আর প্রত্যেক তরুণী উপপত্নীর কাছেই সেগুলোর একটি করে হস্তান্তর করেন।"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তরে বলেন: প্রশ্নটি এখনো বহাল আছে। এই কাহিনী কোনো মীমাংসা এনে দেয়নি, আর কোনো কিছু বদলায়ও নি। 'রাজা আমায় সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন' - এ কথাটি দশজন তরুণীর কোনো একজন বলেছিলেন, নতুবা অন্য কেউ বলেছিলেন। দশজন তরুণীর মধ্যে কেউ বলে থাকলে এবং ঠিক তাঁর আংটির মতোই প্রত্যেককে একটি করে আংটি দেয়া হয়েছে - এই তথ্য জেনে থাকলে তিনি কীভাবে অনুভব করতে পারেন যে তাঁকেই সবচেয়ে বেশি মহব্বত করা হয়েছে? তবে এই বক্তব্য ওই দশজন তরুণী ভিন্ন অন্য কারো হলে ওই ব্যক্তি প্রকৃত-ই রাজার আনুকূল্য লাভ করেছেন এবং তিনি তাঁর বিশেষ মহব্বতের পাত্র-ও।

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) বলেন: "একজন প্রকৃত আশেক্ব তথা খোদাপ্রেমিককে অবশ্যই হতে হবে বিনয়ী ও সমর্পিত, হীন ও অতিসহিষ্ণু।" আর তাঁরা (সম্ভবত পণ্ডিতবৃন্দ) অন্যান্য গুণ-ও তালিকাবদ্ধ করেছেন।

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: মাশূক্ব (প্রেমাস্পদ তথা খোদাতা'লা) চান বা না-ই চান, একজন আশেক্বকে কি ওই রকম-ই হতে হবে? প্রেমাস্পদের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে গিয়ে যদি আশেক্ব এরকম হন, তাহলে তারা কোনো প্রেমিক নন, বরঞ্চ তারা স্রেফ নিজেদের আকাঙ্ক্ষারই অনুসরণ করছেন।

প্রেমাস্পদের আকাঙ্ক্ষাকে প্রেমিক কবূল তথা গ্রহণ করলে তাঁদের প্রেমাস্পদ যখন তাঁদেরকে বিনয়ী ও হীন (বা অতিসহিষ্ণু) দেখতে চান না, তখন তাঁরা বিনয়ী ও হীন হন কীভাবে? অতএব, আশেক্বের আহওয়াল তথা (আত্মিক/আধ্যাত্মিক) অবস্থা অজ্ঞাত, আর আমরা কেবল জানতে পারি মাশূক্ব (খোদাতা'লা) আমাদেরকে কীভাবে দেখতে পছন্দ করেন।

পয়গম্বর ঈসা (আ:) বলেন, "আমি বিস্ময়াবিভূত সেই জীবিত সৃষ্টিকে দেখে, যিনি কোনো জীবিত সৃষ্টিকে খেতে পারেন।" আক্ষরিক (মানে যাহেরী) অর্থগ্রহণকারীরা বলেন যে এটি মানুষের দ্বারা প্রাণির গোস্ত খাওয়াকে উদ্দেশ্য করেছে। এ কথা ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। কেন? এই জন্যে যে মানুষ যখন প্রাণির মাংস খায়, তখন তা আর প্রাণি থাকে না, বরঞ্চ জড় বা প্রাণহীন বস্তুতে পরিণত হয়। একবার প্রাণিটিকে মেরে ফেলা হলে সেটির জীবিত আত্মা চলে যায়। এই বচনের প্রকৃত অর্থ হলো, শায়খ (পীর ও মুর্শীদ) রহস্যময়ভাবে মুরীদকে গ্রাস করেন [মানে তিনি মুরীদের ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হন - বঙ্গানুবাদক]। আমি আশ্চর্যান্বিত হই এরকম অসাধারণ একটি প্রক্রিয়া দেখে!

অতঃপর কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) নিম্নের প্রশ্নটি করেন: "পয়গম্বর ইবরাহীম (আ:) নমরূদকে বলেন, 'আমার খোদা মৃতকে জিন্দা করেন, আর জীবিতকে করেন মৃতে পরিণত।' নমরূদ উত্তর দেয়, 'আমি যখন মানুষকে নির্বাসিত করি, তখন তা-ও যেনো তাদেরকে মৃতে পরিণত করার মতোই; আর যখন কাউকে কোনো পদে নিয়োগ দেই, তখন অবস্থা এরকম যেনো আমি তাদেরকে জীবিত করে তুলেছি।' অতঃপর পয়গম্বর ইবরাহীম (আ:) নমরূদের যুক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে সেই তর্ক বাদ দেন। বরং তিনি আরেক ধাঁচের যুক্তি-বিবেচনার অবতারণা করেন এই কথা বলে, 'আমার খোদা পূর্বদিক হতে সূর্যোদয় সংঘটন করে পশ্চিম দিকে তার অস্ত ঘটান। পারলে এর বিপরীতটি করো!' এই যুক্তিটি কি অপরটির (মানে আগেরটির) সাথে মতভেদ সৃষ্টিকর নয়?"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তরে বলেন: আল্লাহ মাফ করুন, পয়গম্বর ইবরাহীম (আ:) হয়তো নমরূদের দ্বারা নিরুত্তর হয়ে যেতে পারতেন, আর তাঁর কাছে এর কোনো সদুত্তর না-ও থাকতে পারতো! সত্য হলো,



পয়গম্বর ইবরাহীম (আ:) তাঁর দ্বিতীয় মন্তব্য দ্বারা দেখাতে চেয়েছেন কীভাবে আল্লাহ পাক পূর্বদিকের গর্ভ হতে জীবন সৃষ্টি করেন এবং কীভাবে আবার সেটিকে পশ্চিম দিকের সমাধিতে সমাহিত করেন (মৃত্যুতে)। পয়গম্বর ইবরাহীম (আ:)-এর যুক্তির অবতারণা ছিলো নিখুঁত সামঞ্জস্যতার ভিত্তিতে। খোদাতা'লা আমাদের অন্তরের গভীরে পুরোপুরি নতুন কোনো কিছু এনে আমাদেরকে প্রতিটি মুহূর্তে পুনর্বার সৃষ্টি করে থাকেন। তাঁর প্রথম মুহূর্তটি কোনোভাবেই দ্বিতীয়টির মতো নয়, আর তাঁর দ্বিতীয় মুহূর্তটিও তৃতীয়টির মতো নয়। তথাপিও মানুষেরা নিজেদের সম্পর্কে অচেতন (মানে আত্মভোলা) হয়ে এই জন্ম ও মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেন না।

সুলতান মাহমূদ (গযনবী)-কে একবার অপরূপ সুন্দর একটি ঘোড়া (উপহারস্বরূপ) দেয়া হয়। পরবর্তী উৎসব-দিবসে তিনি তাতে চড়েন, আর সব মানুষ নিজেদের বাড়ির ছাদে উঠে বসেন তাঁকে দেখার জন্যে এবং এই দৃশ্য উপভোগের উদ্দেশ্যে। কিন্তু জনৈক মাতাল লোক তাঁর ঘর থেকে কোনোক্রমেই বেরোবেন না। মানুষেরা তাঁকে জোর করে তুলে নিয়ে যায় ছাদে এ কথা বলে, "আসুন এবং সুলতানের ঘোড়াটি দেখুন!" তিনি উত্তর দেন, "আমি ব্যস্ত নিজের কাজে; ঘোড়া দেখার ইচ্ছে আমার নেই।।" কিন্তু তিনি রেহাই পাননি। এমতাবস্থায় তিনি একান্ত মদ্যপ অবস্থায় ছাদের ধার ঘেঁষে বসে থাকেন, আর সুলতান ওই সময় সেই স্থানটি অতিক্রম করতে থাকেন।

ওই মাতাল ব্যক্তি যখন সুলতানকে ঘোড়ার ওপর উপবিষ্ট দেখতে পান, তৎক্ষণাৎ তিনি চিৎকার করে বলেন, "এই অশ্বটি নিয়ে আমার কী গরজ? কেন, এটি যদি এই মুহূর্তে আমার হয়েও যেতো এবং কোনো গায়ক কবি এমন কী একটি গানও গেয়ে শুনাতো, তথাপিও আমি এটিকে ওই গায়কের কাছে দান করতাম।" এ কথা শুনে সুলতান মাহমূদ অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং ওই মাতাল ব্যক্তিকে কয়েদখানায় আটক করান। অতঃপর এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হলে ওই মাতাল ব্যক্তি সুলতানের কাছে সংবাদ পাঠান এই মর্মে, "আমার কী অপরাধ? আমি কী পাপ করেছি? জাহাঁপনায়ে আলম (সম্রাট) বিষয়টি বিবৃত করলে তাঁর (এই) গোলাম অবহিত হতে পারবো।"

সুলতান ওই ব্যক্তিকে তাঁর উপস্থিতিতে আনান এবং তাঁকে বলেন, "ওহে বেয়াদব, তুমি ওই কথা কীভাবে উচ্চারণ করতে পারলে? কীভাবে তুমি অমন রূঢ় কথা বলতে পারলে?" এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তি উত্তর দেন, "জাহাঁপনা, ওই কথা যে বলেছে, আমি সে নই। ওই মুহূর্তে এক মাতাল বামন ছাদের ধার ঘেঁষে বসেছিলো এবং সে-ই ওই কথা বলেছিলো। এক্ষণে আমি ওই লোক নই। আমি একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি।" তাঁর এই উত্তর শুনে সুলতান খুশি হন এবং তাঁকে (রাজকীয়) সম্মাননাসূচক ভূষণ পরিয়ে মুক্ত করে দেন।

যে ব্যক্তি আমাদের সাথে যোগ দেন এবং এই (খোদায়ী এশক্বের) শরাব পানে মাস্ত্ (ভাবোন্মত্ত) হন, তাঁরা যেখানেই যান না কেন, কিংবা যাঁর সাক্ষাৎ লাভ-ই করেন না কেন, বাস্তবে তাঁদের মুহূর্তগুলো তবু আমাদের সাথেই কাটে। কেননা অপরিচিতদের শীতলতা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদেরই আপন বন্ধুদের সদয় সাহচর্যের কথা, আরো মনে করিয়ে দেয় সেসব মানুষের সাথে মেশার কথা যারা জানেন না এই শরাব জাগিয়ে তোলে ভালোবাসা ও সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা তাঁদেরই প্রতি, যাঁরা এই শরাবের ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষা জাগানোর বিষয়টি সম্পর্কে (সম্যক) অবগত।

এ কারণেই (আধ্যাত্মিক জগতের) মানুষ চিনির ওপর অন্যান্য ফলকে প্রাধান্য দেন এ কথা বলে, "আমরা এতোখানি তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করেছি যে মিষ্টত্বের মর্যাদা অর্জন করেছি।" সুতরাং তোমরা তিক্ততা ভোগ না করা পর্যন্ত মিষ্টত্বের আনন্দ সম্পর্কে জানবে কীভাবে?

## উপদেশ বাণী - ৫২

মওলানা রূমী (রহ:)-কে নিম্নের চরণগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়:

"যবে চূড়ান্ত লক্ষ্য প্রেমের হয় অর্জিত
আকাঙ্ক্ষা হয় অপছন্দে পরিণত।"

মওলানা রূমী (রহ:) ব্যাখ্যা করেন: বন্ধুত্বের তুলনায় অপছন্দ এক সরু বা সংকীর্ণ জগতের মতোই। এ কারণেই মানুষ বন্ধুত্বের খোঁজে ঘৃণা হতে



দূরে সরে যায়। কিন্তু বন্ধুত্বের এই জগতটি বন্ধুত্ব ও অপছন্দ উভয়ের উৎসের তুলনায় নিজেই সংকীর্ণ। বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, ঈমান (বিশ্বাস) ও কুফর (অবিশ্বাস) - এসব-ই পরস্পরের বিপরীত, যা দ্বৈততার দিকে পরিচালিত করে। অথচ এমন এক জগতের অস্তিত্ব রয়েছে যেখানে কোনো দ্বৈততা নেই, আছে কেবল খাঁটি ঐক্য; আর আমরা যখন ওই জগতে উপনীত হই, তখন আমরা বন্ধুত্ব ও ঘৃণার (দ্বৈততার) ঊর্ধ্বে ওঠে যাই। ওই জগতে (এক সাথে) এই দুইয়ের স্থান সঙ্কুলান হয় না।

আমরা যখন ওই জগতে উপনীত হই, তখন দ্বৈততাকে পেছনে ফেলে আসি। স্বাধীন জগৎ যেটিকে আমরা ভালোবেসেছিলাম এবং যেটির জন্যে সংগ্রাম করেছিলাম, সেটি বৈপরীত্যের অস্তিত্বহীন ওই অবস্থার তুলনায় সংকীর্ণ। অতএব, আমরা সেটি আর কামনা করি না; অধিকন্তু সেটিও আমাদের প্রত্যাখ্যান করে।

মনসূর হাল্লাজ (রহ:) আল্লাহতা'লার সাথে বন্ধুত্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হলে তিনি আপন শত্রুতে পরিণত হন এবং আত্মাহুতি (মানে জান কুরবানি) দেন। তিনি বলেন, "আনাল হক্ব (অর্থাৎ, আমি-ই হক্বতা'লা/খোদা)।" এর মানে ছিলো "আমি বিলীন হয়েছি, কেবল আল্লাহতা'লা-ই অবশিষ্ট বা অস্তিত্বশীল আছেন।" এটি চরম পর্যায়ের বিনয়। তোমরা যে বলো, "আপনি হলেন আল্লাহ, আমি আপনার বান্দা" - এ কথাটি (স্রেফ) দাম্ভিকতা। কেননা এতে তোমরা তোমাদের অস্তিত্বেরই ঘোষণা দাও এবং দ্বৈততা সৃষ্টি করো। 'তিনি আল্লাহ' - এ কথাটি বল্লেও দ্বৈততা হবে, কেননা যতোক্ষণ 'আমি' অস্তিত্বশীল থাকে, ততোক্ষণ 'তিনি' (বিরাজমান) হওয়া অসম্ভব। সুতরাং (ওই ঘটনায়) খোদাতা'লা একাই বলেছিলেন, "আমি-ই হক্বতা'লা" - যেহেতু মনসূর হাল্লাজ (ইতোমধ্যেই) বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন।

কল্পনার জগতটি সকল বাস্তবতা ও ধারণার চেয়ে বড়; কারণ সব ধারণা-ই কল্পনা হতে জন্মলাভ করে। তবু ওই জগৎ, যেখান থেকে কল্পনার জন্ম, সেটির তুলনায় কল্পনা নিজেই সংকীর্ণ। এটি হচ্ছে ব্যাখ্যাসমূহের সীমা, কেননা ওই বাস্তবতা কথা ও অভিব্যক্তি দ্বারা জানানো যায় না।

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) প্রশ্ন করেন: "তাহলে অভিব্যক্তি ও কথার কী উপকারিতা বা উপযোগিতা?"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: কথা তোমাদেরকে অন্বেষণের পথে বেরোতে সহায়তা করে। কিন্তু তা তোমাদের অন্বেষণের লক্ষ্যবস্তু নয়। তা-ই যদি হতো, তবে এই আধ্যাত্মিক সাধনা ও আত্মোৎসর্গের কোনো প্রয়োজন-ই পড়তো না। বস্তুতঃ কথা হচ্ছে দূরের কোনো কিছুকে এক নজর দেখতে পাওয়ার (কিম্বা আভাস পাওয়ার) মতোই। তোমরা তার গমনপথ ধরে পিছু পিছু অনুসরণ করো যাতে আরো ভালোভাবে দেখতে পারো, কিন্তু এর মানে এই নয় যে ওই গমনপথ-ই তোমাদের অন্বেষণকৃত বস্তু। ভাষণও মূলতঃ একই (অর্থবোধক); এটি তোমাদেরকে মানে-মতলব খোঁজার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে থাকে, যদিও কথা কখনোই বাস্তবতা হতে পারে না।

ইতিপূর্বে কোনো একদিন কেউ বলেছিলেন, "আমি অনেক বিদ্যাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি এবং অনেক ধারণা রপ্ত করেছি, তথাপি আমি এখনো জানি না মানুষের মাঝে কোন্ (মৌল) উপাদান বা সত্তা চির-অস্তিত্বশীল থাকে। আমি অনেক খুঁজেছি, কিন্তু এর হদিস পাইনি।"

এসব বিষয় যদি কথা দ্বারা জানা সম্ভব হতো, তাহলে তোমাদের (সত্তার) বিলীন হবার প্রয়োজন পড়তো না এবং এতো কষ্টভোগ-ও করতে হতো না। কিন্তু তোমাদের অস্থায়ী সত্তার বিলীন হওয়ার সংগ্রামের কষ্ট তোমরা সহ্য না করলে কীভাবে অবশিষ্ট (তথা অস্তিত্বশীল) থাকার সত্তাটি সম্পর্কে তোমরা কখনো জানতে সক্ষম হবে?

এক বালক বলে, "আমি কা'বা শরীফ সম্পর্কে শুনেছি, কিন্তু যতো দূরেই তাকাই না কেন, তা দেখতে পাই না। আমি ছাদে উঠে সেখান থেকে খোঁজ করবো।" যখন সে ছাদে উঠে ঘাড় উঁচিয়ে তাকায়, তখনো কা'বা শরীফকে দেখতে পায় না। এমতাবস্থায় কোনো কা'বা শরীফ আদৌ অস্তিত্বশীল মর্মে ধারণাটি সে প্রত্যাখ্যান করে। কা'বা শরীফের দর্শন পেতে ওর চেয়েও অধিক সাধনা প্রয়োজন। কারো বসতির জায়গা হতে সেটির দর্শন পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

একইভাবে, শীতকালে পশুর লোমবিশিষ্ট জ্যাকেটের জন্যে তোমরা আপ্রাণ খোঁজ করো, অথচ গ্রীষ্মকাল এলেই তোমরা তা ছুঁড়ে ফেলো এবং সেটি সম্পর্কে ভুলে যাও। তোমরা উষ্ণতার তালাশে ওই কোটখানি চেয়েছিলে। তোমরা উষ্ণতার প্রেমে মজেছিলে তখন। শীতকালে তোমরা



উষ্ণতাকে খুঁজে পাও না, তাই তো কোটের মধ্যস্থতা গ্রহণ করো; কিন্তু গ্রীষ্মকালের সূর্য যখন একবার কিরণ ছড়াতে আরম্ভ করে, তখন তোমরা পশুর লোমবিশিষ্ট জ্যাকেটখানি ছুঁড়ে ফেলো।

"যখন আসমানকে ছিঁড়ে আলাদা করা হবে" এবং "যখন জমিনকে মহা কম্পন দ্বারা নাড়িয়ে দেয়া হবে" [আয়াতে করীমার সরাসরি অনুবাদ] - এসব (আয়াত) তোমাদেরই প্রতি ইঙ্গিত করে। এগুলোর মানে হলো, তোমরা (সমাজে) একত্রিত হওয়ার সুখানুভূতি লাভের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছো বটে, তবে এমন এক দিন আসছে যখন তোমরা ছিন্নভিন্ন হবার সুখানুভূতিও লাভ করবে। তখন তোমরা অপর (তথা পরবর্তী) জগতের বিস্তৃতি দেখতে পাবে এবং এই বর্তমান সংকীর্ণতা হতে মুক্তি পাবে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ চারটি পেরেক দ্বারা দীর্ঘ সময়ের জন্যে মাটিতে আটকা পড়ে থাকলে, সে এই অবস্থায় স্বস্তিবোধ করতে শুরু করে, আর মুক্ত থাকার সুখকে ভুলে যায়। তবে ওই চারটি পেরেক থেকে বাঁচার পরপরই কেবল তারা কেমন যন্ত্রণায় পতিত হয়েছিলো, তা বুঝতে পারে। অনুরূপভাবে, শিশুদেরকে কাপড়ের ফালি দ্বারা বেঁধে দোলনায় রাখা হয়, আর তারা নিজেদের হাত বাঁধা অবস্থায় একদম আরামে শুয়ে থাকে। কিন্তু কোনো প্রাপ্তবয়স্ককে যদি এভাবে দোলনায় বেঁধে রাখা হতো, তাহলে তা হতো এক পীড়ন ও কয়েদখানা।

গোলাপ ফুল ফুটলে এবং কুঁড়ি বের হলে কেউ কেউ সুখ অনুভব করেন। আবার কেউ কেউ বাতাসে ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ে তার মূলের সাথে মিশে গেলে আনন্দ অনুভব করেন। অতএব, কিছু মানুষ চান বন্ধুত্ব, আবেগ, অবিশ্বাস ও বিশ্বাস বিলীন হয়ে তাদের উৎসে প্রত্যাবর্তন করুক। কেননা এগুলো হচ্ছে আকার-আকৃতির দেয়াল যা সংকীর্ণতা ও দ্বৈততার সূত্রপাত করে থাকে; পক্ষান্তরে, অপর জগতটি হচ্ছে প্রশস্ততা ও পরম ঐক্য।

এসব কথা আপনাআপনি কোনো ক্ষমতা ধারণ করে না। কীভাবেই বা এগুলো শক্তিশালী হবে? এগুলো তো স্রেফ শব্দ। বস্তুতঃ এগুলো আপনাআপনি দুর্বলতার একটি কারণ হতে পারে। তথাপি এগুলো কিছু মানুষকে সত্যের দিকে অনুপ্রাণিত করে থাকে। শব্দ/কথাগুলো একটি পর্দা

বটে। দুই বা তিনটি অক্ষর একত্রে কীভাবে জীবন ও উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে?

মানুষ যখন বেড়াতে আসেন এবং তোমরা ভদ্রতার সাথে তাঁদের সম্ভাষণ জানাও, আর সাদর অভ্যর্থনাও জ্ঞাপন করো, তখন তাঁরা খুশি হন এবং মহব্বত অনুভব করেন। কিন্তু তোমরা মর্যাদাহানিকর ২-৩টি কথা দ্বারা তাঁদেরকে গ্রহণ করলে ওই ২-৩টি কথাই তাঁদের ক্রোধান্বিত ও ব্যথিত করে। তাহলে কিছু কথাকে একই সুতোর মালায় গাঁথার সাথে মহব্বত বৃদ্ধি বা ক্রোধ উস্কে দেয়ার যোগসূত্র কী? আল্লাহতা'লা এই পর্দাগুলোকে নিযুক্ত করেছেন যাতে কারো নজর তাঁর সৌন্দর্য ও পূর্ণতার ওপর পড়তে না পারে। দুর্বল পর্দাসমূহ দুর্বল নয়নের জন্যেই বিহিত/উপযুক্ত।

বাস্তবে রুটি জীবন ধারণের কারণ নয়, অথচ আল্লাহ পাক সেটিকে জীবনের কারণ ও প্রাণশক্তি হিসেবে দৃশ্যমান করেছেন। বস্তুতঃ রুটির আপনাআপনি কোনো মনুষ্য জীবন নেই; তাহলে সেটি কীভাবে শক্তি সৃষ্টি করতে পারে? এর যদি আদৌ কোনো জীবন থাকতো, তাহলে সেটি নিজেকে জীবিত রাখতে পারতো।

## উপদেশ বাণী - ৫৩

মওলানা রূমী (রহ:)'কে তাঁর রচিত 'মসনবী শরীফ' কাব্যগ্রন্থের নিম্নোক্ত দুটি পংক্তির অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়:

"তুমি-ই হও খোদ ওই ভাব, হে ভ্রাতা
এই অস্থি ও শিরাগুলো অন্য কোনো সত্তা।" [ভাবানুবাদ]

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তরে বলেন: তোমাদের এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। বাস্তবে 'খোদ ওই ভাব' কোনো 'ভাব-ই' নয়; আর যদি তা হয়-ও, তথাপি মানুষ এই শব্দটি দ্বারা যে ধরনের ভাবকে সাধারণতঃ বুঝিয়ে থাকে, এটি তা নয়। 'ভাব' শব্দটির ব্যবহার দ্বারা আমি উদ্দেশ্য করেছি 'ভাব' তথা 'মূল উপাদান'কে। এই 'ভাব'কে সাধারণ মানুষের কাছে বোঝাতে তোমাদের যদি আরো গতানুগতিক পন্থার প্রয়োজন পড়ে,



তাহলে তোমরা বলো: "মানুষ 'হাইওয়ানে নাতেক' তথা বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণি।"

বচন হচ্ছে ভাব, তা মুখে বলা হোক বা না-ই হোক। মানুষের বাকিটুকু হচ্ছে প্রাণি। অতএব, মানুষ ভাবের সমষ্টি এবং বাকিটুকু 'অস্থি ও শিরা-উপশিরা' বলা একদম সত্য। বচন হলো সূর্যের মতো; সকল মানুষ সূর্য হতে উষ্ণতা ও প্রাণ পায়, আর সূর্য সবসময়-ই উপস্থিত। গোটা জগত-ই সূর্য হতে তাপ পেয়ে থাকে, অথচ সূর্যের কিরণ সব সময় দৃশ্যমান হয় না। যখন ভাব কথায় বা ইশারায় প্রকাশ পায়, তা ধন্যবাদ বা অভিযোগস্বরূপ-ই হোক, অথবা হোক ভালো বা মন্দস্বরূপ, তখন বচনের রবি দৃশ্যমান হয়, ঠিক যেমনটি কোনো দেয়ালের ওপর আসমানের সূর্যের কিরণ পড়লে তা দৃশ্যমান হয়।

অতএব, ওই ভাবের সূর্য-কিরণ দৃশ্যমান হয় অক্ষর ও শব্দের মাধ্যমে। যদিও ওই রবি সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে সর্বদা উপস্থিত, আর যেহেতু 'তিনি (আল্লাহ) হন সর্ব-সূক্ষ্মজ্ঞানময়' (হেকমতময়), সেহেতু সেটিকে (মানে ওই রবিকে) দৃশ্যমান ও স্পষ্ট হওয়ার জন্যে স্থূলতার কিছু উপাদানের প্রয়োজন পড়ে।

নির্দিষ্ট এক ব্যক্তি বলেছিলেন যে তাঁর কাছে 'খোদা' শব্দটির কোনো অর্থ নেই, সেটি (বরঞ্চ) তাঁকে হতভম্ব ও আড়ষ্ট করেছে। তাঁরা (হক্কানী উলামা/সুফী-দরবেশ) যখন তাঁকে বলেন, "এটি খোদাতা'লার সৃষ্টিজগৎ, এগুলো তাঁরই (ঐশী) আদেশ-নিষেধ, আর এগুলো তাঁরই (শরঈ) বিধান," তখন-ই ওই কিরণের উষ্ণতাকে ব্যক্তিটি অনুভব করতে সক্ষম হন। সুতরাং খোদাতা'লার সূক্ষ্মতা সর্বদা অস্তিত্বশীল থাকা এবং ওই ব্যক্তির ওপর প্রভা ছড়ানো সত্ত্বেও তিনি তা দেখতে পাচ্ছিলেন না, যতোক্ষণ না তাঁরা তাঁর কাছে ঐশী আজ্ঞা, সৃষ্টিজগৎ ও শরঈ বিধানের মাধ্যমে তা ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন।

এমন কিছু মানুষ আছেন যারা অসুস্থতার কারণে মধু ব্যবহার করতে পারেন না। তবু অন্যান্য কিছু খাবার, যেমন ভাতের সাথে তা মিশিয়ে হলুদ বা হালুয়ার সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে তারা তা খেতে পারেন। তবে অসুখ ভালো হয়ে গেলেই তারা কোনো মাধ্যম ছাড়া মধু খেতে পারেন।

অতএব, বচন হচ্ছে এক সর্বদা কিরণ বিচ্ছুরণকারী রবি যা (এ কাজে) বিরামহীন, আর আমাদের তা প্রত্যক্ষ ও উপভোগ করতে প্রয়োজন হয় কিছু স্থূল মাধ্যমের। কিন্তু একবার ওই কিরণ ও সূক্ষ্মতাকে তোমরা কোনো স্থূল মাধ্যম ছাড়া দেখতে সক্ষম হলে ওই মহাসাগরের গভীরে অবস্থিত অপরূপ রঙ ও বিস্ময়কর দৃশ্যাবলীর সন্ধান পাবে। অথচ এটি এমন কী আশ্চর্যের বিষয়? কেননা বচন সর্বদা তোমাদের অভ্যন্তরেই বিরাজমান, তা তোমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাষায় ব্যক্ত করো বা না-ই করো, আর এমন কী তোমাদের যদি কথা বলার চিন্তা না-ও থেকে থাকে (তাতে কিছু এসে যাবে না)।

দার্শনিকবর্গ বলেন, "মানুষ বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণি।" বস্তুতঃ তোমরা যতোদিন জীবিত থাকবে, ততোদিন-ই পশুত্ব তোমাদের অভ্যন্তরে থাকবে, ঠিক যেমনি বচন তোমাদের ভেতরে বিদ্যমান। চেবানো পশুত্বের একটি অভিব্যক্তি, কিন্তু তা তার আপন অবস্থা নয়। একইভাবে, ভাষণ দান ও আলাপ হচ্ছে স্রেফ 'বচনেরই' প্রতিফলন।

মানুষের আত্মিক অবস্থা তিনটি। প্রথমটিতে তাঁদের মাঝে খোদা সম্পর্কে কোনো ভাব-ই বিরাজ করে না, স্রেফ অন্য সব কিছুর বন্দনা ও খেদমত ব্যতিরেকে: এসবের মধ্যে রয়েছে বন্ধু-বান্ধব ও প্রেমাস্পদ, সম্পদ ও সন্তান, পাথর ও জমি। কিন্তু একবার (খোদা সম্পর্কে) কিছুটুকু জ্ঞান লাভ ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে তাঁরা খোদা ছাড়া আর কিছুরই খেদমত করেন না। অধিকন্তু, আরো জানার ও দেখার পর তাঁরা নীরব এক হালত-অবস্থায় উপনীত হন। তাঁরা এ কথা বলেন না, "আমি খোদার খেদমত করি" কিংবা "আমি খোদার খেদমত করি না," কেননা তাঁরা এ দুটোরই ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছেন। এসব মানুষের কাছ থেকে জগতের প্রতি কোনো শব্দ-ই আর বের হয় না।

"খোদা উপস্থিত কিংবা অনুপস্থিত নন,
কেননা তিনি উভয়েরই স্রষ্টা হন।"

সকল কথা/বাণী, বিদ্যা, দক্ষতা, পেশা বচন হতেই রসাস্বাদন করে থাকে। তবে ওই অধ্যায়ের শেষটুকু সম্পর্কে জানা যায় না, কেননা সেগুলো স্রেফ অভিব্যক্তিমাত্র এবং সেটির (মানে বচনের) নিজের হাল-অবস্থা নয়। এর দৃষ্টান্ত হলো সেই পুরুষটি, যে এক ধনাঢ্য ও সুন্দরী



মহিলার পাণিগ্রহণের উদ্দেশ্যে তার ভেড়া ও ঘোড়াগুলোকে দেখাশোনা করে এবং তার আপেল-বাগানে পানি দেয়। যদিও তার সময় এসব সেবায় অতিবাহিত হয়, তবুও সেগুলোর স্বাদ মহিলাটি হতে আসে। মহিলাটি যদি অদৃশ্য হয়ে যাবার হতো, তাহলে ওই সব কাজ-ও শীতল ও প্রাণহীন হয়ে যেতো। একইভাবে, সকল পেশা ও বিদ্যা সুফী-দরবেশবৃন্দের অনুপ্রেরণার কিরণ হতে জীবন, আনন্দ ও উষ্ণতা লাভ করে। তাঁদের এই অনুপ্রেরণা ছাড়া সকল কাজ একদম স্বাদবিহীন/বিস্বাদ ও আনন্দশূন্য/তিক্ত হয়ে পড়তো।

## উপদেশ বাণী - ৫৪

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: আমি প্রথমে যখন কাব্য রচনা আরম্ভ করি, তখন মহা এক প্রেরণা আমাকে চালিত করেছিলো। ওই সময় প্রেরণাটি ছিলো শক্তিশালী। এখন সেই আকাঙ্ক্ষাটি দুর্বলতর ও ক্ষিয়মাণ, কিন্তু এর প্রভাব এখনো বিদ্যমান। এমনটি-ই হলো খোদাতা'লার রীতি। তিনি বস্তুসমূহকে সেগুলোর উঠতি সময়ে প্রাণস্পন্দন দান করেন, যার ফলশ্রুতিতে মহাকীর্তি ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা লাভ হয়; আবার (সেগুলোর) পড়ন্ত সময়েও তাঁর প্রভাব বজায় থাকে। "পূব ও পশ্চিমের প্রভু" - এই বাক্যটির অর্থ, "তিনি উঠন্ত ও পড়ন্ত উভয়কেই প্রতিপালন করেন।"

ভ্রান্ত মো'তাযেলী গোষ্ঠী বিশ্বাস করে যে মানুষ আপন কর্মের স্রষ্টা; অর্থাৎ, প্রতিটি কাজ আমাদের নিজেদেরই তৈরি। কিন্তু এটি সত্য হতে পারে না। কেননা আমরা যা কিছু করি, সব-ই আমাদের মস্তিষ্ক, আত্মা, ইন্দ্রিয় বা শরীর দ্বারা সৃষ্ট। তবু আমরা তো এসব হাতিয়ার (মানে মস্তিষ্ক/আত্মা/ইন্দ্রিয়/শরীর) সৃষ্টি করিনি। যেহেতু আমরা এগুলোর স্রষ্টা নই এবং এ ধরনের জিনিস সৃষ্টির ক্ষমতাও রাখি না, সেহেতু এসব কাজ পুরোপুরিভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয় হতে পারে না। আর এসব হাতিয়ার ছাড়া আমাদের পক্ষে কোনো কর্ম সৃষ্টি করা একেবারেই অসম্ভব।

অতএব, আমরা যে আমাদের কর্মের প্রকৃত স্রষ্টা নই, বরং আল্লাহ-ই প্রকৃত স্রষ্টা, তা আমরা উপলব্ধি বা অনুধাবন করি। আমাদের নিজস্ব

পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য অনুসারে আমরা নিজেদের প্রতিটি ভালো অথবা মন্দ প্রচেষ্টা চালাই, কিন্তু ওই কাজের জ্ঞান-প্রজ্ঞা (হেকমত) আমাদের নিয়্যত তথা উদ্দেশ্যের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না। আমরা স্রেফ আমাদের কর্ম হতে নিঃসৃত জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও ফায়দার অংশটুকুই দেখতে সক্ষম হই। তবে খোদাতা'লা ওই কাজের সামগ্রিক সুবিধা ও তার বহনকৃত ভবিষ্যত ফলাফল সম্পর্কে ভালো জানেন।

উদাহরণস্বরূপ, তোমরা পরবর্তী জগতে পুরস্কার লাভের জন্যে এবং বর্তমান জগতে সুনাম ও নিরাপত্তা অর্জনের খাতিরে সালাত আদায় তথা প্রার্থনা করো। কিন্তু নামায হতে উদ্ভূত সাহায্য তাতে সীমাবদ্ধ থাকে না; এটি আরো এক লক্ষ সুবিধা/ফায়দা মঞ্জুর করে যা তোমরা কখনোই বুঝবে না। আল্লাহ পাক যিনি তোমাদের নামাযকে উন্নীত করেন, কেবল তিনি-ই ওই সব ফায়দা সম্পর্কে সম্যক অবগত।

আমরা আল্লাহর হাতে দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ ধনুকের মতোই। তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন কাজে প্রেরণ করেন (এ দুনিয়ায়)। বাস্তবে আল্লাহ-ই হলেন কর্তা/পরিচালক, ধনুকটি নয়। সেটি স্রেফ একখানি হাতিয়ার, যা খোদাতা'লা সম্পর্কে অনবধান ও অচেতন; যাতে দুনিয়ার বাহ্যিক নিয়ম বজায়/বহাল থাকে। সেই ধনুক-ই মহাশক্তিধর, যেটি ধনুকধারীর হাত সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হয়!

যে জগতের স্থায়িত্ব ও বিন্যাস অমনোযোগিতা বা অসর্তকতার ওপর নির্ভর করে, সেটি সম্পর্কে তোমরা কী-ই বা বলবে? তোমরা কি দেখো না কীভাবে জেগে ওঠা পুণ্যাত্মাবৃন্দ এ জগতের প্রতি অনাসক্ত হয়ে পড়েন? আশৈশব মানুষ অবহেলা ও খেলার ভেতর দিয়ে বেড়ে ওঠে এবং তা হতে শক্তি সঞ্চয় করে। নচেৎ অন্য কীভাবেই বা তারা বেড়ে পুরুষ কিংবা নারীতে পরিণত হতো? অতএব, আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুঃখকষ্ট ও শ্রম-সাধনার মধ্য দিয়ে পরিক্রমণ করিয়ে ওইসব অবহেলামূলক কর্ম হতে আমাদেরকে ধৌত ও পরিচ্ছন্ন করেন। শুধুমাত্র তখন-ই আমরা পরবর্তী জগৎ সম্পর্কে সচেতন হতে সক্ষম হই।

মানব হচ্ছে গোবরের একটি স্তূপের মতো। এই গোবরের স্তূপ যদি মূল্যবান হয়, তবে সেটি এ কারণে যে এর ভেতরে লুকিয়ে আছে মহারাজের (মানে খোদাতা'লার) সীলমোহরের আংটি। তোমরা হলে এক



বস্তা গমের/শস্যের মতো। রাজাধিরাজ (আল্লাহতা'লা) উচ্চস্বরে বলেন, "তোমরা ওই গম/শস্য কোথায় নিয়ে চলেছো? ওতে তো আমার পানপাত্র রয়েছে।" মানুষ শস্যে নিবিষ্ট হওয়ায় ওই পানপাত্র সম্পর্কে একদম অচেতন। তারা যদি পানপাত্রটি সম্পর্কে জানতো, তাহলে শস্য তাদের চিত্তবিক্ষেপ ঘটাতো কীভাবে? এক্ষণে পরবর্তী জগতের প্রতি তোমাদেরকে আকর্ষণকারী প্রতিটি ভাব যা তোমাদেরকে এই নিম্ন জগতের প্রতি অনাসক্ত ও নির্লিপ্ত করে তোলে, তা ওই পানপাত্রের আলোক বিচ্ছুরণেরই প্রতিফলন বটে। তবে নারী ও পুরুষ যখন এই নিম্ন জগতের আকাঙ্ক্ষী হয়, তখন এতে পানপাত্রটির (গোবরের) স্তূপে আড়াল হয়ে থাকার চিহ্ন-ই প্রকাশ পায়।

## উপদেশ বাণী - ৫৫

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) বলেন: "কাজী ইযয আল-দ্বীন তাঁর সালাম জানিয়েছেন, আর তিনি সব সময় আপনার প্রতি সর্বাধিক অনুমোদন তথা সন্তুষ্টি ব্যক্ত করে আপনার কথা বলে থাকেন।"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: যে ব্যক্তিবৃন্দ আমাদেরকে স্মরণ করেন এবং আমাদের সম্পর্কে ভালো বলেন, তাঁদের সদগুণ/যোগ্যতার প্রকাশ হোক দীর্ঘকাল। যখন মানুষ অন্যদের সম্পর্কে ভালো বলেন, তখন ওই ভালো কথাগুলো তাদের নিজেদের ওপরই পুনঃপ্রতিফলিত হয়; আর এর চূড়ান্ত ফলাফলে তারা নিজেদের সত্তারই প্রশংসা করেন এবং নিজেদেরই প্রতি সাধুবাদ জানান। যারা অন্যদের সম্পর্কে ভালো বলার অভ্যেস গড়ে তোলেন, তারা বাগান পরিচর্যাকারীদের মতোই, যারা নিজেদের বাড়ির চারধারে ফুল ও সুবাসপূর্ণ তৃণ রোপণ করে থাকেন। তারা যে দিকেই তাকান, সুন্দর ও মনোরম দৃশ্য দেখতে পান এবং সর্বদা বেহেশতেই অবস্থান করেন।

আমরা যখনই কারো সম্পর্কে ভালো বলি, তৎক্ষণাৎ ওই ব্যক্তি আমাদের বন্ধু হয়ে যান। আমরা তাদেরকে স্মরণ করলে বন্ধুকেই স্মরণ করে থাকি; আর কোনো বন্ধু সম্পর্কে চিন্তা করা ফুল ও সুবাসপূর্ণ তৃণের কাছে অবস্থান করার মতোই ব্যাপার। এটি নবশক্তি বিধান করে এবং বিশ্রামও

দেয়। কিন্তু যখন আমরা কারো সম্পর্কে মন্দ বলি, তখন ওই মানুষেরা আমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণিত বিবেচিত হয়। আমরা তাদের কথা চিন্তা করলে বা তাদের চেহারাও আমাদের ভাবনায় চলে এলে তা সাপ বা বিচ্ছু, কাঁটা বা কাঁটাগাছের মতো আমাদের সামনে দৃশ্যমান হয়।

যেহেতু তোমরা ফুল, সুবাসপূর্ণ তৃণ ও 'বাগে এরাম' তথা বেহেশতের বাগান (খুঁজে) পেতে পারো, সেহেতু কাঁটাঝোপ ও কণ্টকের মাঝে হাঁটাকে পছন্দ করে নেয়া কেন? সবার সম্পর্কে বরঞ্চ নেক/উত্তম চিন্তা করো যাতে তোমরা (বেহেশতের) বাগানে ও প্রান্তরে বিচরণ করতে পারো। একবার তোমরা সবার শত্রুতে পরিণত হলে সাপ ও বিচ্ছুর মতো তোমাদের শত্রুদের চেহারা তোমাদেরকেই রাত-দিন ঘিরে ধরবে।

এই কারণেই সূফী-দরবেশমণ্ডলী সকল মানুষের প্রতি মহব্বত রাখেন এবং যার দেখা পান, তার প্রতি সু-ধারণা পোষণ করেন। এটি অন্যদের খাতিরে নয়, বরং স্রেফ নিজেদের খাতিরেই। যেহেতু এই জগতে কেউই অন্যদের ব্যাপারে কথা বলা থেকে বা তাদের চেহারার মুখোমুখি হওয়া থেকে বাঁচতে পারবেন না, সেহেতু সুফী-দরবেশবৃন্দ নিজেদের মন-মস্তিষ্ক ও স্মৃতিতে সবকিছু বন্ধুসুলভ ও ইতিবাচক দৃষ্টির আলোকে দেখেন, যাতে ঘৃণাপূর্ণ চেহারাগুলো তাঁদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে।

অতএব, তোমরা অন্যদের সম্পর্কে যা বলো, তা তোমাদের দিকেই ফিরে আসে। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন:

> "যে ব্যক্তি করে উত্তম কর্ম পালন,
> তা তারই নিজস্ব অর্জন,
> আর যে ব্যক্তি করে মন্দ কর্ম সংঘটন,
> তাতে তারই হয় ক্ষতি সাধন।
> আর যে ব্যক্তি করে উত্তমকর্মের অণু পরিমাণ,
> সে তার ফলাফল করতে পারবে দর্শন,
> আর যে ব্যক্তি মন্দকর্মের বিন্দুতে করে অবগাহন,
> সে-ও তার ফলাফল করতে পারবে অবলোকন।" [ভাবানুবাদ]

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) একটি কুরআনের আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করেন: "আল্লাহতা'লা ঘোষণা করেন, 'আমি দুনিয়ার বুকে আমার খলীফা



(প্রতিনিধি) প্রেরণ করবো।' ফেরেশতাকুল আরয করেন, 'আপনি কি এমন জাতি সৃষ্টি করতে চান যারা দুনিয়ার বুকে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্ত ঝরাবে? অথচ আমরাই তো আপনার এবাদত-বন্দেগী ও প্রশংসাস্তুতির জন্যে যথেষ্ট'?" অতঃপর ওই প্রশ্নকারী বলেন, "যেহেতু পয়গম্বর আদম (আ:) তখনো এ ধরণীতলে শুভাগমন করেননি, এমতাবস্থায় ফেরেশতাকুল কীভাবে আগাম জানতে সক্ষম হলেন যে মনুষ্যকুল ফাসাদ ও রক্তারক্তি করবে?"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: এর দুই ধরনের ব্যাখ্যা আছে - একটি (ধর্মীয়) ঐতিহ্যনির্ভর (নক্বলী), অপরটি যৌক্তিক (আক্বলী)। ঐতিহ্যনির্ভর ব্যাখ্যা হলো, ফেরেশতাকুল লওহে মাহফূয (মানে খোদাতা'লা কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যলিপি) পাঠ করে জানতে পেরেছিলেন যে এধরনের আচরণকারী একটি জাতি আগমন করবে। পক্ষান্তরে, যৌক্তিক ব্যাখ্যা হলো, তাঁরা চিন্তাভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে এই পৃথিবী হতেই মানুষের আগমন ঘটবে যাদেরকে পৃথিবীরই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে হবে, অর্থাৎ তারা জন্তু-জানোয়ারের মতোই হবে। যদিও আধ্যাত্মিকতার উপাদান - বাকশক্তি - মানবের মধ্যে বিরাজমান থাকবে, তবু যেহেতু তাদের মধ্যে পশুত্ব বিরাজ করবে সেহেতু তারা স্বভাবজাতভাবে অপবিত্র ও রক্তারক্তিপ্রবণ হবে; আর এটি-ই হলো মানবজাতির ঐতিহ্য।

এছাড়াও আরেকটি উত্তর রয়েছে। কিছু মানুষ বলেন যে ফেরেশতাকুল পুতঃপবিত্র ও যুক্তিনির্ভর হওয়ায় যা বলেন বা করেন তাতে তাঁদের কোনো পছন্দ-অপছন্দ নেই; ঠিক স্বপ্নে যেমনটি তোমরা যা বলো বা করো তাতে তোমাদের কোনো নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ নেই। তাহলে তোমাদের স্বপ্নে যদি তোমরা অবিশ্বাস ব্যক্ত করো, কিংবা আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করো, অথবা অবৈধ যৌনাচার সংঘটন করো, এমতাবস্থায় তোমাদেরকে কীভাবে সমালোচনা করা সম্ভব? ফেরেশতাকুল ঘুম থেকে জাগা অবস্থায় এরকমই। মানুষ ঠিক তার উল্টো; তাদের রয়েছে (আংশিক) স্বাধীন ইচ্ছা, তারা সকাম ও আবেগময়, নিজেদের জন্যে সব কিছু কামনাকারী এবং তা অর্জনের জন্যে রক্ত ঝরাতে পর্যন্ত প্রস্তুত।

এগুলো পশুরই বৈশিষ্ট্য। অতএব, ফেরেশতাদের হাল-অবস্থা মানুষের বিপরীত।

ফেরেশতামণ্ডলী এভাবে কথা ব্যক্ত করেছিলেন বলা একদম ঠিক, যদিও তাতে কোনো জিহ্বা বা বচন ছিলো না; কেননা তাঁদেরকে যদি বাকশক্তি দেয়া হতো এবং তাঁরা নিজেদের সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করতেন, তাহলে এভাবেই তাঁরা কথা বলতেন। একইভাবে কবি লেখেন, "হাউজ (জলাধার) বলে, আমি (কানায় কানায়) পূর্ণ।" নিশ্চয় জলাধার বাস্তবে কথা বলতে পারে না, কিন্তু কবি এর দ্বারা বুঝিয়েছেন যে জলাধারের জিহ্বা থাকলে এভাবেই সেটি কথা বলতো।

প্রত্যেক ফেরেশতারই নিজের মধ্যে একটি করে লওহে মাহফূয বিরাজমান, যা তাঁদের নিজস্ব ক্ষমতানুসারে নিজেরাই পাঠ করে দুনিয়ায় কী কী ঘটবে সেসব সম্পর্কে আগাম জানতে পারেন। যখন মুহূর্তটি উপস্থিত হয় এবং তাঁরা যা পড়েছিলেন তা বাস্তবে ফলে যায়, তখন তাঁদের বিশ্বাস আরো মজবুত হয় এবং তাঁদের (খোদা-) প্রেম ও মাস্তি-ও বৃদ্ধি পায়। তাঁরা আল্লাহতা'লার মহিমা ও সর্বজ্ঞতা দর্শনে বিস্ময়াভিভূত হন। প্রেম-মহব্বত ও বিশ্বাসের ওই বৃদ্ধি, ওই নির্বাক ও অপ্রকাশিত বিস্ময়-ই হচ্ছে ফেরেশতাদের দ্বারা খোদাতা'লার প্রশংসাস্তুতি।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো ঘর-বাড়ি নির্মাতা তাঁর অধীনস্থ শিক্ষার্থীদের বলেন, "এই নির্মীয়মান গৃহে এতোখানি কাঠ, এতোখানি ইট, এতোখানি পাথর এবং এতোখানি খড় ব্যবহার করা হবে।" বাড়িটির নির্মাণকাজ শেষ হলে এবং ওই পরিমাণ, তার বেশিও নয়, কমও নয়, নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহৃত হলে শিক্ষানবীশদের বিশ্বাস/আস্থা বৃদ্ধি পায়। ফেরেশতাকুলেরও এক্ষেত্রে একই অবস্থা বিরাজমান।

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) প্রশ্ন করেন: "রাসূলুল্লাহ (দ:) এতো মহিমান্বিত ও মর্যাদার আসনে আসীন যে খোদাতা'লা তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনি না হলে আমি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করতাম না;' অথচ প্রিয়নবী (দ:) বলেন, 'মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর প্রভু (আল্লাহ পাক) যদি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-কে সৃষ্টি না করতেন।' এটি কীভাবে হতে পারে?"



মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: তোমাদের দ্বারা এর অর্থ বোঝার সুবিধার্থে আমি একটি তুলনা/উপমা দিতে চাই। কোনো এক গ্রামে জনৈক ব্যক্তি কোনো এক নারীর প্রেমে পড়েছিলো। এই দম্পতি এক সাথে সুখ-শান্তিতে বসবাস করছিলো। তারা মোটা-তাজা হচ্ছিলো এবং একে অপরের বদৌলতে উন্নতি লাভ করছিলো। তারা পরস্পর পরস্পরের জন্যে জীবন ধারণ করছিলো, ঠিক যেমনটি মাছ পানিতে বাঁচে। এভাবে একত্রে বহু বছর তারা অতিবাহিত করে। অতঃপর একদিন খোদাতা'লা তাদেরকে সম্পদশালী করে দেন; অনেক ভেড়া, ঘোড়া, গরু, সোনা-দানা, সেবক ও গোলাম মঞ্জুর করেন।

এই দম্পতির মহা ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির কারণে তারা শহরের দিকে যাত্রা করে। এদের প্রত্যেকে একটি করে প্রাসাদ ও ঘোড়াসমূহ কেনে এবং নিয়োগ করে লোকলস্কর; নারীটি শহরের এক অংশে বসতি স্থাপন করে, আর পুরুষটি আরেক অংশে। সম্পদের চূড়োয় পৌঁছুনোর পর একে অপরের সঙ্গলাভের আনন্দ হতে তারা হয় বঞ্চিত। তাদের অন্তর ভেতরে ভেতরে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে এবং গোপনে বিলাপও করতে থাকে, বাইরে যদিও কথা বলতে হয় অক্ষম। তাদের অন্তরের দহন এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যে তারা বিচ্ছেদের অনলে পুড়ে খাক হয়ে যায়। তাদের দুঃখ-বেদনা সকল মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। অবশেষে খোদাতা'লা তাদের মনের আকুলতার প্রতি সাড়া দেন।

এমতাবস্থায় ওই দম্পতির ভেড়া ও ঘোড়াগুলো হারিয়ে যেতে থাকে, আর ধীরে ধীরে তারা পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। ফলে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তারা নিজেদের গ্রামের বাড়িতে পুনর্মিলিত হয় এবং আবারো একত্রে সুখ-শান্তিতে বসবাস আরম্ভ করে। তারা যখন বিচ্ছেদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে, তখন তারা আর্তি ব্যক্ত করে, "আমাদের প্রভু (আল্লাহ পাক) যদি কখনোই আমাদেরকে এতো সম্পদ মঞ্জুর না করতেন।"

মহানবী (দ:)-এর পবিত্র রূহ মোবারক যতোক্ষণ (পূর্ববর্তী) পবিত্র জগতে অবস্থান করছিলেন এবং আল্লাহর সাথে ছিলেন, তিনি সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করছিলেন; ওই রহমতের দরিয়ায় ডুব দিচ্ছিলেন, যেমনটি মাছ সাগরে ডুব দেয়। কিন্তু এই পার্থিব জগতে যদিও তিনি খোদায়ী দানস্বরূপ

নবুওয়্যত লাভ করেন এবং মনুষ্যকুলের পথপ্রদর্শক হন, আর মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব, খ্যাতি ও বিপুল সংখ্যক উম্মত-ও তাঁর প্রতি মঞ্জুর করা হয়, তথাপিও তিনি ওই পূর্ববর্তী আনন্দঘন জীবনে ফিরে যেতে বলেন, "আমি যদি পয়গম্বর না হতাম এবং এই জগতে না আসতাম।" [অনুবাদকের নোট: এটি মওলানা রূমী রাহমাতুল্লাহে আলাইহের ব্যাখ্যা]

ভক্তির এই সব বিদ্যা, সাধনা ও আমল খোদাতা'লার (শ্রেষ্ঠ) গুণাবলী ও মহিমার তুলনায় (তাঁর দরবারে) একবার নত হওয়া, কোনো খেদমত পেশ করা এবং (দুনিয়া হতে) বিদায় নেয়ার চেয়ে বেশি কিছু বোঝায় না। আল্লাহতা'লার খেদমতে যদি তোমাদের অন্তর দ্বারা তোমরা এমন কী গোটা দুনিয়াকেও পরিচালিত করো, তবুও তা একবার মাটিতে (তাঁর সামনে) নত হওয়ার সমানই হবে। কেননা খোদাতা'লার গুণাবলী ও দয়া তোমাদের জীবন ও খেদমতের আগেও অস্তিত্বশীল ছিলো। তিনি কি তোমাদেরকে জীবন দান ও অস্তিত্বশীল করেছেন এবং এবাদত-বন্দেগী ও খেদমতের সামর্থ্য দিয়েছেন এই জন্যে যে তোমরা তাঁর খেদমতের বড়াই করবে? এসব সেবা ও বিদ্যা ঠিক যেনো তোমাদের দ্বারা খোদাইকৃত বিভিন্ন আকৃতির কাঠ ও চামড়ার মতোই; অতঃপর সেগুলোকে খোদার সামনে পেশ করে তোমরা বলো, "আমি এসব ছোট ছোট আকৃতির স্রষ্টা। আমি-ই এগুলো তৈরি করেছি, কিন্তু এগুলোতে জীবন দান করা আপনারই কাজ। আপনি এগুলোকে জীবন দিলে আমার কীর্তিকেই অমর করবেন। আবার আপনি তা করতে বাধ্যও নন - (কেননা) এতদসংক্রান্ত আদেশ আপনারই এখতেয়ারে।"

পয়গম্বর ইবরাহীম (আ:) বলেন, "আল্লাহ-ই জীবন ও মৃত্যু দান করেন।" নমরূদ বলে, "আমি জীবন ও মৃত্যু দেই।" আল্লাহতা'লা যখন নমরূদকে রাজত্ব দেন, সে-ও নিজেকে সর্বশক্তিমান ভেবেছিলো; আর এই খোদায়ী বৈশিষ্ট্যকে আল্লাহর প্রতি আরোপ করেনি। নমরূদ বলেছিলো, "আমিও কাউকে কাউকে জীবন দেই এবং কারো কারো জীবন হরণ করি; আর আমার রাজ্যজুড়ে আমি যা আকাঙ্ক্ষা করি, তা আমারই জ্ঞান হতে আবির্ভূত হয়।" আল্লাহতা'লা যখন জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও কূটনীতি মঞ্জুর করেন, তখন মানুষ এর সমস্ত কৃতিত্ব নিজেরাই নিতে চায় এ কথা বলে, "আমার দক্ষতা ও যোগ্যতা দ্বারা আমি এসব কর্মে প্রাণের সঞ্চার



করেছি এবং পরমানন্দ লাভ করেছি।" পয়গম্বর ইবরাহীম (আ:) এ কারণে বলেন, "না, জীবন ও মরণ একমাত্র আল্লাহ পাক-ই দিয়ে থাকেন।"

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) বলেন: "পয়গম্বর ইবরাহীম (আ:) নমরূদকে বলেন, 'আমার প্রভু আল্লাহতা'লা সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদিত করেন এবং পশ্চিম দিকে তার অস্ত ঘটান। তিনি পূর্ব দিক হতে সূর্যোদয় ঘটান। তুমি খোদা দাবিদার হয়ে থাকলে এর উল্টোটি করে দেখাও।" কিন্তু ওই সময় নমরূদ পয়গম্বর ইবরাহীম (আ:)-কে এই যুক্তি পরিত্যাগে বাধ্য করে, আর তিনিও তাঁর প্রথম যুক্তি পরিহার করায় নমরূদের প্রত্যুত্তরকে খণ্ডন না করে আরেকটি প্রমাণ পেশ করেন।"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: এ বিষয়ে অন্যরা আবোলতাবোল কথা বলেছে, আর এখন তোমরাও তা বলছো। পয়গম্বর ইবরাহীম (আ:) দুটি আঙ্গিকে এক ও অভিন্ন যুক্তি-ই পেশ করেছিলেন। তোমরা তা ভুল বুঝেছো, ঠিক যেমনিভাবে ভুল বুঝেছিলো অন্যরাও। (পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের) এই ভাষ্যে অন্তর্নিহিত আছে অনেক অর্থ। সেগুলোর একটি হলো, আল্লাহতা'লা তোমাদের মায়ের গর্ভে অনস্তিত্বশীলতার অন্তরাল হতে তোমাদেরকে প্রকাশ করেছেন। তোমাদের 'পূর্ব দিক' ছিলো তোমাদেরই মায়ের গর্ভ। সেখান থেকে তোমরা উদিত হয়েছো, আর তোমরা অস্ত যাবে তোমাদেরই কবরের (সমাধির) 'পশ্চিম দিক' বরাবর। এটি-ই অবিকল প্রথম বক্তব্যটি, যা বিবৃত হয়েছে আরেকভাবে: "আল্লাহতা'লা জীবন দান করেন এবং মৃত্যুও দেন। এক্ষণে তুমি (নমরূদ) সামর্থ্য থাকলে কবররূপী (সমাধিরূপী) পশ্চিম দিক হতে প্রাণের সঞ্চার করে মাতৃগর্ভরূপী পূর্ব দিকে ফেরত পাঠাও।"

ওপরে প্রদত্ত হয়েছে একটি অর্থ; এখানে আরেকটি অর্থ দেয়া হলো: বাধ্যতা মানে আনুগত্য, শ্রমসাধ্য প্রয়াস তথা সাধনা ও মহৎ/পুণ্যময় কর্ম দ্বারা সূফী-দরবেশবৃন্দ (আধ্যাত্মিকতার) আলো ও আত্মিক ভাবোন্মত্ততা লাভ করে থাকেন। কিন্তু আনুগত্য ও সাধনা পরিত্যাগের দ্বারা তাঁদের সুখ-শান্তি তিরোহিত হয় - ঠিক যেমনিভাবে সূর্য অস্তমিত হয়। অতএব, এই দুটি হাল তথা আধ্যাত্মিক অবস্থা হলো তাঁদের 'পূর্ব' ও 'পশ্চিম।' "সুতরাং তোমরা যদি আল্লাহকে পরিত্যাগ, দুর্নীতি ও (খোদার প্রতি)

অবাধ্যতা দ্বারা জীবনকে মরণের অবস্থায় পরিণত করতে সক্ষম হও, তাহলে এই অস্তগামী রবির দ্বারা (আধ্যাত্মিক) কিরণের বহিঃপ্রকাশও ঘটতে পারে যা স্রেফ আনুগত্যের মাধ্যমেই উদিত হয়।"

তবে এটি তো বান্দার কাজ নয়, আর বান্দা কখনোই তা করতে সক্ষম হবেন না। (বস্তুতঃ) এটি খোদাতা'লার কাজ; কেননা তিনি চাইলে সূর্যকে পশ্চিম দিক হতে উদিত করতে পারেন, আবার পূর্ব দিক হতেও তা পারেন।

ঈমানদার ও অবিশ্বাসী দু জন-ই আল্লাহতা'লার প্রশংসা করেন। কেননা খোদাতা'লা ওয়াদা করেছেন যে কেউ পবিত্র বিধান ও আম্বিয়া-আউলিয়াবৃন্দের অনুসরণ করে সঠিক রাস্তা বেছে নিলে এবং সেই মোতাবেক আমল তথা পুণ্যদায়ক কর্ম অনুশীলন করলে তাঁর প্রতি সুখ-শান্তি, (আধ্যাত্মিক) জ্যোতির্ময়তা ও জীবন মঞ্জুর করা হবে। পক্ষান্তরে, তারা এর উল্টোটি করলে তাদেরকে মঞ্জুর করা হবে (গোমরাহীর) অন্ধকার ও শঙ্কা, (অধঃপতনের) গর্ত ও দুঃখকষ্ট। যেহেতু ঈমানদার ও অবিশ্বাসী উভয়ই নিজ নিজ পছন্দ মাফিক (পথ) বেছে নেন, আর খোদাতা'লা যা বিধান করেন তার বেশিও নয়, কমও নয় জারি হয়ে যায়, সেহেতু তাঁরা দু-জনই আল্লাহর প্রশংসা করে থাকেন; ঈমানদার তা করেন এক (রকম) জিহ্বা দ্বারা, আর অবিশ্বাসী আরেক (ধরনের) জিহ্বা দ্বারা। এতে একজনের প্রশংসা হতে অপর জনের প্রশংসার কতোই না মহা পার্থক্য ঘটে থাকে!

উদাহরণস্বরূপ, কোনো চোর চুরি করার দায়ে ফাঁসিতে ঝুলে। সে পৃথিবীর জন্যে একজন প্রচারক বটে, যে বলে: "চুরি যারা করে, তাদের এই অবস্থা হয়।" আর অপরজন তথা পুণ্যাত্মার বিশ্বস্ততার খাতিরে রাজাধিরাজ (খোদাতা'লা) মহাসম্মানের চাদর/আলখাল্লা মঞ্জুর করেন। এঁরাও পৃথিবীর জন্যে প্রচারক বটেন। কিন্তু চোর প্রচার করে এক (ধরনের) জিহ্বা দ্বারা, আর (খোদার) আস্থাভাজন বান্দা/পুণ্যাত্মা (সূফী/দরবেশ) তা করেন আরেক রকম জিহ্বা দ্বারা। এমতাবস্থায় এই দুইজন প্রচারকের মধ্যকার পার্থক্যটুকু (তোমরা) বিচার-বিবেচনা করো!



## উপদেশ বাণী - ৫৬

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: তোমরা এক্ষণে সুখ-শান্তির অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছো। কেন? তা এ কারণে যে মন-মস্তিষ্ক একটি সূক্ষ্ম বস্তু, আর এটি শিকার ধরার জন্যে পেতে রাখা মোক্ষম ফাঁদের মতোই। তোমরা যদি সুখি না হও, তাহলে ফাঁদটি টুটে যায় এবং ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

অতএব, অন্যদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মহব্বত বা ঘৃণা পোষণ করা উত্তম নয়; কেননা এগুলোর দুটোই ফাঁদটিকে ভগ্ন ও টুটা রেখে যায়। মধ্যম রাস্তাই হলো সেরা। মাত্রাতিরিক্ত মহব্বত বা ভালোবাসা বলতে আমি বুঝিয়েছি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি প্রেম। খোদার প্রতি এশক্-মহব্বত কীভাবে মাত্রারিক্ত হতে পারে? এটি ধারণাতীত - (বরঞ্চ) আল্লাহর প্রতি যতো বেশি হবে আমাদের ভালোবাসা, ততোই মঙ্গল।

তথাপি কারো প্রতি যখন আমাদের মহব্বত মাত্রাতিরিক্ত হয়, আমরা স্রেফ সৌভাগ্যের অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে তারই খাতিরে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাই। কিন্তু তা তো অসম্ভব, আর তাই মন-মস্তিষ্ক বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে, শত্রুতা যখন মাত্রাতিরিক্ত হয়, তখন আমরা ওই ব্যক্তির দুর্ভাগ্য ও অকল্যাণ কামনা করি; কিন্তু (ভাগ্যের) ঐশী চাকা প্রতিনিয়ত ঘূর্ণায়মান; আর তাই প্রত্যেকের পরিস্থিতিও আবর্তমান। এক মুহূর্তে তারা ভাগ্যবান হলে পর মুহূর্তেই ভাগ্যাহত, আর এটি মস্তিষ্কের কাছে অন্যায্য ও অশান্তিময়।

তবে খোদার প্রতি এশক্-মহব্বত সকল মানবের মাঝেই সুপ্ত; তারা হোন মজূসীয়া (অগ্নি উপাসক), ইহুদী, খৃষ্টান কিংবা সমস্ত অস্তিত্বশীল সত্তা। তাদেরই অস্তিত্বের উৎস - খোদাতা'লাকে - কীভাবে ভালো না বেসে কেউ থাকতে পারেন? অতএব, মহব্বত প্রত্যেকের মাঝেই সুপ্ত; কিন্তু পরিস্থিতি-পরিবেশ ওই প্রেমকে পর্দার অন্তরালে আড়াল করে রাখে। সে সব পরিস্থিতি যখন পরিবর্তিত হয়, তখনই ওই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

তবে আমি কেন শুধু সেসব বস্তুর কথা বলছি যেগুলোর (অস্তিত্বশীল) সত্তা আছে? অস্তিত্বহীন (জড়) বস্তু-ও (আপন) অস্তিত্ব মঞ্জুর হবার আশায়

মন্থন করছে। এ রকম বস্তু চারজন মানুষের মতোই, যারা রাজাধিরাজের (মানে খোদার) সামনে দণ্ডায়মান - প্রত্যেকেই এই আশা করছে যে রাজাধিরাজ তাদেরকে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ মক্বাম মঞ্জুর করবেন, অথচ প্রত্যেকেই অপর তিনজনের কাছে লজ্জিত; কেননা তাদের নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষা একে অপরের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। এভাবেই তারা দাঁড়িয়ে আছে খোদাতা'লার দ্বারা অস্তিত্ব খুঁজে পাবার নানা প্রত্যাশা নিয়ে; কিন্তু প্রত্যেকে প্রথম হবার আকাঙ্ক্ষা লালন করায় একে অপরের সামনে বিব্রত। যদি অস্তিত্বহীন বস্তুগুলোই এ রকম একটি পরিস্থিতিতে অবস্থান করে, তাহলে অস্তিত্বশীল সত্তাদের কী অবস্থা হওয়া উচিত?

"এমন কিছুই নেই যা তাঁর (মানে আল্লাহর) প্রশংসা না করে।" [সরাসরি অনুবাদ]

অতএব, এটি (অর্থাৎ, অস্তিত্বশীল সত্তাদের বিষয়টি) অসাধারণ বা চমকপ্রদ কিছু নয়। যেটি চমকপ্রদ তা হলো এই যে, এমন কী অস্তিত্বহীন বস্তু-ও তাঁর (খোদার) প্রশংসামুখর।

"ঈমান ও অবিশ্বাস দু'য়েই তব অন্বেষণকারী,
তব একত্বের ঘোষণা উভয়েই করে জারি।"

এই ঘরটি বিস্মৃতি হতে তৈরি। এই বিস্মৃতি দ্বারাই এ জগতের সকল দেহ ও আকৃতি বজায় রাখা হয়েছে। এমন কী আমাদের পুরোপুরিভাবে বেড়ে ওঠা শরীরও বিস্মৃতি দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু খোদাতা'লার যিকর বা স্মরণ বিস্মৃতি ছাড়া অস্তিত্বশীল হতে পারে না; কেননা কোনো কিছুকে অবশ্যই বিস্মৃত হওয়া চাই সেটির স্মরণ কায়েম হবার আগে। অতএব, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস এক ও অভিন্ন, কেননা একটি অপরটি ছাড়া অস্তিত্বশীল নয়। সেগুলো অবিভাজ্য, আর খোদাতা'লা হলেন এক। তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং তাঁর কোনো শরীক বা অংশীদার নেই।

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) বলেন: "সাইয়্যেদ বুরহানউদ্দীন বেশ ভালো ধর্মালোচনা বা বয়ান করেন, তবে তিনি ঘনঘন সানা'ঈর উদ্ধৃতি দেন।"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: তুমি যা বলেছো তা সত্য; সূর্য চমৎকার, তথাপি এটি আলো দেয়। তা কি কোনো ত্রুটি? সানা'ঈর কথা তার (বুরহানউদ্দীনের) আলোচনার ওপর আলো ফেলে। সূর্য বিভিন্ন বস্তুর



ওপর আলো ফেলে, আর সেই আলো দ্বারা (সেগুলো) দেখা সম্ভব হয়। আলোর উদ্দেশ্য হলো দেখা। আমাদের আসমানে অবস্থিত এই রবি সেসব বস্তুকে আলোকিত করে, যেগুলোর কোনো ব্যবহার বা প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রকৃত সূর্য ব্যবহার উপযোগী জিসিগুলো প্রদর্শন করে থাকে। এই দুনিয়াবী সূর্য (মূলেরই) একটি প্রতিফলন ও উপমা। প্রকৃত সূর্য হলো আসল সূর্য। তোমরা কি আসল সূর্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা রাখো এবং জ্ঞানের আলো অন্বেষণ করো? যদি করো, তাহলে প্রত্যেক শিক্ষক ও প্রত্যেক বন্ধুর কাছ থেকে শেখার ও বোঝার প্রত্যাশী হও।

আমরা (সূফী/দরবেশমণ্ডলী) আমাদের বস্তু-জগতের এ সূর্যটির পাশাপাশি ওই অন্য সূর্যটি সম্পর্কেও জানি, যা হতে বাস্তবতা ও অভ্যন্তরীণ সত্যগুলো প্রকাশ পায়। অথচ এই আংশিক জ্ঞান যা তোমাদেরকে কাছে টানে এবং যা দ্বারা তোমরা আনন্দ অনুভব করো, তা স্রেফ ওই মহা জ্ঞানের একটি শাখা এবং ওরই একটি রশ্মি। এই রশ্মি তোমাদেরকে মৌলিক সূর্যের দিকে আহ্বান করে চলেছে।

"তারা, যাদেরকে দূরের একটি স্থান হতে আহ্বান করা হয়।" [সরাসরি অনুবাদ]

তোমরা ওই জ্ঞানকে তোমাদের কাছে টানতে চেষ্টা করো, কিন্তু সেটি তোমাদের প্রতি উত্তর দেয়, "আমাকে এই জগতে ধারণ করা যাবে না; এটি অসম্ভব, আর তোমরা আমার কাছে পৌঁছুনো কঠিন হওয়ার কারণে এতো দীর্ঘকাল দূরে ছিলে।" এক্ষণে যা অসম্ভব, তা তো অসম্ভবই। তবে যা কঠিন বা কষ্টসাধ্য, তা অসম্ভব কিন্তু নয়। অতএব, ওই মহা জ্ঞানকে অর্জনের জন্যে সংগ্রাম করো, কিন্তু তাকে এখানে ধারণ করার আশা কোরো না। ধনী জনেরা খোদার ধন-সম্পদের প্রতি মহব্বত রাখার দরুন পাই পাই করে কিংবা শস্যের প্রতিটি দানা গোনে গোনে জমান। কিন্তু সম্পদের রশ্মি বলে, "আমি অসীম সম্পদ হতে তোমাদেরকে আহ্বান করছি। তোমরা কেন তাহলে আমাকে খণ্ডিত টুকরোর আকারে চিত্রায়িত করতে প্রয়াস পাচ্ছো? আমাকে তো খণ্ডিত টুকরোয় ধারণ করা যাবে না। আমার কথা শোনো এবং অফুরন্ত ধন-সম্পদের দিকে আমায় অনুসরণ করো।"

সংক্ষেপে, সূচনা পরিসমাপ্তির ওপরই নির্ভর করে; তাই অন্তিমলগ্ন যেনো হয় প্রশংসনীয়! প্রশংসনীয় পরিসমাপ্তি আসলে কী? সেটি হলো ওই বৃক্ষ

যার শেকড় আধ্যাত্মিক বাগানে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত; যার ডাল-পালা ও ফল আরেকটি রাজ্যের ওপর ঝুলে আছে, আর যার ফলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে এমনভাবে যে শেষমেশ ওইসব ফলকে সেই মূল শেকড়-প্রোথিত বাগানে বহন করে ফেরত নিতে হয়। কিন্তু কোনো গাছের শেকড় যদি এই জগতের অধীন হয়, যদি সেটি বাহ্যিকভাবে আল্লাহর প্রতি প্রশংসার দাবিদারও হয়, তথাপি সেটির সমস্ত ফল এই দুনিয়াতেই বহন করে ফেরত আনতে হবে। অপর দিকে, শেকড় ও ফল উভয়-ই যদি হয় আধ্যাত্মিক বাগানের, তাহলে তা হবে 'নূরুন 'আলা নূর' (আলোর ওপর আলো)।

## উপদেশ বাণী - ৫৭

আকমাল-উদ্-দ্বীন (দরবারি মজলিশে) বলেন: "আমি আমাদের শায়খকে ভালোবাসি এবং তাঁকে দেখার আকাঙ্ক্ষী। এমন কী বেহেশত-ও আমার মস্তিষ্ক হতে মুছে ফেলা হয়েছে। কোনো আলাপ-আলোচনা (ওয়ায-নসীহত) বা উচ্চপর্যায়ের চিন্তার প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই তাঁর চেহারা মোবারকের (ধ্যানের) মাঝে আমি শান্তি ও স্বস্তি খুঁজে পাই। আমি তাঁর জামাল তথা সৌন্দর্যে বিভোর। (কেননা) তাঁর খোদ চেহারা মোবারক, এমন কী মনে অঙ্কিত তাঁর চেহারা মোবারকের একটি ছবি থেকেও আমার সমস্ত তৃপ্তি লাভ হয়।" [বঙ্গানুবাদকের নোট: এটি পরম এক সুখানুভূতি যার স্বাদ গ্রহণ না করা হলে জানা যায় না - মান লাম এয়াযূক্ব লাম এয়াদরী]

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: যদিও তোমার চিন্তায় বেহেশ্‌ত ও খোদাতা'লার কথা প্রবেশ করে না, তবুও ভালোবাসায় তা অন্তর্নিহিত রয়েছে। একবার এক সুন্দরী নর্তকী কোনো এক খলীফার (শাসকের) উপস্থিতিতে (নিজের বাজানো) করতালবিশেষের তালে তালে নাচছিলো। খলীফা তাকে বলেন, "তোমার নৈপুণ্য তোমার হাতেই বিদ্যমান।" সে উত্তর দেয়, "না, তা আমার পায়ে বিদ্যমান, হে মহান খলীফা! আমার হাতে যে উৎকর্ষ দৃশ্যমান, তা স্রেফ এ কারণে যে সেগুলো (মানে দু হাত)



আমার দু পায়ের উৎকর্ষকে আয়ত্ত করতে পেরেছে (মানে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে)।"

তোমরা যদিও বেহেশতকে বিস্তারিতভাবে স্মরণ করতে পারো না, তবুও শায়খকে দেখতে পাওয়ার মাঝে তোমাদের আনন্দ এবং তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ব্যাপারে তোমাদের আশঙ্কা-ই (বেহেস্তের) ওই সব বিস্তারিত বিবরণ ধারণ করে। জান্নাতের সমস্ত কিছুই ওই প্রতিরূপে ফুটে ওঠে।

কোনো পরিবারে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে ভালোবাসে। তাদের পারস্পরিক স্নেহ-মমতা ও বিশ্বস্ততা, দরদ ও অনুরাগ এবং অন্যান্য সব কল্যাণ, যা এক আত্মীয় অপর আত্মীয়ের কাছ থেকে আশা করে, তা যদি তাদের মস্তিষ্কে না-ও প্রবেশ করে, তবুও এসব বিস্তারিত বিষয় তাতে অন্তর্নিহিত থাকে। একইভাবে, কাঠের মধ্যে বায়ু/বাষ্প আছে - ওই কাঠ মাটির নিচে প্রোথিত-ই হোক, বা হোক পানিতে ভেজা। কাঠের মধ্যে অবস্থিত বায়ু/বাষ্প ছাড়া তার (মানে কাঠের) ওপর আগুনের কোনো প্রভাবই পড়বে না; কেননা বায়ু/বাষ্প হচ্ছে আগুনের জ্বালানি শক্তি - আগুনেরই প্রাণ। তোমরা কি দেখো নি বায়ু/বাষ্পের এক সঞ্চরণ কীভাবে আগুনের মাঝে প্রাণের সঞ্চার করে? অতএব, পানি বা মাটিতে কাঠ থাক বা না-ই থাক, তথাপিও বায়ু/বাষ্প তাতে সুপ্ত রয়েছে। বায়ু/বাষ্প তাতে সুপ্ত না থাকলে কাঠ কখনোই পানিতে ভেসে উঠতো না।

তোমরা যে কথা বলো, সেসব শব্দের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। অনেক কিছু ওইসব কথায় ধারণ করা হয়েছে, যেমন - বুদ্ধি ও চিন্তা, ঠোঁট ও মুখ, গলা ও জিহ্বা; এর পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন উপাদান ও মানসিক মেজাজ, গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব এবং লাখ খানেক আনুষঙ্গিক কারণ যার ওপর এই জগৎ নির্ভর করে। এভাবে তোমরা কথা বলে যেতে পারো, যতোক্ষণ না তোমরা সিফাত তথা বৈশিষ্ট্যের জগতে এসে উপস্থিত হও এবং তারপর সত্তার জগতে - যদিও এসব বাস্তবতার কোনোটি-ই কথায় রূপান্তর করা হয়নি, তবুও তোমাদের কথার মধ্যে সবই অন্তর্নিহিত রয়েছে। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা ব্যতিরেকে প্রতিদিন-ই অনাকাঙ্ক্ষিত ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাসমূহ আমরা সঞ্চয় করে থাকি। নিশ্চয় এসব বিষয় নিজেদের মাঝে অন্তর্নিহিত বার্তাসমূহ বহন করে যা আমাদের পক্ষে

সৃষ্টিরও অতীত। আমরা এমন কারো নিয়ন্ত্রাধীন যিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে; এমন কেউ যিনি (সব কিছু) পাহারা দিয়ে রেখেছেন। অনেকের ক্ষেত্রে মন্দ কর্ম ব্যথা বয়ে আনে। কিন্তু এসব অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় সত্ত্বেও আমাদের প্রকৃতি এই চিন্তাকে গ্রহণ বা স্বীকার করতে চায় না যে আমরা অন্য কারোর নিয়ন্ত্রাধীন।

ঐশী গুণ যা গোলামির বিপরীত, তা আমাদেরকে ধার দেয়া হয়। আমাদেরকে মাথার ওপরে পেটানো হতে পারে, তথাপিও আমরা আমাদের ধার করা একগুঁয়েমি পরিত্যাগ করতে নারাজ। আমরা অনাকাঙ্ক্ষিত অভিজ্ঞতাগুলো ভুলে যাই, আর আমরা সেগুলোর বার্তা নাও শুনতে পারি। যতোক্ষণ না ওই ধার করা ঐশী গুণ আমাদের নিজস্ব হয়, ততোক্ষণ আমরা চপেটাঘাত থেকে রেহাই পাবো না।

## উপদেশ বাণী - ৫৮

মওলানা রূমী (রহ:) বর্ণনা করেন: কোনো এক সূফী/দরবেশ একবার বলেছিলেন, "আমি নিজের অন্তরকে সম্প্রসারণ করতে হাম্মাম তথা উষ্ণ পানির গোসলখানায় গিয়েছিলাম; কেননা হাম্মামখানা নির্দিষ্ট কয়েকজন দরবেশের ধ্যান-সাধনার নির্জনবাসে পরিণত হয়েছিলো। আমি দেখতে পেলাম যে গোসলের পানি গরম করার উনুনের প্রধানকর্তার সাথে একজন শিক্ষানবীশ কর্মরত। শিক্ষক তার শিক্ষানবীশকে হুকুম দিচ্ছিলেন - 'এটি করো', 'ওটি করো'। শিক্ষানবীশ দ্রুত কাজ করে চলেছিলো, আর উনুনটিও বেশ তাপ ছড়াচ্ছিলো এই কারণে যে, হুকুম খুবই ক্ষিপ্রগতিতে পালিত হচ্ছিলো।

"এমতাবস্থায় হাম্মামখানার প্রধানকর্তা বলেন, 'উত্তম। এ রকম সক্রিয়তা বজায় রাখবে। তুমি যদি সব সময় তেজোময় হও এবং তোমার আদবশীলতা বজায় রাখো, তাহলে আমি তোমাকে আমার পদটি দান করবো, আর আমার নিজের পদে তোমায় নিয়োগ দেবো।'

অতঃপর ওই সূফী/দরবেশ বলেন, "এতে আমি হাসি সম্বরণ করতে পারিনি। আর এর ফলে আমার অন্তঃস্থ জট-ও খুলে যায়; কেননা আমি



দেখতে পাই যে এই জগতের প্রধানকর্তাবর্গ সবাই তাঁদের শিক্ষানবীশদের সাথে এ রকমই আচরণ করেন।"

## উপদেশ বাণী - ৫৯

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) বলেন: "জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, আপনারা (মানে ধর্মতাত্ত্বিকবৃন্দ) দাবি করেন এই আসমান ও পৃথিবীর ঊর্ধ্বে কিছু একটি বিরাজমান। আমাদের চোখে আমরা যা দেখতে পাই, তার বাইরে কোনো কিছুই অস্তিত্বশীল নয়; এতে আমরা (পূর্ণ) বিশ্বাস করি। যদি কিছু অস্তিত্বশীল থেকেই থাকে, তাহলে আমাদেরকে দেখান তা কোথায় অবস্থিত!"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: আপনাদের দাবি বিসমিল্লাতেই গলদ তথা শুরুতেই অচল! আপনারা বলছেন, 'তা কোথায় আমাদেরকে দেখান,' অথচ ওই (মহান) সত্তার কোনো স্থান নেই। তাহলে আসুন, কোথায় আপনাদের আপত্তি আমায় তা বলুন। এটি কি আপনাদের জিহ্বায়, না মুখে, না আপনাদেরই অন্তস্তলে? এগুলোর সবের মাঝে খোঁজ করুন, টুকরো টুকরো করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে, তবুও আপনারা খুঁজে পাবেন না আপনাদের আপত্তিকে, পাবেন না আপনাদের ভাবনাকেও। এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে চিন্তার কোনো স্থান নেই। যেহেতু আপনাদের নিজেদের ভাবনার স্থানটিকেই আপনারা জানেন না বা চেনেন না, এমতাবস্থায় চিন্তার স্রষ্টার স্থানটিকে আপনারা জানবেন কী করে?

আপনাদের পছন্দ ছাড়াই হাজার হাজার আবেগ ও মনের ভাব আপনাদেরকে আপ্লুত করে; কেননা সেগুলো আপনাদের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আপনারা যদি জানতেন কোথা থেকে এসব আবেগ আগমন করে, তাহলে আপনারা সেগুলোকে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হতেন। এসব আবেগ আপনাদের ওপর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়, অথচ সেগুলো কোত্থেকে আগমন করছে, কোথায় যাচ্ছে, আর সেগুলো কী করবে, এ ব্যাপারে আপনারা একেবারেই অনবধান। যেহেতু আপনারা আপনাদের

নিজেদের মন-মেজাজই ভেদ করতে অপারগ, সেহেতু আপনাদের স্রষ্টার রহস্যকে ভেদ করার ব্যাপারে আপনারা কীভাবে আশা করতে পারেন?

ওই সব অসতী রমনীর পুত্র বলে, "খোদাতা'লা আসমানে নন।" ওহে ইতর লোক সকল, তোমরা কীভাবে জানলে তিনি সেখানে নন? হ্যাঁ, তোমরা আসমানকে এক-এক বিঘত করে মেপেছো, তোমরা তা চষে বেড়িয়েছো, অতঃপর তোমরা উচ্চারণ করছো, 'খোদাতা'লা আসমানে নন।' কেন, তোমরা তো তোমাদের নিজেদের ঘরে অবস্থিত অসতী রমনীকেও চেনো না, তোমরা কীভাবে আসমান সম্পর্কে জানতে পারবে? হ্যাঁ, তোমরা আসমান সম্পর্কে, তারকা ও গগনমণ্ডলের নামগুলো সম্পর্কে শুনেছো। তোমরা ভেবেছো, তা মহা কিছু একটি হবে। তোমরা যদি সত্যি আসমানের গভীরতা ভেদ করতে পারতে, কিংবা একটি কদম-ও ওপরে উঠতে পারতে, তাহলে তোমরা এ রকম আজেবাজে কথা কখনোই উচ্চারণ করতে না।

আমরা যখন বলি খোদাতা'লা আসমানে নন, তখন আমরা বোঝাই না যে খোদাতা'লা আসমানে নন। (ওই কথা দ্বারা) আসলে আমরা বোঝাই আসমান খোদাতা'লাকে ধারণ করতে পারে না; অপর দিকে আল্লাহ সবই ধারণ করেন (মানে নিয়ন্ত্রণ করেন)। আল্লাহতা'লার রয়েছে আসমানের সাথে একটি অবর্ণনীয় সংযোগ, ঠিক যেমনি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন তোমাদের সাথে একটি অবর্ণনীয় সংযোগ। আল্লাহর সর্বশক্তির করায়ত্তে রয়েছে সব কিছু, তাঁরই সৃষ্টিশীলতা ও নিয়ন্ত্রণাধীন সব। অতএব, খোদাতা'লা যেমন আসমানসমূহ ও বিশ্বজগতের বাইরে নন, তেমনি তিনি পুরোটুকু সেগুলোর ভেতরেও নন। আরেক কথায়, এসব বস্তু আল্লাহকে অনুধাবন করে না, অথচ আল্লাহ সবাইকেই বোঝেন।

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) প্রশ্ন করেন: "আসমান, জমিন ও আরশের অস্তিত্বের আগে খোদাতা'লা কোথায় অস্তিত্বশীল ছিলেন?" মওলানা রূমী (রহ:)-এর জনৈক ছাত্র উত্তর দেন: "এই প্রশ্নটি শুরুতেই অচল, কেননা খোদাতা'লা এমন এক সত্তা যাঁর কোনো স্থান নেই" (মানে তিনি স্থান-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে)।

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: তুমি জিজ্ঞেস করেছো, "এ সবের আগে আল্লাহ পাক কোথায় অবস্থিত ছিলেন।" তুমি কি তোমার মাঝে সকল



বস্তুর (নির্দিষ্ট) স্থান খুঁজে পেয়েছো যে তুমি খোদার স্থান তালাশ করছো? যেহেতু তোমার মনের ভাব ও চিন্তার কোনো (নির্দিষ্ট) স্থান নেই, এমতাবস্থায় আল্লাহর জন্যে একটি (নির্দিষ্ট) জায়গা কল্পনীয় হতে পারে কীভাবে? নিশ্চয় চিন্তার স্রষ্টা চিন্তার চেয়েও সূক্ষ্ম হবেন। উদাহরণস্বরূপ, যারা কোনো গৃহ নির্মাণ করেন, তারা ওই ঘর হতে অধিকতর সূক্ষ্ম বটেন; কেননা তারা এক শটি অন্য ধরনের ঘরবাড়ি পরিকল্পনা করে তৈরি করতে সক্ষম, আর সেগুলোর প্রতিটি-ই সর্বশেষটির চেয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অতএব, সেগুলো যে কোনো অট্টালিকা হতে সূক্ষ্মতর ও উন্নততর; কিন্তু এই সূক্ষ্মতা শুধু তখনই দৃষ্টিগোচর হয়, যখন তারা কোনো গৃহ নির্মাণ করেন এবং তাদের কাজ দৃশ্যমান পৃথিবীতে প্রবেশ করে।

তোমাদের নিঃশ্বাস শীতকালে দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু গ্রীষ্মে তা অদৃশ্য থাকে। এর মানে এই নয় যে, তোমাদের নিঃশ্বাস গরমকালে বন্ধ করে দেয়া হয়; বরঞ্চ গ্রীষ্মে তোমাদের নিঃশ্বাস সূক্ষ্মতর হয় এবং তা চোখে দেখা যায় না। একইভাবে, তোমাদের গুণগত বৈশিষ্ট্য ও মৌলিক উপাদানও খুব সূক্ষ্ম যে দেখা যাবে, যতোক্ষণ না তোমরা কোনো কর্ম সম্পাদন করো। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তোমাদের মাঝে ক্ষমাশীলতার অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু তা দৃশ্যমান হবে না - যতোক্ষণ না তোমরা কোনো অপরাধীকে ক্ষমা করো। এরপরই তোমাদের ক্ষমাশীলতা দৃশ্যমান হয়। অনুরূপভাবে, তোমাদের মধ্যকার প্রতিশোধপরায়ণতাও দেখা যায় না; কিন্তু যখন তোমরা অপরাধীদের ওপর প্রতিশোধ নাও এবং তাদেরকে প্রহার করো, তখনই কেবল তোমাদের প্রতিশোধপরায়ণতা দেখা যায়।

খোদাতা'লার পরম সূক্ষ্মতার কারণে তাঁকে দেখা যায় না। তাই তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যাতে তাঁর সর্বময় ক্ষমতা ও (বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সূক্ষ্ম) হস্তশিল্প দৃশ্যমান হয়।

এই যে (উপদেশ) বাণী আমাকে দেয়া হয়েছে (তোমাদের সাথে) ভাগাভাগি করার জন্যে, এগুলো আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নয়; আর তাই আমি বেদনার্ত। কেননা আমি আমার প্রিয়পাত্রদেরকে পরামর্শ দিতে পছন্দ করি, কিন্তু যেভাবে আমি চাই সেভাবে কথা বেরোয় না। এমতাবস্থায় এটি ব্যথাতুর করে তোলে আমায়। কিন্তু যেহেতু এসব বাণী আমার চেয়ে উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন, আর আমিও এগুলোর অধীন, সেহেতু আমি সুখি।

কেননা খোদাতা'লা যে বাণী উচ্চারণ করেন, তা যেখানেই যায় জীবন সঞ্চার করে এবং একটি গভীর ছাপও ফেলে।

"ওয়া মা রামাইতা ইয্ রামাইতা, ওয়া লাকিন্নাল্লাহা রামা"
"হে রাসূল, আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন যবে,
আপনি তো ছুঁড়েননি, খোদা-ই ছুঁড়েছিলেন বটে।" [ভাবানুবাদ]

যে তীর খোদার ধনুক হতে ছুটে বেরিয়ে যায়, তাকে কোনো ঢাল বা বর্ম-ই আটকাতে পারে না। অতএব, আমি সুখি।

আমরা যদি যা জানার সবই জেনে যেতাম এবং সমস্ত অজ্ঞতাই অপসারিত হতো, তাহলে আমরা ক্ষয়প্রাপ্ত হতাম এবং (দুনিয়াতে) আমাদের অস্তিত্ব-ও বিলুপ্ত হতো। অতএব, অজ্ঞতা একটি উত্তম বস্তু, যেহেতু এর দ্বারাই এ জগৎ অস্তিত্বশীল রয়েছে। জ্ঞানও কাঙ্ক্ষিত বটে, কেননা এটি খোদাতা'লা সম্পর্কে সচেতনতার দিকে (আমাদেরকে) পরিচালিত করে। ফলে এগুলো একে অপরের সহযোগী, আর সকল বিপরীত বস্তুই এতে যুক্ত রয়েছে। রাত যদিও দিনের বিপরীত, তবুও তারা (পরস্পর) সহযোগী এবং উভয়ে একই কর্ম সংঘটনকারী। রাত যদি চিরস্থায়ী হতো, তাহলে আমাদের চোখ ঝলসিত হতো এবং আমাদের মাথাও খারাপ হয়ে যেতো। তাই আমরা রাতে বিশ্রাম নেই এবং নিদ্রা যাই, আর আমাদের মস্তিষ্ক, চিন্তাভাবনা, হাত-পা, শ্রবণ ও দর্শনক্ষমতা সবই শক্তি সঞ্চয় করে। দিনে এগুলো ওই শক্তি ব্যয় করে থাকে।

অতএব, সব বস্তু-ই (পরস্পরের) বিপরীত হিসেবে দৃশ্যমান হয়, কিন্তু জ্ঞানী-গুণীজনের কাছে এগুলোর সবই একত্রে কাজ করে এবং (মূলতঃ) একে অপরের বিরোধী নয়। তোমরা জগতে আমায় এমন একটি মন্দ দেখাও, যেটি ভালাই-বিহীন; কিংবা এমন কোনো মঙ্গল দেখাও যা মন্দবিহীন। উদাহরণস্বরূপ, কাউকে হত্যা করতে সংকল্পবদ্ধ কোনো ব্যক্তি ওই ব্যক্তির স্ত্রীকে নিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, যার ফলশ্রুতিতে সে আর রক্তপাত ঘটায় না। নিঃসন্দেহে ওই ব্যক্তির স্ত্রীকে কেড়ে নেয়া একটি মন্দ কাজ, কিন্তু যেহেতু এতে নারীটির স্বামীর প্রাণ রক্ষা পায়, সেহেতু নারীটিও এতে ভালো দেখতে পান। অতএব, মন্দ ও উত্তম এক ও অবিচ্ছেদ্য।



মজূসীয়া তথা অগ্নি উপাসকদের সাথে এখানেই আমাদের মূল বিবাদ। তারা বলে, খোদা দু জন: ভালোর স্রষ্টা একজন, আর মন্দের স্রষ্টা অপর জন। আমাকে মন্দ ছাড়া ভালো প্রদর্শন করো, তাহলেই আমি স্বীকার করবো ভালোর একজন স্রষ্টা ও মন্দের একজন স্রষ্টা বিরাজমান! এটি অসম্ভব, কেননা ভালো কখনো মন্দ ছাড়া অস্তিত্বশীল হতে পারে না। যেহেতু এই দুইয়ের মাঝে কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই, সেহেতু দুইজন স্রষ্টা হতে পারেন কীভাবে?

আমরা কি তোমাদের বিরোধিতায় তর্ক-বিতর্ক করছি না? সর্বতোভাবে আমরা তাই করছি। কিন্তু আমরা এই বিষয়টিকে বেশি দূর এগিয়ে নেবো না, কেননা তোমরা হয়তো ভাবতে পারো মজূসীয়া গোষ্ঠী আবার সঠিক কি না। আমি যা বলেছি তা ভুল কি না, সে ব্যাপারে যখন তোমরা নিশ্চিত নও বলে মঞ্জুর/গৃহীত, এমতাবস্থায় তা যে সঠিক নয় সে ব্যাপারেই বা কীভাবে তোমরা নিশ্চিত হলে? ওহে হতভাগ্য অবিশ্বাসীর দল, হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন, "আমরা যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছি, তা সত্য হতে পারে মর্মে বোধোদয় কি তোমাদের এখনো হয়নি, আর তোমাদের কল্পনার অতীত শাস্তি যে অবিশ্বাসীদের প্রতি পতিত হতে পারে, তাও কি তোমরা উপলব্ধি করতে পারো নি? তাহলে কেন তোমরা সাবধান হও না এবং আমাদের তথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দ:)-এর আশ্রয় অন্বেষণ করো না?"

## উপদেশ বাণী - ৬০

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'লা 'আনহু অন্যান্য সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) হতে শ্রেষ্ঠ তাঁর নামায ও রোযার কারণে নয়, বরং ওই বিশেষ নেআমত তথা আল্লাহর প্রতি এশক্ব-মহব্বত তাঁর মধ্যে বিরাজমান হওয়ার কারণেই তিনি শ্রেষ্ঠ। পুনরুত্থান দিবসে প্রত্যেকের নামাযকে নিজের রোযা ও মহত্ত্বের সাথে একত্রে মীযান তথা পাল্লায় মাপতে স্থাপন করা হবে; কিন্তু যখন (তাঁর) এশক্ব-মহব্বতকে সামনে আনা হবে, তখন

এটিকে কোনো পাল্লাতেই ধারণ করা যাবে না। অতএব, মহব্বত-ই মূল বা শেকড়।

তোমরা যখন তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা খুঁজে পাবে, তখন তাকে বেড়ে উঠতে উৎসাহ দেবে। তোমরা যখন নিজেদের মধ্যে মৌলিক বিনিয়োগ দেখতে পাবে, যা খোদাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বলে পরিচিত, তখন তালাশের মাধ্যমে তাকে বাড়িয়ে তোলো। "গতিচাঞ্চল্যের মাঝেই আশীর্বাদ নিহিত।" তোমরা যদি এটিকে এগিয়ে না নাও, তাহলে এমন কী ওই মৌলিক আকাঙ্ক্ষাও তোমাদেরকে ছেড়ে যাবে।

তোমরা কি মৃত্তিকার চেয়ে (কোনো অংশে) কম? কৃষকেরা নিড়ানি দিয়ে মাটি উপড়ে দেয়, আর সে মাটি ফসল উৎপন্ন করে। কিন্তু যখন তারা তা পরিত্যক্ত রেখে যায়, তখন মাটি শক্ত আকার ধারণ করে। অতএব, তোমরা যখন তোমাদের মাঝে হক্ব তথা সত্যের (মানে খোদার) অন্বেষণ খুঁজে পাও, তখন তাকে অনুসরণ করো যেদিকে যায়। এ কথা বলো না, "এই আকাঙ্ক্ষাকে অনুসরণ করে কী লাভ?" শুধু (ওর পেছনে) ছুটে চলো! ওর মুনাফা/ফায়দা নিজেই দেখা দেবে।

প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন পূরণে দোকানে যায়। খোদাতা'লা প্রত্যেকের জন্যে আকাঙ্ক্ষা/চাহিদা ও রসদ উভয়ই মঞ্জুর করেন; কিন্তু মানুষেরা যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ভান করে ঘরে বসে থাকে, তাহলে তাদের রসদ কখনোই তাদের কাছে পৌঁছুবে না। বস্তুতঃ কোনো ছোট্ট শিশু যখন কাঁদে, তখন তার মা তাকে বুকের দুধ খাওয়ায়। এমতাবস্থায় ওই শিশুটি যদি থেমে এ কথা চিন্তা করে, "কেঁদে কী লাভ? কান্নকাটি কীভাবে দুধ আসার সম্ভাব্য কারণ হতে পারে?" এ রকম ভাবনায় তাকে উপোস থাকতে হবে। অতএব, কান্নাকাটি তাকে খাবার এনে দেয়।

এটি নিচের প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করার মতোই - "এই রুকূ, সেজদা ও দুআ'র মধ্যে কী ফায়দা? আমি কেন তা পালন করবো?" হ্যাঁ, তোমরা যখন যুবরাজের সামনে কুর্নিশ করো, তখন যুবরাজ তোমাদের জন্যে মায়া অনুভব করেন, তাই নয় কি? কিন্তু এই দয়া যুবরাজের ত্বক ও শরীরের মাংস হতে আসে না। তিনি যদি মারা যান, কিংবা তিনি যখন ঘুমোন, তখন যুবরাজের শরীরের প্রতি কুর্নিশ করায় কোনো কিছু অর্জিত হয় না। তাই আমরা (এ থেকে) উপলব্ধি করতে পারি যে যুবরাজের দয়া-মায়া



অদৃশ্য কোনো বস্তু হবে। আমরা যদি চামড়া ও মাংসে ধারণকৃত অদৃশ্য কোনো বস্তুর প্রতি কুর্নিশ করতে পারি, তাহলে অবশ্যঅবশ্য আমরা চামড়া ও মাংসবিহীন ওই রাজাধিরাজের (মানে আল্লাহর) প্রতি সেজদা-ও করতে সক্ষম।

শরীরের চামড়া ও গোস্তে ধারণকৃত সব কিছু যদি দৃশ্যমান হতো, তাহলে আবূ জাহেল ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-ও এক হতেন, তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্যই হতো না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটি কান, তা শ্রবণশক্তিসম্পন্ন হোক বা বধিরই হোক, একই রকম দেখতে হয়; দুইয়ের মাঝে কোনো পার্থক্যই থাকে না। (অর্থাৎ) উভয়ের বস্তুগত আকৃতি একই। অতএব, ওই শ্রবণশক্তির অস্তিত্ব অদৃশ্য এবং তা দেখা যায় না।

অতএব, মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে খোদায়ী তথা ঐশী করুণা। তুমি যুবরাজ, তাই তোমার খেদমতরত দু জন গোলাম। একজন তোমারই পক্ষে অনেক আধ্যাত্মিক সেবা প্রদান করে এবং অসংখ্য বাতেনী সফর সুসম্পন্ন করে। অপরজন তোমার খেদমতে অলসতা করে। তথাপি আমরা দেখতে পাই যে অলস জনেরই প্রতি তোমার মহব্বত বেশি। সক্রিয় জনকে তুমি পুরস্কারবিহীন থাকতে দিতে চাও না ঠিক, কিন্তু এটি-ই যা ঘটে থাকে।

খোদাতা'লার করুণার কারণ নির্ধারণ করা অসম্ভব। এই ডান চোখ ও এই বাম চোখ একই রকম দেখতে। ডান চোখ এমন কী সেবা দিয়েছে যা বাম চোখ দেয়নি? আর এই ডান হাত - এটি-ই বা এমন কী কাজ করেছে যা বাম হাত করেনি? অথচ খোদায়ী আশীর্বাদ ডান হাত ও ডান চোখের প্রতি বর্ষিত হয়েছে। একইভাবে, শুক্রবারকেও অন্যান্য দিনের ওপরে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে-

"খোদা মানুষের প্রতি নির্দিষ্ট অংশ করেন মঞ্জুর,
লওহে মাহফুযে যা লিপিবদ্ধ তার আওতার বাহির,
অতএব, সবাই তা খুঁজে নিক (প্রতি) শুক্রবার।" [সরাসরি অনুবাদ]

এখন (জিজ্ঞাস্য), শুক্রবার এমন কী সেবা দিয়েছে যা অন্যান্য দিন দেয়নি? অথচ আল্লাহতা'লা তাঁর করুণা ও বিশেষ চিহ্ন শুক্রবারেরই প্রতি মঞ্জুর করেছেন।

কোনো অন্ধ লোক যদি বলে, "আমাকে এরকম অন্ধ করেই সৃষ্টি করা হয়েছে; তাই এটি আমার দোষ নয়," তবুও এতে তার কোনো লাভ হবে না। এ কথা অন্ধদেরকে তাদের দুঃখ হতে রেহাই দেবে না। ওই সমস্ত অবিশ্বাসী যারা নিজেদের অবিশ্বাসের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে, তারা তাদের অবিশ্বাসের দরুন-ই কষ্ট পাচ্ছে। অথচ এই বিষয়টির প্রতি আরেকবার দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, সেটিও একটি ঐশী আশীর্বাদ। অবিশ্বাসীরা যখন স্বস্তিতে থাকে, তখন তারা উৎস (মানে খোদাতা'লা) সম্পর্কে বিস্মৃত হয়। এমতাবস্থায় খোদাতা'লা তাদেরকে দুঃখকষ্ট দ্বারা স্মরণ করিয়ে দেন। অতএব, জাহান্নাম হচ্ছে অবিশ্বাসীদের একটি এবাদতগাহ ও মসজিদ; কেননা সেখানেই অবিশ্বাসীরা আল্লাহ পাককে স্মরণ করে।

কয়েদখানায় দুঃখকষ্ট ও দাঁতের ব্যথা হয়। যখন ব্যথা আগমন করে, তখন তা বিস্মৃতির পর্দা ছিঁড়ে ফেলে। দুঃখিজন তখন খোদার দিকে ফেরে এবং প্রার্থনা করে, "হে খোদা, হে দয়াময়, হে আল্লাহ!" এমতাবস্থায় তারা আরোগ্য লাভ করে। অতঃপর বিস্মৃতির পর্দা আবার নেমে আসে এবং তারা তখন বলে, "কোথায় খোদা? আমি তো তাঁকে খুঁজে পাইনি। তাঁর দর্শন লাভও করিনি। তাহলে কেনই বা তাঁকে খুঁজবো আমি?"

এটি কীভাবে হলো যে তোমরা যখন দুঃখকষ্ট ভোগ করো, তখন তোমরা (তাঁকে) দেখো এবং খুঁজে পাও, কিন্তু এখন (তাঁকে) দেখতে পাও না? অতএব, দুঃখকষ্টকে সবশেষে তোমাদের ওপরে বিজয়ী হওয়ার এখতেয়ার দেয়া হয়েছে, যার দরুন তোমরা খোদাতা'লাকে স্মরণ করবে। স্বস্তির সময়ে পাপী বিস্মৃত থাকে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে না। জাহান্নামে সে (তাঁকে) রাত-দিন স্মরণ করবে।

খোদাতা'লা জগত-সংসার, আসমান-জমিন, চাঁদ-সূর্য, ভালো-মন্দ ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন তাঁকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে, তাঁরই সেবার জন্যে এবং তাঁরই প্রশংসা (উচ্চকণ্ঠে) ঘোষণার খাতিরে। যেহেতু অবিশ্বাসীরা দুঃখকষ্ট ভোগ না করা পর্যন্ত তাঁকে স্মরণ করে না, আর যেহেতু তাদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ছিলো খোদার স্মরণ, সেহেতু তাঁকে স্মরণের জন্যে তাদেরকে দুঃখকষ্ট ভোগ করতে পাঠানো হয়।



তবে ঈমানদারবৃন্দ ওই দুঃখকষ্ট ভোগ করেন না; তাঁরা দুঃখকে সর্বদা উপস্থিত দেখতে পান। একইভাবে, একবার যদি কোনো বুদ্ধিমান শিশুকে শাস্তিস্বরূপ পায়ে বেড়ি দেয়া হয়, তাহলে সে কখনোই বেড়িকে ভুলে যাবে না। কিন্তু বোকা শিশু (প্রতিনিয়ত) ভুলে যায় এবং তাই প্রতিদিন-ই তাকে বেড়ি পরাতে হয়। একই অবস্থা চালাক ঘোড়াটির বেলায়ও, যে একবার সামনে ছোটার জন্যে আরোহীর বুটজুতোর গোড়ালিতে অবস্থিত নালবিশেষের তাড়না পেয়েছে; দ্বিতীয়বার আর সেটির প্রয়োজন হয় না তার। সে ওই তাড়নার হুলের কথা না ভুলেই আরোহীকে ক্রোশের পর ক্রোশ বহন করে নিয়ে যায়। কিন্তু বোকা ঘোড়াটির জন্যে প্রতিটি মুহূর্তেই তাড়নার ওই হুল প্রয়োজন; সে কাউকেই বহন করার যোগ্যতা রাখে না, তাই (বহনের জন্যে) তার পিঠে গোবর বোঝাই করা হয়।

## উপদেশ বাণী - ৬১

অনেক মানুষের কাছে বারবার কোনো কিছু শোনা তোমার নিজের চোখে দেখার সমান গুরুত্ব বা কর্তৃত্ব বহন করে। উদাহরণস্বরূপ, তোমাকে বলা হয়েছে যে তুমি তোমার বাবা-মার সন্তান। এটি তুমি কখনো নিজ চোখে দেখোনি, কিন্তু বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে বহুবার শোনার পর তুমি এটিকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছো। অতঃপর তোমাকে যদি বলা হয় তাঁরা তোমার পিতামাতা নন, তবুও তুমি এ কথা মানবে না। একইভাবে, আস্থাভাজন মানুষদের কাছে বারংবার তুমি মক্কা মোয়াযযমা ও বাগদাদ শরীফের অস্তিত্ব সম্পর্কে শুনেছো। এমতাবস্থায় ওই সব মানুষ যদি এখন পবিত্র দুটি নগরীর অস্তিত্ব নেই মর্মে হলফ-ও করেন, তথাপি-ও তুমি তাঁদেরকে বিশ্বাস করবে না। অতএব, কান যখন বিভিন্ন সূত্র হতে বারংবার একই বিষয় সম্পর্কে শোনে, তখন সেটি (মানে ওই শ্রুতি) চোখের মতো একই কর্তৃত্ব বহন করে।

অনুরূপভাবে, কেউ যদি প্রজন্মের পর প্রজন্ম যাবৎ হস্তান্তরিত কোনো সুপরিচিত সুবচন নিজে ব্যবহার করেন, তাহলে তা একটি বাক্য নয়, বরং লাখ খানেক বক্তব্য হবে। এতে আশ্চর্য হওয়ার এমন কী আছে? কোনো রাজা লক্ষ জনের ওপর কর্তৃত্বশীল, যদিও তিনি একজন। (ওই) এক লাখ

মানুষ কথা বল্লেও কিছু ঘটবে না, কিন্তু তিনি যখন বলবেন তৎক্ষণাৎ তা ঘটবে।

বাহ্যিক জগতের রীতি যখন এ-ই, তখন আধ্যাত্মিক জগতের বেলায় এটি আরো সত্য।

তুমি হয়তো এই গোটা জগতকে দেখেছো, কিন্তু যেহেতু খোদাকে স্মরণে রেখে এটি তুমি প্রত্যক্ষ করোনি, সেহেতু তোমাকে আবার এই সফর করতে হবে। (খোদা বলেন,) "ওই সফর আমার ওয়াস্তে ছিলো না, বরঞ্চ তা ছিলো পেঁয়াজ ও রসুনের খাতিরে। যেহেতু তুমি আমার ওয়াস্তে তা করোনি, আরেক উদ্দেশ্যে করেছো, সেহেতু ওই আরেক উদ্দেশ্য তোমার জন্যে পর্দা হয়ে গিয়েছে - যা তোমাকে আমার দর্শন পেতে বাদ সেধেছে।"

এটি বাজারে কোনো ব্যক্তিকে আন্তরিকভাবে তালাশ করার মতোই ব্যাপার। তুমি অন্য কাউকেই দেখতে পাও না; অন্যদেরকে দেখতে পেলেও তাঁরা কেবল ছায়া-ই। কিংবা কোনো বইয়ে তুমি যখন একটি সমস্যার সমাধান খুঁজে বেড়াও, তখন তোমার চোখ, কান ও মস্তিষ্ক ওই একটিমাত্র বিষয়ের প্রতি মনোনিবিষ্ট থাকে। তুমি পাতার পর পাতা উল্টাও, তবু অন্য কিছু দেখতে পাও না। যেহেতু তোমার মনকে একটি উদ্দেশ্য ও বিষয় আচ্ছন্ন করে রাখে, সেহেতু তুমি যেখানেই যাও না কেন, ওই লক্ষ্যবস্তু-ই তোমার ধ্যান-জ্ঞান হয়।

খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা:)-এর শাসনামলে কোনো এক ব্যক্তি এতো বৃদ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁর কন্যা তাঁকে দুধ খেতে দিতেন এবং শিশুর মতো তাঁর সেবাযত্ন করতেন। খলীফা উমর (রা:) ওই কন্যাকে বলেন, "তোমার পিতার প্রতি কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তোমার সাথে বর্তমানে জীবিত কোনো সন্তানেরই তুলনা চলে না।" ওই কন্যাটি উত্তর দেন, "আপনি যা বলেছেন তা সত্য, তবে আমি যা (সেবা) দেই এবং আমার বাবা আমাকে যে আদরযত্ন দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। আমার হয়তো পিতার খেদমতে কমতি নেই; কিন্তু আমার বাবা যখন আমাকে বড় করেন ও আমার যত্ন নেন, তখন তিনি আমার নিরাপত্তা ও সুখ-শান্তির ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকতেন। অথচ আমি আমার বাবার সেবাযত্ন করি এবং খোদাতা'লার কাছে এই প্রার্থনা করি যাতে



তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং তাঁর দেয়া কষ্টেরও ইতি ঘটে। আমি যদি আমার পিতার খেদমত করে থাকি, তাহলে আমার জন্যে তাঁর অনুভূত ওই একই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আমি কোথায় পাবো?" হযরত উমর (রা:) বলেন, "এই মহিলা উমরের (রা:) চেয়েও জ্ঞানী।" এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, "আমি বাহ্যিক উপাদানগুলো দিয়ে বিচার করেছি, আর সে অন্তঃসার তথা নির্যাস ব্যক্ত করেছে।"

প্রকৃত জ্ঞানী যাঁরা, তাঁরা কোনো বিষয়ের শাঁসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং সেটির সত্যটুকু নির্ণয় করেন। আল্লাহ মাফ করুন এই চিন্তা করা হতে যে, খলীফা উমর (রা:)-কে বিষয়াদির অন্তর্নিহিত সত্য ও গূঢ়রহস্য সম্পর্কে অনবধান রাখা হয়েছিলো। বরঞ্চ এটি তো ছিলো সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এরই রীতিনীতি এই মর্মে যে, তাঁরা নিজেদের সমালোচনা করতেন এবং অন্যদের প্রশংসা করতেন।

এমন অনেকে আছেন যারা 'উপস্থিতির' শক্তি-সামর্থ্য রাখেন না। তারা 'অনুপস্থিতিকে' বেশি প্রীতিকর হিসেবে পান। একইভাবে, উজ্জ্বল প্রভা সূর্য হতে বিচ্ছুরিত হয় এবং তা পৃথিবীকে আলোকিত করে; কিন্তু মানুষ যদি সূর্যের গোলকের দিকে সারা দিন তাকিয়ে থাকে, এতে তাদের কোনো উপকার নিহিত নেই, অধিকন্তু তাদের চোখ এতে ঝলসিত হবে। এক্ষেত্রে সূর্যের গোলকের উপস্থিতি ছেড়ে অন্য কোনো কাজে তাদের জড়িত হওয়াই শ্রেয়তর হবে। অনুরূপভাবে, অসুস্থ লোকদের উপস্থিতিতে সুস্বাদু খাবারের কথা উল্লেখ করা তাদেরকে শক্তি বাড়াতে ও খাবারের রুচি ফেরাতে উৎসাহিত করে; কিন্তু ওইসব খাবার প্রকৃতপ্রস্তাবে গ্রহণের দরুন তাদের হয়তো ক্ষতি হতে পারে (মানে অসুস্থতা থেকে সেরে না ওঠা পর্যন্ত তা না খাওয়াই উত্তম)।

অতএব, খোদাতা'লার অন্বেষণে কম্পমান হওয়া এবং (পাশাপাশি) প্রগাঢ় প্রেম অনুভব করা একান্ত প্রয়োজন। যে ব্যক্তি কম্পমান হয় না, তাকে কম্পমানদের খেদমত/সেবা করতে হবে। কোনো ফল-ই বৃক্ষকাণ্ডে ধরে না; কেননা বৃক্ষকাণ্ড কম্পমান হয় না। ডালপালার ডগা কাঁপে, আর বৃক্ষকাণ্ড ডালপালার ডগা ও ফলকে নিরাপদ রাখতে সমর্থন জোগায় - এমন কী কুঠারাঘাত হতেও রক্ষা করে। যেহেতু বৃক্ষকাণ্ডের কম্পন গাছের ধ্বংস ডেকে আনে, সেহেতু কাণ্ডটির পক্ষে কম্পমান না হওয়াই শ্রেয়তর।

কম্পমানদেরকে আরো উত্তম সেবা দেবার খাতিরে বৃক্ষকাণ্ডের কম্পমান না হওয়াই উত্তম।

যেহেতু আমীরের (শাসকের) নামটি মুঈনুদ্দীন, সেহেতু (আরবী) 'আঈন' শব্দটির সাথে 'মিম' শব্দটি যুক্ত হওয়ার কারণে তিনি 'আঈনুদ্দীন (তথা ধর্মের সারমর্ম) নন। "পূর্ণতার সাথে কোনো কিছুকে যোগ করা ওর হ্রাসপ্রাপ্তি/অবনতি।" ওই 'মিম' শব্দটি যুক্ত করা একটি হ্রাসপ্রাপ্তি। একইভাবে, ষষ্ঠ আঙ্গুল যদিও একটি সংযোজন, তথাপিও সেটি একটি হ্রাসপ্রাপ্তি। (আরবী) 'আহাদ' (এক) শব্দটি একটি পূর্ণতা, আর 'আহমদ' (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এখনো পূর্ণতার অবস্থায় নন; 'মিম' শব্দটি যখন অপসারণ করা হয়, তখন-ই তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। আরেক কথায়, খোদাতা'লা সব কিছু জানেন ও বোঝেন; তাঁর সাথে তোমরা যা কিছু সংযোজন করো, তা-ই এক হ্রাসপ্রাপ্তি। এক সংখ্যাটি সকল সংখ্যাতেই ধারণকৃত, আর এটি ছাড়া কোনো সংখ্যাই অস্তিত্বশীল থাকতে পারে না।

সাইয়্যেদ বুরহানউদ্দীন একবার (ধর্ম) শিক্ষাদানকালে এক নির্বোধ লোক তাঁকে বাধা দিয়ে বলে, "উপমা/মিসাল বা তুলনা ছাড়া কিছু শব্দের প্রয়োজন আমাদের।" সাইয়্যেদ উত্তর দেন, "যাদের কোনো মিসাল/সাযুজ্য নেই, তাঁরা এসে সাযুজ্যহীন কথা/বাণী শুনুন!"

বস্তুতঃ তুমি হলে তোমারই মিসাল/উপমা। তুমি নও এই দেহ। এখানে এই অস্তিত্ব তোমারই একটি ছায়া বৈ কিছু নয়। কেউ ইন্তেক্বাল করলে মানুষেরা বলেন, "অমুখ পরলোক গমন করেছেন।" তিনি যদি ওই দেহ-ই হতেন, তাহলে তাঁরা (ইন্তেক্বালপ্রাপ্তজন) কোথায় গিয়েছেন? অতএব, তোমার বাহ্যিক আকৃতি হচ্ছে তোমারই অভ্যন্তরীণ এক উপমা; আর তোমার বাহ্যিক আকৃতি থেকে অন্যরা তোমার অন্তঃস্থ বাস্তবতা সম্পর্কে বিচার করতে পারেন। ঘনত্বের কারণে সকল বস্তু-ই দৃশ্যমান হয়। এরই ফলশ্রুতিতে গরম আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস দেখা যায় না, কিন্তু শীতকালে ঘনত্বের কারণে এটি দৃশ্যমান হয়।

মহানবী (দ:)-এর কর্তব্য ছিলো অন্যদেরকে ঘুম থেকে জাগ্রত করার জন্যে খোদাতা'লার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো এবং ধর্মপ্রচার করা। তবে খোদাতা'লার সত্য গ্রহণে তাদেরকে প্রস্তুত করার দায়িত্ব ও কর্তব্য



তাঁর ছিলো না। সেটি আল্লাহ পাকেরই কাজ। আল্লাহতা'লার দুটি গুণ রয়েছে: ক্রোধ ও প্রেমময় উদারতা/মায়ামমতা। পয়গম্বরবৃন্দ (আ:) হলেন উভয়েরই কার্যস্থল/প্রকাশস্থল। ঈমানদারদের কাছে তাঁরা প্রকাশস্থল খোদার ঐশীপ্রেমের, আর অবিশ্বাসীদের জন্যে খোদার রোষের।

সত্য যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁরা প্রিয়নবী (দ:)-এর মাঝে নিজেদের (প্রতিফলন) দেখতে পান, নিজেদের কণ্ঠস্বরই তাঁর কাছ থেকে শুনতে পান, আর তাঁরই উপস্থিতিতে নিজেদের সুঘ্রাণ পান। কেউই নিজের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন না। অতএব, আম্বিয়াবৃন্দ (আ:) উম্মতকে বলেন, "আমরা তোমাদেরই, আর তোমরাও আমাদেরই; আমাদের (দুইয়ের) মধ্যে অজানা, অচেনা কিছুই নেই।" কেউ যদি বলেন, "এটি আমার হাত," তাঁর কাছে প্রমাণ কেউই দাবি করেন না, কেননা তাঁর (দেহের) অংশ হচ্ছে হাতটি। কিন্তু যদি তাঁরা বলেন, "অমুক আমার পুত্র," তৎক্ষণাৎ প্রমাণ দাবি করা হয়; কেননা সেটি তাঁদের থেকে পৃথক অন্য কিছু।

## উপদেশ বাণী - ৬২

কেউ কেউ বলেন ভালোবাসা-ই হচ্ছে খেদমত তথা সেবার কারণ, কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) এ কথা সত্য নয়। বরঞ্চ মাশূক্ব তথা প্রেমাস্পদের আকাঙ্ক্ষা-ই সেবার প্রকৃত উৎস। প্রেমাস্পদ যদি চান আশেক্ব-ভক্ত তাঁকে সাহায্য করেন, তাহলে আশেক্ব-ভক্ত সহায়তা করেন। প্রেমাস্পদ তা না চাইলে আশেক্ব-ভক্তও তা পরিত্যাগ করেন। খেদমত পরিত্যাগ করা কিন্তু মহব্বত পরিত্যাগ নয়। না, পক্ষান্তরে, আশেক্ব যদি কোনো সেবা না-ও দেন, তবুও এশক্ব-মহব্বত ক্রিয়াশীল থাকে তাঁর হৃদ-রাজ্যে। অতএব, মূল বিষয়বস্তু হলো এশক্ব-মহব্বত, আর খেদমত তার শাখা।

আস্তিন যখন নড়ে, তখন তা হাত নড়ার কারণেই ঘটে থাকে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে আস্তিন সর্বদা-ই হাতের অনুসরণ করে। উদাহরণস্বরূপ, কারো আলখাল্লা এতো বড় যে তারা নড়াচড়া করলেও ওই আলখাল্লা নড়ে না। আমরা সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু যা সম্ভব নয় তা হলো, মানুষটির নড়াচড়া ছাড়াই আলখাল্লটির নড়তে সক্ষম হওয়া।

কিছু কিছু লোক আলখাল্লাটিকে মানুষ বলে ভুল করেন, আস্তিনটিকে হাত হিসেবে বিবেচনা করেন এবং জুতোকেও পা হিসেবে কল্পনা করেন। অথচ এই হাত কিন্তু আরেকটি হাতের আস্তিন, আর এই পা-ও আরেকটি পায়ের জুতো। তারা বলেন, "অমুক হচ্ছেন তমুকের পায়ের নিচে," এবং "অমুকের কতো বিষয়ে যে হাত আছে।" নিশ্চয় আমরা যখন ওরকম হাত ও পায়ের উল্লেখ করি, তখন আমরা এই হাত ও পা'কে বোঝাই না।

ওই শাহেনশাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (ধরাধামে) শুভাগমন করেন এবং আমাদেরকে সমবেত করেন, আর এরপর (পর্দার অন্তরালে) অন্তর্হিত হন। একইভাবে, মৌমাছি মধুর সাথে মোমকে মিশায় এবং এরপর উড়ে চলে যায়। এটি এ কারণে যে আমাদের সৃষ্টি ছিলো একটি শর্তের অধীন; কিন্তু খোদাতা'লার নিত্যতা কোনো শর্তাধীন নয়। আমাদের সবার মাতাপিতা মৌমাছির মতোই, যাঁরা অন্বেষণকারী ও অন্বেষণকৃতকে মিলিত করান, আর আশেক্ব ও মাশূক্বকেও একত্রিত করেন। অতঃপর একদিন অকস্মাৎ তাঁরা উড়ে চলে যান। খোদাতা'লা তাঁদেরকে মধু ও মোমের মিশ্রণের একটি মাধ্যম বানিয়েছেন, আর তাঁরা এরপর উড়ে চলে যান - এদিকে মধু ও মোম রয়ে যায়। কিন্তু তাঁরা বাগান হতে উড়ে বেরিয়ে যান না। এটি এমন বাগান নয় যা হতে বেরোনো সম্ভব। বরঞ্চ তাঁরা বাগানের এক কোণা হতে আরেক কোণায় গমন করেন।

আমাদের শরীর একটি মৌচাকের মতো, যা খোদাপ্রেমের মধু ও মোমের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। যদিও মৌমাছিরা - আমাদের সবার পিতামাতাবৃন্দ - ওই মধু ও মোমকে একত্রিত করেছিলেন, তবু তাঁদেরকেও উদ্যানরক্ষক দেখাশোনা করেন; আর তাই উদ্যানরক্ষক-ই আবার মৌচাকটি (তাঁদের জন্যে) সৃষ্টি করেন। আল্লাহ পাক ওই মৌমাছিদেরকে তাঁদের কাজের সাথে উপযুক্ত একটি আকার দান করেন; কিন্তু তাঁরা যখন অপর জগতে চলে যান, তখন তাঁরা (স্রেফ) পোশাক পরিবর্তন করেন, কেননা সেখানে আরেকটি আলাদা কাজ আরম্ভ হয়। তথাপিও ওই মানুষেরা একই রকম থাকেন, যেমনটি তাঁরা ছিলেন প্রথমাবস্থায়।



উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি যুদ্ধে গমন করেন; তিনি রণসাজসজ্জা ও বর্ম পরিধান করেন এবং শিরস্ত্রাণও পরেন। কিন্তু (যুদ্ধশেষে) তিনি যখন বাড়ি ফিরে কোনো ভোজে অংশ নেন, তখন তিনি ওই রণসাজসজ্জা খুলে রাখেন। কেননা খাদ্য ও পরিবার আরেকটি বিষয়। অথচ তিনি তো সেই একই ব্যক্তি। তবে তোমরা তাঁকে শেষবার ওই সাজসজ্জায় দেখে থাকলে যখন-ই তাঁর কথা চিন্তা করবে, তৎক্ষণাৎ ওই আকার-আকৃতিতেই তাঁকে মনে পড়বে; এমন কী তিনি শতবার জামাকাপড় বদলালেও এ পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে না।

কোনো এক নির্দিষ্ট জায়গায় একজন নারী তাঁর আংটি হারিয়েছেন। যদিও ওই আংটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে, তবুও তিনি স্থানটির চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এ কথা বোঝাতে, "এটি-ই সেই স্থান যেখানে আমি আংটি হারিয়েছি।" অনুরূপভাবে, (কারো মৃত্যুতে) শোকসন্তপ্ত এক ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ কবরের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং কবরকে চুম্বন করছে এ কথা বোঝাতে, "আমি ওই আংটি এখানে হারিয়েছি;" অথচ তা তখনো সেখানে থাকতে পারে কীভাবে?

আল্লাহতা'লা তাঁর সর্বময় ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্যে কতো যে চমৎকার কাজ করেন। খোদায়ী/ঐশী হেকমত তথা জ্ঞান-প্রজ্ঞার খাতিরে এখানেই (এ জগতেই) তিনি এক দিন কী দু দিনের জন্যে আত্মা ও দেহকে একত্রিত করেন।

মানুষেরা মৃত্যুকে ভয় পান। তাঁরা মনে করেন, কোনো সমাধিতে মুর্দা তথা মরদেহের পাশে এক মুহূর্তের তরেও উপবেশন করলে তাঁরা পাগল হয়ে যেতে পারেন। তাহলে কেন, (দৈহিক) আকৃতির ফাঁদ ও মরদেহের সমাধি হতে একবার যখন তাঁদেরকে মুক্তি দেয়া হয়েছে, তখন কেন তাঁরা এর অদূরে পড়ে থাকবেন?

খোদাতা'লা কবরের দৃশ্যকে আমাদের অন্তরে ভয়ভীতি জাগানোর প্রতীক বানিয়েছেন, আর এতে মৃত্যুর ভয় বারবার নবায়নও হয়ে থাকে। একইভাবে, রাস্তার কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে একটি কাফেলা ওঁৎ পেতে থাকা ডাকাত দলের দ্বারা আক্রান্ত হলে সতর্কতামূলক পথচিহ্ন হিসেবে দুই-তিনটি পাথর সেখানে রাখা হয় যাতে বোঝানো যায়, "এটি

বিপজ্জনক এলাকা।" কবরস্থানও বিপজ্জনক জায়গা প্রদর্শনকারী একটি পথচিহ্ন বটে।

শঙ্কা তোমার ওপর নিজের ছাপ ফেলে, যদিও তা সবসময় অনুধাবন করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, মানুষেরা যদি তোমাকে বলে, "অমুক তোমাকে সমীহ করে," এমতাবস্থায় তার প্রতি স্নেহমমতা তৎক্ষণাৎ দেখা দেয়। অপরপক্ষে, যদি মানুষেরা বলে, "তমুক তোমাকে মোটেও সমীহ করে না," এবং "তোমার ব্যাপারে তার কোনো দুশ্চিন্তা-ই নেই," তবে স্রেফ এসব কথার কারণেই তোমার অন্তরে রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

জীবনে এই ছুটে চলা শঙ্কার প্রভাবেই ঘটে থাকে। সারা জগৎ ছুটে চলেছে, কিন্তু প্রত্যেক সত্তা-ই আলাদা আলাদা পন্থায় ছুটে চলেছে। মানুষের তেড়ে বেড়ানো বা ছুটে চলা এক ধরনের; পক্ষান্তরে, গাছ-গাছালির সাধনা ও অসাধ্য কিন্তু একই রকম নয়। আর রূহ তথা আত্মার ছুটে চলা একেবারেই ভিন্ন একটি বিষয়।

উদাহরণস্বরূপ, রূহের ছুটে চলা কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ বা চিহ্ন ছাড়াই হয়ে থাকে। আর অপক্ক আঙ্গুর ফলের ব্যাপারটি বিবেচনা করো, এটি কতোই না মিষ্টতার পিছু ছুটে, যতোক্ষণ না এটি পাকা কালো আঙ্গুরের রূপ লাভ করে। ওই ছুটে চলা অদৃশ্য ও অবোধগম্য, কিন্তু আঙ্গুর যখন সেই পর্যায়ে পৌঁছোয়, তখন সেটি উপলব্ধি করতে পারে এতো দীর্ঘকাল কিসের পেছনে ছুটেছে সে। অনুরূপভাবে, কেউ একজন সবার অলক্ষ্যে পানিতে ডুব দেন; কিন্তু ওই ব্যক্তি যখন হঠাৎ জলাশয়ের মাঝখানে মাথা তুলে ভেসে ওঠেন, কেবল তখন-ই সবাই বুঝতে পারেন কতোখানি সাঁতার কাটা হয়েছে ওই পর্যায়ে পৌঁছুনোর জন্যে।

## উপদেশ বাণী - ৬৩

আশেক্ববৃন্দের এমনই অন্তরের বেদনা বিরাজমান যার উপশমে কোনো ওষুধ নেই; এর দাওয়াই নিদ্রা, ভ্রমণ বা পানাহারেও নিহিত নেই; স্রেফ প্রেমাস্পদের দর্শনেই রয়েছে তাবৎ আরোগ্য। "বন্ধুর সাথে দেখা করো, তাতেই তোমার অসুখ হবে দূর।" এটি এরকম-ই এক সত্য যে এমন কী একজন মুনাফেক্ব তথা কপট ব্যক্তিও ঈমানদারদের সাহচর্যে ওঠা-বসা



করলে তাঁদের প্রভাবে এক মুহূর্তে ঈমানদার হয়ে যেতে পারেন। তাই খোদাতা'লা ঘোষণা করেন:

"তারা যখন ওই সমস্ত ঈমানদারের দেখা পায়, তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি'।" [সরাসরি অনুবাদ]

তাহলে ঈমানদার যখন ঈমানদারের সাহচর্যে বসেন, তখন কী অবস্থা হয়? এই ধরনের সাহচর্য যেখানে কপট ব্যক্তির ওপরই এ প্রভাব ফেলে, সেখানে ঈমানদারের জন্যে তা কী ফায়দা বা উপকার বয়ে আনে তা বিবেচনা করো! আরো বিবেচনা করো পশম কীভাবে কোনো দক্ষ ও অভিজ্ঞ তাঁতীর হাতে উৎকৃষ্ট গালিচায় পরিণত হয়, আর এই মাটি সৃজনশীল গৃহনির্মাতাদের সংস্পর্শে এসে কীভাবে চমৎকার প্রাসাদে রূপান্তরিত হয়! যেহেতু বুদ্ধিমান মানুষদের সমাজ জড় বস্তুর ওপর এ রকম প্রভাব ফেলে থাকে, সেহেতু ঈমানদারদের সমাজ কোনো ঈমানদারের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে তা কল্পনা করো!

সীমিত বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তাদের সাথে সংশ্লিষ্টতার দ্বারাও জড় বস্তুগুলো মহা আকৃতি ও সৌন্দর্যের অধিকারী হতে পারে। এসব সৃষ্টি আংশিক বুদ্ধিরই ছায়া, আর এসব ছায়া হতে তোমরা স্বয়ং প্রস্তুতকারকদেরকে বুঝতে পারো। এমতাবস্থায় ওই আসমানসমূহ, চাঁদ, সূর্য, জমিনের সাতটি স্তর এবং আসমান ও জমিনের মাঝে অবস্থিত সকল বস্তুর ওপরে ছায়া যে মহান সত্তা বিস্তার করেন, তাঁর জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও পবিত্র সত্তা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করো। এগুলোর সবই ওই সর্বজনীন জ্ঞানী সত্তার ছায়া। কোনো সীমাবদ্ধ সত্তার ছায়া তার শরীরের ছায়ার অনুপাতেই হয়ে থাকে। কিন্তু সর্বজনীন (মহান) সত্তার ছায়া যেটি সমগ্র সৃষ্টিকুলব্যাপী, সেটি তাঁরই অনুপাত অনুযায়ী হয়।

সূফী-দরবেশবৃন্দ এসব আসমান-জমিন ছাড়াও অন্য জগৎ দর্শন করেছেন। তাঁদেরকে যা দেখানো হয়েছে, এই জগৎ তার তুলনায় অনাকর্ষণীয় ও হীন। সূফী-দরবেশমণ্ডলী ওই জগৎসমূহে নিজেদের পা রেখেছেন এবং সেগুলোরও ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়েছেন।

"আত্মার রাজ্যে নানা জগৎ বিরাজমান,
যেগুলো আমাদের পার্থিব জগৎকে করে নিয়ন্ত্রণ।"

সমগ্র মানব জাতির মাঝে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি যদি সাত আসমানের চূড়োয় পদার্পণের জন্যে প্রয়োজনীয় গুণ বা যোগ্যতা অর্জন করেন, তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে? আমরা কি মাটির মতো একই পদার্থ হতে সৃষ্ট নই? অথচ খোদাতা'লা আমাদের মাঝে সন্নিবেশিত করেছেন এমন এক বৈশিষ্ট্য যা আমাদেরকে মাটি হতে পৃথক করেছে, আর ওই পদার্থের ওপরে যা আমাদেরকে এনে দিয়েছে নিয়ন্ত্রণ। আমরা যেভাবে পছন্দ করি, সেভাবেই সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি - ওপরে তুলতে পারি, আবার নামিয়েও রাখতে পারি। কখনো প্রাসাদ নির্মাণ করতে পারি, কখনো বা কাপ-তশতরি বানাতে পারি; কখনো বিস্তৃত করতে পারি, আবার কখনো বা সংক্ষিপ্ত করতে পারি। হয়তো আমরা এই মাটি হতেই পয়দা এবং এর অংশও, কিন্তু খোদাতা'লা ওই দক্ষতা দ্বারা আমাদেরকে পৃথক করেছেন। একইভাবে, এই বাস্তবতাকে বিশ্বাস করা এমন কী কঠিন কাজ যে, খোদাতা'লা আমাদের একই মনুষ্যজাতির মধ্য হতে কোনো নির্দিষ্ট কাউকে (মানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে) বেছে নিয়েছেন, যাঁর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা (তাঁর পাশে) জড় পদার্থের মতো এবং যাঁর ব্যাপারে আমরা অনবগত হলেও তিনি আমাদের সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হয়েই আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছেন?

আমি (মওলানা রূমী রহমতুল্লাহে আলাইহে) যখন বলি 'অনবগত,' তখন কিন্তু আমি পুরোপুরি অনবগত বোঝাই না। বরঞ্চ কোনো কিছুর প্রতি যখন প্রত্যেকে আপন আপন মনোযোগ নিবদ্ধ করে, তখন অন্য কিছুর ব্যাপারে অনবগত থাকে। এমন কী মাটি যা একেবারেই জড় পদার্থ, তা-ও খোদাতা'লা তাকে যা দিয়েছেন সে সম্পর্কে অবগত। কেননা সেটি যদি অনবগত হতো, তাহলে কীভাবে সেটি পানি গ্রহণক্ষম হতো? আর কীভাবেই বা সেটি প্রতিটি বীজের যত্ন নিতে ও পুষ্টি জোগাতে পারতো? মানুষেরা কোনো নির্দিষ্ট কাজে আন্তরিক ও সর্বাত্মকভাবে আত্মনিয়োগ করলে ওই কাজে তাদের মনোযোগ অন্য কোনো বিষয় বা জিনিস সম্পর্কে তাদেরকে অনবগত বা অনবহিত রাখে। এই অমনোযোগিতার মানে কিন্তু পুরোপুরি অমনোযোগিতা নয়। উদাহরণস্বরূপ, কিছু লোক একটি বিড়াল ধরতে যায়, কিন্তু সেটি প্রতিবারই তাদেরকে ফাঁকি দিয়ে পালায়। অতঃপর একদিন ওই বিড়াল কোনো পাখি শিকারে এতোই



মনোনিবিষ্ট হয় যে সেটি লোকদের দ্বারা তার পিছু নেয়াকে দেখতে পায় না। ফলশ্রুতিতে লোকেরা সেটিকে ধরে ফেলে।

বৈষয়িক বিষয়াবলীতে পুরোপুরি মগ্ন হওয়া একদম অপ্রয়োজনীয়। আমাদের এগুলোকে সহজভাবে নেয়া উচিত, আর এগুলোর দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়; যাতে চিত্তবিক্ষেপ ঘটার দরুন আমরা আরো বড় ধরনের কোনো বিপদে না পড়ি। রত্নভাণ্ডারের (মানে খোদাতা'লা ও তাঁর পথের) স্বাভাবিক অবস্থাকে বিঘ্নিত করা চলবে না, কেননা এই জগৎ দুর্ভাবনায় পড়লে ওই অন্য সত্তা (মানে খোদা) এটিকে রূপান্তর করবেন; কিন্তু যদি ওই অন্য সত্তা (খোদাতা'লা) বিরক্ত হন (আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি), তাহলে তাঁকে কে (ক্ষমাশীলতায়) রূপান্তর করবেন?

ধরো, তোমাদের মালিকানায় অনেক ধরনের জামাকাপড় রয়েছে। তোমরা যখন (সেগুলোতে) গভীরভাবে নিবিষ্ট হও, তখন সেগুলোর মধ্যে কোনটিকে তোমরা আঁকড়ে ধরবে (বেশি প্রিয় বলে)? যদিও সেগুলো হয়তো সবই অপরিহার্য, তথাপি এটি নিশ্চিত যে তোমাদের ওই বান্ডিলের মধ্য হতে তোমরা দামী কোনো কিছু বেছে নেবে, যেটি রত্ন হিসেবে সংরক্ষিত হবে। কেননা একটি মুক্তো ও একটি চুনির মূল্যে তোমরা এক সহস্র গহনা তৈরি করতে পারো।

কোনো নির্দিষ্ট বৃক্ষ হতে উৎপন্ন হয় মিষ্টস্বাদের ফল। যদিও ওই ফল স্রেফ (বৃক্ষের) একটি অংশ, তথাপিও খোদাতা'লা সেটিকে গোটাটুকুর ওপরে বেছে নিয়েছেন এবং শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। কেননা তিনি সেটির মাঝে এমন এক মিষ্টতা নিহিত করেছেন যা অন্যান্য অংশের মাঝে করেননি। ওই স্বাদের গুণেই সেটি গোটা অংশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েছে এবং নিজেকে তরুমজ্জা ও গাছের উদ্দেশ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। অতএব, আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন:

"না, তারা আশ্চর্য হয় যে একজন সতর্ককারী তাদের কাছে এসেছেন তাদেরই মধ্য হতে।" [সরাসরি অনুবাদ]

কোনো নির্দিষ্ট এক ব্যক্তি বলে, "আমি এমন এক হাল/আধ্যাত্মিক অবস্থা অর্জন করেছি, যার মাঝে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

কিংবা আরশের পাশে অবস্থিত ফেরেশতা ধারণকৃত হননি।" এমতাবস্থায় শায়খ (সম্ভবতঃ শায়খ শমসের তাব্রিয রহমতুল্লাহে আলাইহে) উত্তর দেন, "হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ধারণকৃত হননি এমন হালতের মধ্যে তাজ্জব হওয়ার কী আছে? অথচ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এমন একটি হাল-ও নেই যার মধ্যে তোমার মতো কোনো ইতর প্রাণি ধারণকৃত হয়নি!"

নির্দিষ্ট এক (রাজ দরবারের) ভাঁড় রাজার চিত্তকে আবার চাঙ্গা করে তোলার প্রয়াস পান। সবাই তাঁকে এ কাজটি সমাধা করার জন্যে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা সেধেছিলেন। কেননা রাজা ছিলেন ভীষণ বিরক্ত। তিনি রাগান্বিত অবস্থায় নদীর তীর ধরে হাঁটছিলেন। ওই ভাঁড় অপর তীর ধরে রাজার সমান্তরালে হাঁটছিলেন। কিন্তু রাজা তাঁর প্রতি ন্যূনতম মনোযোগও দিচ্ছিলেন না, বরঞ্চ নদীর পানির দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন। মরিয়া হয়ে ভাঁড় বলেন, "মহারাজ, পানিতে কী দেখতে পাচ্ছেন?" রাজা উত্তর দেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি এক অবিশ্বস্ত স্ত্রীর স্বামীকে।" অতঃপর ভাঁড় বলেন, "আপনার এই দাস-ও অন্ধ নয়, মহারাজ।"

অতএব, তোমরা এমন সময় হয়তো পেতে পারো, যখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ধারণকৃত হন না; কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এমন কোনো হালত-অবস্থা নেই, যেখানে এরকম কোনো ইতর প্রাণি ধারণকৃত হয় না। বস্তুতঃ এই যে আধ্যাত্মিক অবস্থা তোমরা খুঁজে পেয়েছো, তা তাঁরই আশীর্বাদ ও প্রভাবে এসেছে। কেননা প্রথমে যাবতীয় আশীর্বাদ ও পুরস্কার তাঁরই প্রতি বর্ষিত হয়, এরপর সেগুলো তাঁর কাছ থেকে অন্যান্যদের মাঝে বণ্টন করা হয়। এটি-ই হলো নিয়ম। খোদাতা'লা ফরমান, "হে রাসূল (দ:), আমি আপনার প্রতি সকল নেআমত বর্ষণ করেছি।" প্রিয়নবী (দ:) বলেন, "আর (তা বর্ষিত হোক) খোদার ধার্মিক বান্দাদের প্রতিও!"

আল্লাহতা'লার পথটি অত্যন্ত ভীতিপ্রদ এবং তা গভীর তুষার দ্বারা অবরুদ্ধ। হযরত রাসূলে খোদা (দ:) তাঁর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিজের ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন এবং রাস্তা খুলে দিয়েছিলেন। যে কেউ এই রাস্তার ওপর দিয়ে অগ্রসর হন একমাত্র মহানবী (দ:)-এরই পথপ্রদর্শন ও পাহারায়। তিনি-ই প্রথমাবস্থায় এই রাস্তা খুঁজে পান এবং এর সর্বত্র



পথচিহ্ন স্থাপন করেন, যেসব চিহ্ন দিকনির্দেশনা দেয়, "এদিকে যেয়ো না, ও পথে যেয়ো না; গেলে 'আদ ও সামূদ গোত্রের মতো তোমাদেরও বিনাশ হবে। কিন্তু যদি এদিকে যাও, তাহলে ঈমানদারবৃন্দের মতো তোমরাও রক্ষা পাবে। সমগ্র আল-কুরআন এ কথাই ব্যাখ্যা করে; কেননা তাতে ঘোষিত হয়েছে - 'এতে বিদ্যমান স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ।' আরেক কথায়, এই পথের ওপর আমরা (খোদাতা'লা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পথচিহ্ন বসিয়েছি। কেউ তার কোনোটিকে বিনষ্ট করতে চাইলে সবাই তাকে আক্রমণ করবে এই কথা বলে, 'তুমি কেন আমাদের জন্যে নির্মিত রাস্তাকে ধ্বংস করতে চাইছো? তুমি কেন আমাদের বিনাশ সাধনে অপতৎপর? তুমি কি কোনো রাহাজান'?"

জেনে রাখো যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হলেন পথপ্রদর্শক। আল্লাহ ফরমান, "তোমরা আমার হাবীব (দ:)-এর কাছে প্রথমে না এলে আমার কাছে পৌঁছুতে পারবে না।" এটি ঠিক সেরকম যখন তোমরা কোথাও যাবার কথা মনস্থ করো; ভাবনা পথ দেখায় এই বলে, "এ জায়গাটিতে যাও, এতে তোমার স্বার্থ নিহিত। এরপর তোমাদের চোখ পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে, আর পা চলতে শুরু করে ওই নিয়ম অনুযায়ী। কিন্তু পা যুগলের কাছে নেই কোনো চোখ যুগলসম্পর্কিত জ্ঞান, আর চোখ যুগলেরও নেই ওই চিন্তাভাবনা সম্পর্কে কোনো ধারণা।

যদিও কিছু মানুষ ভুলো মনের অধিকারী, তবুও অন্যান্যরা তাঁদেরকে ভুলেন না। কিন্তু তোমরা এই দুনিয়ার পিছু নিতে কঠিন পরিশ্রম করলে তোমাদের আসল গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্মৃত হবে। তোমাদেরকে অন্বেষণ করতে হবে খোদাতা'লার অনুমোদন তথা রেযামন্দি, সমাজের অনুমোদন নয়। অনুমোদন, ভালোবাসা ও মায়া-মমতা আমাদের মাঝে কর্জ দেয়া হয়েছে; আল্লাহ পাক-ই আমাদের মধ্যে তা স্থাপন করেছেন। তিনি চাইলে তাঁর দেয়া সর্বপ্রকার আরাম-আয়েশ, রুটি ও স্বস্তির মধ্যেও কোনো সুখ-শান্তি বা আনন্দ-ফুর্তি পাওয়া যাবে না - সবকিছুই তখন দুঃখ-বেদনা ও দুর্দশায় পরিণত হবে।

এসব আনুষঙ্গিক শর্ত হলো খোদার সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন হাতে একটি কলমের মতোই। তিনি-ই এটির পরিচালনাকারী ও লেখক। তিনি

যতোক্ষণ না সিদ্ধান্ত নেন, ততোক্ষণ কলম চলে না। তোমাদের চোখ কলমের ওপর নিবদ্ধ, আর তোমরা বলো, "এই কলমের ওপর নিশ্চয় কোনো হাত আছে।" তোমরা কলমটি দেখতে পাও, তাই হাতটিকে মনে করতে পারো। তবে এমন কিছু পুণ্যাত্মা আছেন, যাঁরা সর্বদা হাতটিকে দেখতে পান। তাঁরা বলেন, "এই হাতটিতে নিশ্চয় কোনো কলম (ধরা) আছে।" কিন্তু হাতের সৌন্দর্য দর্শনে তাঁরা কলমটিকে গ্রাহ্য করেন না। তাঁরা স্রেফ বলেন, "এ রকম হাত কলমবিহীন হতে পারে না।"

তোমরা কলমটিকে দেখতে গিয়ে এতোই উৎফুল্ল হও যে হাতের কথা বিস্মৃত হও। পক্ষান্তরে, তাঁরা (মানে ওই পুণ্যাত্মাবৃন্দ) হাতটি নিয়ে এতোই খুশি যে তাঁরা কলমকে গ্রাহ্য করবেন কী করে? তোমরা যেখানে যবের রুটি নিয়ে এতো তৃপ্তিবোধ করো যে গমের আটারুটি কখনো খাওয়ার চেষ্টা-ই করো না, সেখানে তাঁদের (অধিকারে) রয়েছে গমের আটারুটি; এমতাবস্থায় যবের রুটিকে গ্রাহ্য কীভাবে করবেন তাঁরা? যদি আল্লাহতা'লা তোমাদেরকে দুনিয়ার বুকে এমন খুশি দান করেন যার দরুন আনন্দের প্রকৃত স্থান বেহেশতের প্রতি তোমাদের কোনো আকাঙ্ক্ষা-ই থাকে না, আর দুনিয়াও বেহেশ্‌ত হতেই আপন জীবন আহরণ করে থাকে, তাহলে একইভাবে বেহেশতের অধিবাসীবৃন্দ-ই বা দুনিয়াকে স্মরণ করবেন কেন?

অতএব, ভেবো না সুখ-শান্তি ও আনন্দ-ফুর্তি আনুষঙ্গিক অসীলাগুলো হতে আগত, কেননা ওই সমস্ত বাস্তবতা স্রেফ কর্জ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক-ই প্রকৃতপক্ষে শান্তি অথবা শাস্তি দেন; কেননা সকল শান্তি ও শাস্তি (পুরস্কার) তাঁর কাছ থেকেই আগমন করে। তোমরা কেন আনুষঙ্গিক অসীলাকে এমন শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকো?

"সেরা বাণী সেগুলোই যা সামান্য ও প্রভাবপূর্ণ।" সেরা কথাগুলো দীর্ঘ হওয়া ছাড়াই শিক্ষা ব্যক্ত করে। যদিও কুরআন মজীদে 'কুল হুয়াল্লা'হু আহাদ' (বলুন: তিনি আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়) সূরাটি সংক্ষিপ্ত, তথাপিও এটি সূরা বাক্বারা/'গাভী' হতে উৎকৃষ্ট, যে বাক্বারা সূরাটির বহনকৃত বার্তার কারণে সেটি দীর্ঘতর। পয়গম্বর নূহ (আলাইহিস্ সালাম) এক হাজার বছর যাবৎ ধর্মপ্রচার করেন, অথচ তাঁর উম্মত ছিলেন চারজন। হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কতো বছর ধর্ম প্রচার করেছিলেন তা আমরা জানি, অথচ কতো দেশের মানুষ যে



তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন; আর তাঁরই কারণে কতো সূফী-দরবেশের আগমন ও (খোদায়ী) বিধিবিধানের যে প্রবর্তন হয়েছে। অতএব, প্রচুর বা স্বল্প দ্বারা বিচার চলে না। প্রকৃত বিষয় হলো গৃহীত শিক্ষা।

কারো কারো ক্ষেত্রে অল্প কিছু কথা অনেক কথার চেয়েও ঢের বেশি শিক্ষার বাণী ব্যক্ত করে। একইভাবে, কোনো চুলোর আগুন যদি তীব্র হয়, তাহলে তোমরা সেটির কাছে যেতে পারবে না; এমতাবস্থায় সেটি হতে কীভাবে তোমরা লাভবান হবে? কিন্তু একটি দুর্বল প্রদীপের এক সহস্র সুবিধা রয়েছে। অতএব, সুবিধা লাভ করাই হলো মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কিছু মানুষের জন্যে কোনো কথা শ্রবণ না করাই শ্রেয়, স্রেফ দেখাই তাদের জন্যে যথেষ্ট। সেটি-ই তাদেরকে সবচেয়ে বেশি লাভবান করে, আর তারা যদি কোনো কথা শ্রবণ করে, তাহলে তা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

কোনো এক শায়খকে দেখতে নির্দিষ্ট একজন শায়খ ভারত হতে আগমন করেন। তিনি তাবরিয পৌঁছে শায়খের হুজরাহ'র দরজায় পৌঁছুলে একটি কণ্ঠস্বরকে বলতে শোনেন, "বাড়ি ফেরত যাও! কেননা তোমার এই দরজায় আসার প্রয়োজন তুমি পূরণ করেছো। কিন্তু দরবেশের দর্শন তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।"

কোনো শিক্ষা ব্যক্তকারী অল্প কথার উপমা হলো একটি জ্বলন্ত প্রদীপের মতোই, যেটি জ্বালানো হয়নি এমন প্রদীপকে ছুঁয়ে জ্বালিয়ে প্রস্থান করে। সেটি-ই তাঁর (দ:) জন্যে যথেষ্ট, কেননা তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। মোট কথা, প্রিয়নবী (দ:) ওই দৃশ্যমান আকৃতি নন, বরং ওই আকৃতি হলো স্রেফ মহানবী (দ:)-এরই তেজি ঘোড়া। রাসূল (দ:) হচ্ছেন ওই খোদায়ী এশক্ব ও মায়া-মমতা যা অবিনশ্বর।

কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) জিজ্ঞেস করেন: "কেন তাহলে তাঁরা মিনারা'র ওপর স্রেফ খোদা'তালার প্রশংসা করেন না? কেন তাঁরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নাম মোবারক-ও উল্লেখ করেন?"

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: চমৎকার (প্রশ্ন), মহানবী (দ:)-এর প্রশংসা তো আল্লাহরই প্রশংসা। এটি যেনো এ কথা বলা, "মহারাজ দীর্ঘজীবী হোন, আর ওই বন্ধুও দীর্ঘজীবী হোন, যিনি আমায় মহারাজের

দিকে পরিচালিত করেছেন এবং মহারাজের পবিত্র নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে আমাকে জানিয়েছেন!" ওই হাবীবের (দ:) প্রশংসা তো মহারাজেরই প্রশংসা।

রাসূলুল্লাহ (দ:) বলেন, "আমাকে কিছু একটা দাও; আমার প্রয়োজন। হয় তোমাদের আলখাল্লা, সম্পদ, নতুবা তোমাদের বস্ত্র (আমায়) দাও।" তোমাদের আলখাল্লা বা সম্পদ নিয়ে তিনি কী করবেন? আসলে তোমাদের জামাকাপড়ের বোঝা তিনি কমাতে চাইছেন, যাতে সূর্যের উত্তাপ তোমাদের কাছে পৌঁছুতে পারে।

"আর খোদার কাছে ধার দাও উত্তম কর্জ।" [সরাসরি অনুবাদ]

খোদা স্রেফ সম্পদ ও আলখাল্লা চান না। বস্তুতঃ তিনি সম্পদ ছাড়াও তোমাদেরকে দিয়েছেন: জ্ঞান, চিন্তা, বিজ্ঞতা ও দর্শনশক্তি। তিনি (ওপরে) বোঝাতে চাচ্ছেন, "আমার সম্পর্কে একটি মুহূর্ত (হলেও) চিন্তা, যত্ন ও বিবেচনাতে ব্যয় কোরো, কেননা যে সম্পদ তোমরা অর্জন করেছো তা আমারই প্রদত্ত উপহার হতে আগত।" খোদাতা'লা পাখি ও সাপ নির্বিশেষে সবার কাছ থেকেই দান যাচঞা করেন। তোমরা যদি সূর্যের সামনে বস্ত্রহীন অবস্থায় যাও, তা আরো উত্তম; কেননা ওই সূর্য তোমাকে পুড়িয়ে কালো অঙ্গার বানায় না, বরঞ্চ তোমাকে শুভ্রবর্ণে পরিণত করে। কিংবা অন্ততপক্ষে তোমাদের বস্ত্রের বোঝা হাল্কা করে ওই সূর্যের (সান্নিধ্যে) আনন্দের অনুভূতি এনে দেয়। তোমরা তিক্ততায় হয়েছো অভ্যস্ত। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও অন্তত মিষ্ট স্বাদ গ্রহণ করো!

## উপদেশ বাণী - ৬৪

এই দুনিয়ায় অধ্যয়ন/গবেষণা ও অভিজ্ঞতার আলোকে শেখা প্রতিটি বিদ্যা বা জ্ঞান-ই জিসমানী তথা শারীরিক (বুদ্ধিবৃত্তিক) জ্ঞান/বিদ্যা। আর মৃত্যুর দরজা পেরিয়ে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা রূহানী তথা আত্মার জ্ঞান। 'আনাল হক্ক'-সম্পর্কিত জ্ঞান হচ্ছে শারীরিক (বুদ্ধিবৃত্তিক) বিদ্যা, কিন্তু 'আনাল হক্ক' হয়ে যাওয়া হচ্ছে রূহানী বিদ্যা। প্রদীপের আলো ও তার আগুন দেখতে পাওয়া হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান, আর ওই আগুন ও প্রদীপের শিখায় দহন হওয়া রূহানী বিদ্যা। প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা



হচ্ছে রূহানী জ্ঞান, আর (বৈষয়িক) বিদ্যার ওপর ভিত্তিশীল প্রতিটি বিষয়ই বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান।

তোমরা এও বলতে পারো যে একমাত্র সত্য হচ্ছে দর্শন ও দৃকশক্তি (অন্তর্দৃষ্টি), বাকি সবই অলীক কল্পনার জ্ঞান। উদাহরণস্বরূপ, একজন স্থাপত্য-প্রকৌশলী (প্রথমে) কোনো বিদ্যালয়ের ইমারত সম্পর্কে চিন্তা ও কল্পনা করেন। স্থাপত্য-প্রকৌশলীর ভাবনা যতোই নির্ভুল হোক না কেন, তবুও সেটি একটি কল্পনা। তা কেবল বাস্তবে পরিণত হয় তখন-ই, যখন ইমারত-নির্মাতাবর্গ বিদ্যালয়টি নির্মাণ করে দাঁড় করিয়ে দেন।

তবে এক কল্পনা হতে আরেক কল্পনার মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান। সর্ব-হযরত আবূ বকর (রা:), উমর (রা:), উসমান (রা:) ও আলী (ক:)'র কল্পনা অন্যান্য সাহাবাবৃন্দের (রা:) কল্পনা হতে পৃথক। এক ব্যক্তি হতে আরেক ব্যক্তির কল্পনার মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কোনো দক্ষ ও অভিজ্ঞ স্থাপত্য-প্রকৌশলী একটি বাড়ি নির্মাণের কল্পনা করেন। আরেকজন যিনি প্রকৌশলী নন, তিনিও একটি বাড়ির কল্পনা করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান রয়েছে, কেননা প্রকৌশলীর কল্পনা বাস্তবতার অনেক কাছাকাছি। (খোদায়ী) বাস্তবতা ও আধ্যাত্মিকতার জগতেও একই অবস্থা; কোনো ব্যক্তির দিব্যদৃষ্টি ও অন্যান্যদের দিব্যদৃষ্টির মাঝেও পার্থক্য বিরাজমান।

আলেম-উলামা বলেন সাত শ অন্ধকারের পর্দা ও সাত শ আলোর পর্দা বিদ্যমান। বস্তুতঃ দিব্যদৃষ্টির সবগুলো জগত-ই অন্ধকারের পর্দা, আর বাস্তবতার সমস্ত জগত-ই আলোর পর্দা। কিন্তু ওই অন্ধকারের পর্দাগুলোর মাঝখানে এমন কোনো (বৈষয়িক) জ্ঞান নেই যা সেগুলোর অতীব সূক্ষ্মতা অনুধাবন করতে সক্ষম; আর বাস্তবতার জগতগুলোর মধ্যে বিস্তর ব্যবধান বা পার্থক্য থাকলেও ওই বিভিন্নতা মস্তিষ্ক দ্বারা উপলব্ধি করা কখনোই সম্ভব নয়।

## উপদেশ বাণী - ৬৫

জাহান্নামে যারা বসবাস করে, তারা এই দুনিয়ায় থাকার চেয়ে সেখানে বসবাস করে বেশি খুশি। কেননা দোযখে তারা আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন

হয়ে ওঠে; অথচ এই জগতে তারা ভুলে যায় (তাঁকে)। আল্লাহতা'লা সম্পর্কে সচেতনতার চেয়ে অধিক মধুময় আর কিছুই নেই। অতএব, তাদের এই দুনিয়ায় ফেরার আকাঙ্ক্ষাটি স্রেফ কাজ করার এবং (খোদায়ী আজ্ঞা) পালনের লক্ষ্যেই, যাতে তারা খোদায়ী করুণার বহিঃপ্রকাশে সাক্ষী হতে পারে; আর এটি এ কারণে নয় যে দুনিয়া (তাদের কাছে) জাহান্নামের চেয়ে বেশি সুখের স্থান।

মোনাফেক্ববর্গকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে আটক করে রাখা হবে; কেননা তাদেরকে ঈমানদারি প্রদর্শন করা হয়েছিলো, কিন্তু তাদের অবিশ্বাস ছিলো অধিকতর শক্তিশালী। তাদেরকে প্রদত্ত পুরস্কার/উপহারের কোনো রকম সদ্ব্যবহার-ই তারা করেনি। তাই তাদের শাস্তি অনেক বেশি কঠোর, যাতে খোদাতা'লা সম্পর্কে (তারা) সচেতন হতে পারে। অপরদিকে, অবিশ্বাসীদের কাছে বিশ্বাস কখনোই আগমন করেনি। তাদের অবিশ্বাস ততোটুকু শক্তিশালী নয়, আর তাই অল্প শাস্তিতেই তারা সচেতন হয়ে ওঠে। পায়জামাভর্তি ধুলো ও কার্পেটপূর্ণ ধুলোর ক্ষেত্রে একজন হলেই পায়জামা ঝাড়া দিয়ে ধুলোমুক্ত করা যায়; কিন্তু কার্পেট ধুলোমুক্ত করার জন্যে চারজন লোককে তা জোরে জোরে ঝাড়তে হয়।

## দোযখবাসীরা কান্নাকাটি করে বলেঃ

"আমাদের ওপরে পানি ঢালুন, কিংবা তা ঢালুন যা খোদাতা'লা আপনাদের দান করেছেন।" [সরাসরি অনুবাদ]

আল্লাহ পাক দোযখবাসীদের জন্যে পানাহারের আকাঙ্ক্ষা রহিত/নিষেধ করেছেন। তাই এ কথার মানে হলো, "আমাদের প্রতি ঢালুন যা আপনারা খুঁজে পেয়েছেন, যা আপনাদের ওপর প্রভা ছড়াচ্ছে।"

আল-ক্বুরআন হচ্ছে এক নববধূর মতো, যে আপন চেহারা তোমাদের প্রদর্শন করে না - এমন কী তোমরা তার (চেহারার ওপর থেকে) পর্দা সরালেও না। তোমরা যে তাকে পরখ/যাচাই করেছো কিন্তু সুখ পাওনি বা আধ্যাত্মিক পর্দা অপসারণ করতে পারো নি, এই বাস্তবতা এ চিহ্ন ফুটিয়ে তোলে যে তার (চেহারার) পর্দা সরানোর ক্ষেত্রে তোমাদের কাজটি আপনাআপনি-ই তাকে অস্বীকৃতি জানিয়েছে; যার দরুন সে তোমাদের



কাছে এক কুৎসিত বধূ হিসেবে দৃশ্যমান হচ্ছে। সে বলে, "আমি নই কোনো সুন্দরী বধূ।" ক্বুরআন মজীদ পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো আকৃতিতে নিজেকে প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু তোমরা যদি তার পর্দা অপসারণের চেষ্টা না করে স্রেফ ক্বুরআনের উত্তম সৌখ্য তালাশ করো, তার ক্ষেত্রগুলোতে সেচ দাও, দূর হতে তার সেবাযত্ন নাও, সে যা নিয়ে সন্তুষ্ট সেই লক্ষ্যে কাজ করো, তাহলে পর্দা সরানোর কোনো চেষ্টা ছাড়াই সে তোমাদেরকে তার চেহারা প্রদর্শন করবে।

আল্লাহওয়ালা (সূফী/দরবেশ)-দের (সান্নিধ্য) অন্বেষণ করো; কেননা খোদা প্রত্যেকের সাথে কথা বলেন না, ঠিক যেমনটি এই জগতের রাজা-বাদশাহ প্রত্যেক তাঁতীর সাথে কথা বলেন না। তারা মন্ত্রী ও সহকারীবৃন্দকে নিয়োগ করেছেন সুলতানের দিকে পথ দেখানোর জন্যে। আল্লাহতা'লাও নির্দিষ্ট বান্দা-মণ্ডলীকে মনোনীত করেছেন, যাতে যে কেউ তাঁকে অন্বেষণ করলে তাঁদের মাঝে যেনো তাঁরই সন্ধান পান। সকল পয়গম্বর (আ:)-ই এই কারণে এসেছেন - স্রেফ তাঁরাই হলেন ওই পথ।

## উপদেশ বাণী - ৬৬

সিরাজ আল-দ্বীন (দরবারি মজলিশে) বলেনঃ "আমি কোনো একটি সমস্যার ব্যাপারে কারো সাথে কথা বলছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে আমার ভেতরের কিছু একটিতে ব্যথা আরম্ভ হয়।"

মওলানা রূমী (রহ:) বলেনঃ ওই কিছু একটিকে তোমার ক্ষেত্রে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যাতে তোমার কথা বলা যখন উচিত নয়, ঠিক তখন-ই কথা বলা হতে তোমাকে তা প্রতিরোধ করে। সাধারণতঃ এটি এতো সূক্ষ্ম যে নজরেই পড়ে না, কিন্তু যখন তুমি ওই আকাঙ্ক্ষা, বাধ্যবাধকতা ও বেদনা অনুভব করো, তখন তুমি জানো যে কিছু একটি (তোমার) নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, তুমি কোনো জলাশয়ে নামলে ফুল ও সুবাসিত তৃণলতার কোমলতা তোমার কাছে পৌঁছোয়। কিন্তু তুমি যখন অপর পাড়ে পৌঁছে যাও, তখন তোমার (গায়ে) কাঁটা বিঁধে। অতঃপর তুমি উপলব্ধি করতে পারো যে (জলাশয়ের) একদিক কণ্টকাকীর্ণ ও বেদনা, অপর দিক কুসুমাস্তীর্ণ ও সুখশান্তিময়। এই পার্থক্যগুলো আমাদের

আবেগের ওপর প্রভাব ফেলে, অথচ বাহ্যিক যে কোনো বস্তু বা বিষয়ের চেয়েও এগুলো আমাদের অধিকতর ঘনিষ্ঠ।

খিদে ও তেষ্টা, রাগ ও সুখ - এগুলোর সবই অদৃশ্য, তথাপিও এগুলো দৃশ্যমান যে কোনো কিছু হতে বেশি প্রভাব ফেলে আমাদের ওপর। কেননা তুমি যদি চোখ বন্ধ করো, তাহলে দেখার যোগ্য বস্তুও তুমি দেখতে পাবে না; কিন্তু এটি খিদে দূর করবে না। একইভাবে, ঝাল তরকারিতে মশলা, খাবারে মিষ্ট ও তেতো (উপাদান) চোখে দেখা যায় না, কিন্তু সেগুলোর স্বাদ সেগুলোর বাহ্যিক চেহারার চেয়েও বেশি প্রভাব ফেলে আমাদের ওপর।

তোমরা কেন এই শরীরের ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত? কেন তোমরা তার সাথে এতোখানি সংশ্লিষ্ট/জড়িত? এটি ছাড়াই তো তোমরা বাঁচো। রাত এলে তোমরা এটিকে ভুলে যাও, অথচ দিন সমাগত হলে তোমরা তোমাদের শরীরের বিষাবলীতে নিমগ্ন হও। কিন্তু তোমরা তো সত্যিকার অর্থে কখনোই (তোমাদের) শরীরের সাথে নেই; তাহলে কেন এর বিষয়াদি নিয়ে কম্পমান তোমরা? তোমরা এক ঘণ্টার তরেও এর সাথে নেই, বরঞ্চ সর্বদা অন্যত্র বিরাজ করো। তোমরা কোথায়, আর তোমাদের দেহ কোথায়?

"তুমি এক উপত্যকায়, আমি আরেকটিতে।"
এই দেহ এক মস্ত ধোকা।

ফেরাউনের জাদুকরেরা ক্ষণিকের তরে থেমেছিলো, যেমনটি বাতাসে কোনো ধূলিকণা ঝুলে থাকে; আর তারা নিজেদের আকৃতি সমর্পণ করেছিলো। কেননা তারা জানতো তারা নিজেদের দেহ হতে আলাদা বসবাস করে, আর তাদের দেহ খোদ তারা (নিজেরা) ছিলো না। অনুরূপভাবে, হযরত ইবরাহীম (আ:), ইসমাঈল (আ:) ও অন্যান্য সকল পয়গম্বর (আ:) এবং সূফী-দরবেশ (রহ:) (ক্ষণিকের তরে) থামার পরে দেহ অস্তিত্বশীল কি না, সে ব্যাপারে উদাসীন/নিরুৎসুক ছিলেন।

হাজ্জাজ (বাদশাহ) যিনি গাঁজা টানতেন, তিনি একবার চিৎকার করে বলেন, "দরজা সরাবে না, নতুবা আমার শির (ধরায়) পতিত হবে!" তিনি ভেবেছিলেন তাঁর শির বুঝি শরীর হতে বিচ্ছিন্ন এবং দরজার সাথে স্রেফ এর সংযুক্তির মাধ্যমেই যথাস্থানে অবস্থান করছে। সব মানুষের



ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। আমরা ভাবি দেহের সাথে বুঝি আমরা সংযুক্ত, আর তাই টিকে থাকার জন্যে ওর ওপর (আমরা) নির্ভর করি।

## উপদেশ বাণী - ৬৭

"আল্লাহতা'লা পয়গম্বর আদম (আ:)'কে নিজ সুরত/আকার তথা গুণে সৃষ্টি করেছেন।" [আল-হাদীস]

প্রত্যেকেই খোদাতা'লার বহিঃপ্রকাশ তালাশ করেন। উদাহরণস্বরূপ, অনেক পর্দানশীন নারী আছেন যারা নিজেদের চেহারাকে অনাবৃত করেন যাতে তাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পরখ করা যায়, ঠিক যেমনি তোমরা ক্ষুর ব্যবহার করে থাকো। এমন প্রেমিক আছেন যারা আপন প্রেমাস্পদকে বলেন, "আমি ঘুমোই নি, পানাহারও করিনি। এরকম হয়েছি আমি, আর তা তোমারই বিহনে।" তারা এর দ্বারা যা বোঝান তা হলো, "তুমি খোদার বহিঃপ্রকাশ অন্বেষণ করো। আমি-ই সেই বহিঃপ্রকাশ যার ওপর তোমার প্রেমময়তার বড়াই তুমি করতে পারো।" একইভাবে, সকল উলামা ও জ্ঞান বিশারদ আল্লাহর এই ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ তালাশ করেন - "আমি ছিলাম রহস্যের গুপ্তভাণ্ডার, অতঃপর প্রকাশ হতে চাইলাম।"

"আল্লাহতা'লা পয়গম্বর আদম (আ:)'কে নিজ সুরত/আকার তথা গুণে সৃষ্টি করেছেন" - এ কথার অর্থ খোদার আইনের সাথে সদৃশ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। খোদায়ী আইন/ঐশী বিধানের বহিঃপ্রকাশ সকল সৃষ্টিতেই ঘটেছে, কেননা সকল বস্তুই খোদার ছায়া বিশেষ, আর ছায়া ব্যক্তির মতোই। (হাতের) পাঁচ আঙ্গুল প্রসারিত হলে সেগুলোর ছায়াও প্রসারিত হয়। দেহ ঝুঁকলে ছায়াও ঝুঁকে। দেহ প্রসারিত হলে ছায়াও প্রসারিত হয়। অতএব, সব মানুষই কোনো প্রেমাস্পদকে তালাশ করেন; কেননা তারা আকাঙ্ক্ষী খোদার আশেক্ব হবার, তাঁর শত্রুদের শত্রু হবার, আর তাঁর আউলিয়া/বন্ধুদের বন্ধু হবার। এসবই হলো খোদার বিধিবিধান ও সিফাত/গুণ, যা ছায়ায় দৃশ্যমান।

মোদ্দা কথা হলো, এই ছায়ার জগৎ সচেতন নয় আমরা প্রকৃতপক্ষে কারা, অথচ আমরা সচেতন। কিন্তু খোদাতা'লার জ্ঞানের তুলনায় আমাদের এই সচেতনতা হলো অসচেতনতা। কোনো ব্যক্তির ছায়ায় তার সব কিছু দৃশ্যমান হয় না, স্রেফ কিছু নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া। অতএব, এই ছায়ার

জগতে আল্লাহতা'লার সমস্ত সিফাত/গুণ দৃশ্যমান হয় না, স্রেফ সেগুলোর কিছু কিছু ব্যতিরেকে; কেননা-

"তোমাদেরকে জ্ঞানের কিছুই দেয়া হয়নি, যৎসামান্য ছাড়া।" [সরাসরি অনুবাদ]

## উপদেশ বাণী - ৬৮

হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম)'কে জিজ্ঞেস করা হয়, "এই জগৎ ও পরবর্তী জগতে সবচেয়ে কষ্টসাধ্য বিষয় কোনটি?" তিনি উত্তর দেন, "খোদাতা'লার গযব বা রাগ। তারা আবার জিজ্ঞেস করে, "আমাদেরকে এর থেকে বাঁচাতে পারে কী জিনিস?" তিনি উত্তর দেন, "তোমাদের আপন রাগের ওপর এবং অন্যদের প্রতি ক্রোধের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কোরো।"

মস্তিষ্ক যখন অভিযোগ করতে চায়, তখন এর বিপরীতটুকু করো - ধন্যবাদ জ্ঞাপন করো। কোনো বিষয়কে এমন পর্যায়ে অতিরঞ্জন করো, যার দরুন তোমাকে যে বিষয়/বস্তু তিক্ত-বিরক্ত করে, তার প্রতি পছন্দ তুমি তোমার মাঝে খুঁজে পাও। কৃতজ্ঞতার ভান করা খোদার মহব্বত অন্বেষণের একটি উপায় বটে।

আমাদের মওলা-মুর্শীদ হযরত শামস্ তাব্রিয (রহ:) উপদেশ দেন, "সৃষ্টির প্রতি অভিযোগ করা স্রষ্টার প্রতি অভিযোগ করারই নামান্তর।" তিনি আরো বলেন, "ঘৃণা ও ক্রোধ তোমাদের অবচেতন মনে লুকিয়ে রয়েছে। ওই অনল হতে তোমরা যদি একটি স্ফুলিঙ্গকে লাফ দিয়ে উঠতে দেখো, তা নিভিয়ে ফেলো; যাতে সেটি যে অনস্তিত্ব থেকে আগমন করেছিলো, সেখানেই ফিরে যায়। তোমরা যদি রাগের সাথে পাল্লা দিয়ে রাগ প্রদর্শন করো এবং ক্রোধের অনল বিস্তৃত করতে চাও, তাহলে এটি তোমাদের অবচেতন মনে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পাবে এবং তা নেভানো তখন অধিকতর কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে।"

কোনো ভালো কাজ/পুণ্য দ্বারা মন্দকে তাড়িয়ে দাও। এতে তোমরা দু'ভাবে তোমাদের শত্রুদের ওপর বিজয় লাভ করবে। একটি হলো, তোমাদের শত্রু অন্য কোনো ব্যক্তির মাংস ও চামড়া নয়, বরং এটি (মানে শত্রুতা) তাদের প্রতি ঘৃণার সংক্রমণপরায়ণতা। যখন সেটিকে কৃতজ্ঞতার



প্রাচুর্য দ্বারা তোমাদের মধ্য হতে দূর করে দেয়া হবে, তখন সেটি অবধারিতভাবে তোমাদের শত্রুর ভেতর থেকেও তিরোহিত হবে। কেননা প্রত্যেকে দয়া-মায়ার প্রতি সহজাতভাবে সাড়া দেন; আর তোমরাও তোমাদের বিরোধীদের কাছে লড়াই করার মতো কোনো হাতিয়ারই আর রাখোনি।

এটি ঠিক শিশুদের মতোই অবস্থা, যখন তারা কারো প্রতি চিৎকার করে গালি দেয় আর ওই ব্যক্তিও চিৎকার করে পাল্টা গালি দেয়; তারা এতে আরো উৎসাহিত হয় এই ভেবে - "আমাদের কথার প্রভাব পড়েছে।" কিন্তু যদি শত্রু দেখতে পায় যে তার কথা কোনো পরিবর্তন আনেনি, তখন তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

দ্বিতীয় ফায়দাটি হলো, তোমাদের মধ্যে যখন ক্ষমাশীলতার গুণ/বৈশিষ্ট্য আগমন করে, তখন অন্যান্য মানুষ উপলব্ধি করেন যে তোমরা আসলে যা, সেই অনুযায়ী তারা তোমাদেরকে মূল্যায়ন করেননি। তখন তারা বুঝতে পারেন যে তারাই বরঞ্চ তিরস্কারের যোগ্য, তোমরা নও; আর প্রতিপক্ষকে শরমিন্দায় ফেলার ক্ষেত্রে এর চেয়ে মোক্ষম প্রমাণ আর কিছু নেই। অতএব, নিন্দুকবর্গের প্রশংসা ও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তোমরা তাদের মাঝে অবস্থিত ঘৃণার এক প্রতিষেধক প্রয়োগ করছো; কেননা তারা যেখানে তোমাদের ঘাটতি বা ত্রুটিবিচ্যুতি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেছে, সেখানে তোমরা তোমাদের পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাদেরকে প্রদর্শন করেছো।

খোদাতা'লা যাঁদেরকে ভালোবাসেন তাঁরা ত্রুটিযুক্ত হওয়া কঠিন। তাই যারা আমাদের সমালোচনা করে, চলো আমরা তাদের প্রশংসা করি; এতে তাদের বন্ধুরা ভাববে, "সূফী-দরবেশবৃন্দের সাথে আমাদের বন্ধুরাই মিলে-মিশে থাকতে পারে না, কেননা সূফী-মণ্ডলী সর্বদা-ই আমাদের বন্ধুদের সাথে ভালোভাবে কথা বলেন।"

"আছে যদিও তাদের শক্তিমত্তা,
তাদের দাড়ি ছেঁড়ো দেখিয়ে ভদ্রতা,
শক্তভাবে ঘাড় তাদের মটকে দিও,
হয় তারা উঁচু ও ক্ষমতাধর যদিও,
হে আল্লাহ, এতে মোদের মদদগার বনিও!"

## উপদেশ বাণী - ৬৯

খোদাতা'লা ও মানবের মাঝে বিরাজমান স্রেফ দুটি পর্দা - স্বাস্থ্য ও সম্পদ/সম্পত্তি; বাকি সব পর্দা এগুলো হতেই নিঃসৃত। যারা স্বাস্থ্যবান তারা খোদার তালাশী নয় এবং তারা তাঁকে দেখতেও পায় না; কিন্তু যখন-ই বেদনা তাদেরকে আক্রান্ত করে, তৎক্ষণাৎ "ও খোদা! ও খোদা!" - বলে তারা চিৎকার করে ওঠে এবং তাঁর প্রতি সমর্পিত হয়। অতএব, স্বাস্থ্য হচ্ছে তাদের জন্যে পর্দা এবং খোদাতা'লা তাদের দুঃখ-বেদনার আড়ালে আছেন লুকিয়ে।

মানুষের ধনসম্পদ যতোক্ষণ আছে, ততোক্ষণ তারা তাদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করে, আর রাত-দিন আনন্দফুর্তিতে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তেই দারিদ্র্য আবির্ভূত হয়, তৎক্ষণাৎ তাদের মন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তারা আল্লাহতা'লার দিকে ফেরে।

"(আপনার দেয়া) মাতলামি ও দারিদ্র্য আমার কাছে এনেছিলো আপনাকে, আমি তো বরণ করেছি আপনারই (দেয়া) মাতলামি ও দারিদ্র্যের গোলামিকে।" [ভাবানুবাদ]

খোদাতা'লা ফেরাউনকে দিয়েছিলেন চার শ বছরের দীর্ঘ জীবন, রাজত্ব ও আনন্দফুর্তি। সেগুলোর সবই ছিলো পর্দা, যা তাকে খোদার সামনে হাজিরা থেকে দূরে রেখেছিলো। সে একদিনও অনুপযোগী কোনো কিছুর বা দুঃখ-বেদনার অভিজ্ঞতা লাভ করেনি, যাতে সে খোদাকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যেতে পারে। আল্লাহতা'লা বলেন, "তোমার কামনা-বাসনা নিয়ে মত্ত থাকো এবং আমার কথা চিন্তাও করো না। শুভ রাত্রি!"

"সুলায়মান বাদশাহ হন ক্লান্ত নিয়ে নিজ রাজত্ব,
কিন্তু আইয়্যুব নবী আপন দুঃখকষ্টে হননি পরিতৃপ্ত।" [ভাবানুবাদ]

## উপদেশ বাণী - ৭০

মওলানা রূমী (রহ:) বলেন: কেউ কেউ ব্যক্ত করেন মানবের মাঝে এমন এক মন্দ বিরাজ করে, যা পশুপাখি ও জঙ্গলের হিংস্র প্রাণির মাঝে পাওয়া যায় না; কিন্তু তার মানে এই নয় যে মানুষ জন্তু-জানোয়ার হতেও মন্দ।



বরঞ্চ মানবের মাঝে এই মন্দ চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও আত্মিক তমসা একটি গোপন অপরিহার্য উপাদানকে আড়াল করে রেখেছে। ওই উপাদান যতো মূল্যবান ও মহৎ হবে, তাকে আড়াল করার পর্দাও ততোই বড় হবে; আর এ রকম পর্দা বড় ধরনের প্রচেষ্টা ছাড়া অপসারণ করা সম্ভব নয়।

এসব সংগ্রাম-সাধনা বিভিন্ন ধরনের হয়। এগুলোর মধ্যে সেরাটি হলো খোদার দিকে মুখ ফেরানো এবং এই দুনিয়া হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া সেসব বন্ধুর (মানে আউলিয়া/দরবেশের) সাথে সময় কাটানো। আবার এর চেয়ে কঠিন যুদ্ধও হতে পারে না; কেননা তাঁদের খোদ দর্শন লাভ-ই আমাদের অহং ও দুনিয়াবী খায়েশকে লুপ্ত করে। এই কারণেই তাঁরা বলেন একটি সাপ চল্লিশ বছর জনমানব না দেখতে পেলে ড্রাগনে পরিণত হয়; কেননা তার মন্দ স্বভাবের বৃদ্ধিকে থামিয়ে দিতে পারেন এমন কাউকে সে দেখেনি।

নরনারী যেখানেই বড় একটি তালা ঝুলোয়, সেখানে কোনো মূল্যবান বস্তুর উপস্থিতির চিহ্ন সেটি। ঠিক যেমন কোনো সাপ রত্নভাণ্ডার পাহারা দেয়, তেমনি কোনো মানুষের কুৎসিত চেহারাকে (কখনো) বিবেচনা কোরো না; বরং তাদের রত্নভাণ্ডারের মূল্যের দিকে লক্ষ্য কোরো।

## উপদেশ বাণী - ৭১

ডানাবিশিষ্ট পাখি ও আল্লাহর আশেক্বীনের মধ্যকার পার্থক্য হলো এই যে, পাখি কোনো নির্দিষ্ট দিকে উড়ে যায়। পক্ষান্তরে, খোদার মুহিব্বীন-বৃন্দ তাঁদের কামনা-বাসনার ডানায় চড়ে সকল দিক হতেই (মুখ ফিরিয়ে) দূরে উড্ডীন হন।

প্রতিটি ঘোড়ার আছে নিজ আস্তাবল, প্রতিটি জন্তুর আছে আপন খোঁয়াড়, আর প্রতিটি পাখিরও আছে নিজ বাসা। আর আল্লাহতা'লা-ই (এ বিষয়ে) সবচেয়ে ভালো জানেন।

***সমাপ্ত***

The title and origin of the book Edit According to J. M. Sadeghi the title "Fihi ma fihi" has appeared on a copy dated 1316. Another copy of the book dated 1350 has the title Asrar al-jalalieh. Rumi himself in the fifth volume of Masnavi-i Ma'navi mentions[1] that " بس سوال و بس جواب و ماجرا بد میان زاهد و رب الوری که زمین و آسمان پر نور شد در مقالات آن همه مذکور شد " which most likely refers to this book. The title Maghalat-e Mowlana of copies of the book published in Iran follows this. Not much is known about the publication time and the writer of the book. According to B. Forouzanfar, the editor of the most reliable copy of the book, it is likely that the book was written by Sultanwalad, the eldest son of Rumi, based on manuscripts and notes taken by himself or others from the lectures of his father on Masnavi-i Ma'navi. In the Essence of Rumi, John Baldock states that Fihi Mafihi was one of Rumi's discourses written towards the end of his life. Rumi lived from 1207 to 1273 so Fihi Mafihi was likely written some time between 1260 and 1273 by Rumi himself.

The book has been (freely) translated into English under the title Discourses of Rumi by A. J. Arberry in 1961 and consists of 71 discourses. An authoritative translation by Dr. Bankey Behari was published in 1998 under the title Fiha Ma Fiha, Table Talk of Maulani Rumi (DK Publishers, New Delhi), ISBN 81-7646-029-X